আর্কাদি গাইদার

ইশকুল

লাল ফৌজের যোদ্ধা আর্কাদি গাইদার, ১৯১৯

আর্কাদি গাইদার

ইশকুল

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
অঙ্গসজ্জা: ইয়ে. শুকায়েভ

A. Gaidar
SCHOOL
In Bengali

А. Гайдар
ШКОЛА
На языке бенгали

দ্বিতীয় সংস্করণ

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৪

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-002198-7

আর্কাদি গাইদার ও তাঁর বই

আমাদের যুগটা জনগণের প্রবল আন্দোলন ও বৃহৎ ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের। এই যুগটার দাবি অভূতপূর্ব মানবিক শক্তির, বিশেষ এক জাতের লেখকেরও জন্ম দিয়েছে তা। এঁদের জীবন ও রচনা একসূত্রে গাঁথা। সাহিত্য তাঁদের নিজের বীর্যলব্ধ সুকঠোর নিয়তির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

জাহাজ যখন সমুদ্র পাড়ি দেয়, তখন তার গলুইয়ে বসে সবচেয়ে দূরদর্শী। একাগ্র দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে দূরে, দেখে, নজর রাখে। সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণেরা পায় সে কাজের ভার।

আগের কালে যখন রওনা দিত অশ্বারোহী বাহিনী, তখন তাদের আগে আগে যেত আগু সওয়ার, গন্তব্যের অজানা পথ-ঘাটের খবর নিত সে, বলা হত তাকে গাইড, রুশীতে **গাইদার**।

গাইদার — আর্কাদি পেত্রভিচ গলিকভ নিজেও ছিলেন ঠিক তেমনি খরদৃষ্টি, তাঁর সাহিত্যের বন্ধুবাহিনীর পথপ্রদর্শক, অগ্রপথবেক্ষক। এই গমগমে, বহুব্যঞ্জক সাহিত্যিক ছদ্মনামটি তিনি অকারণে বাছেন নি।

লেখক ও মানুষ হিসেবে আর্কাদি পেত্রভিচ গাইদার ছিলেন তাঁর বিপ্লবী মাতৃভূমির প্রকৃত সন্তান, তাঁর চিরজীবনের প্রতিজ্ঞা ছিল, জনগণের রক্তে স্নাত, ঘামে ও অশ্রুতে অভিষিক্ত, শ্রমে ও রণে অর্জিত যে সৌভাগ্য, তা কখনোই বিসর্জন দেওয়া চলবে না।

জন্ম তাঁর ১৯০৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি, ল্‌গভ শহরে। শিগগিরই সেখান থেকে গলিকভ পরিবার উঠে যায় আরজামাসে। তাঁর যখন দশ বছর বয়স, তখন পিতা তাঁর শিক্ষকতা ছেড়ে সৈন্য হয়ে অর্কেস্ট্রার ঝঞ্ঝনায়, দামামার গুরুগুরুতে

যাত্রা করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফ্রণ্টে। আর ১৯১৮ সালে আমাদের দেশের ওপর যখন ক্রমেই উঁচুতে উড়ছে লাল অক্টোবরের সংগ্রামী ঝাণ্ডা, তখন চোদ্দ বছরের আর্কাদি গালিকভ সংকল্প নিলেন নিজেই লড়বেন 'সৌভাগ্যের জন্য, সুখের জন্য, জনগণের সৌভ্রাত্রের জন্য, সোভিয়েত রাজের জন্য।' চওড়া ছিল তাঁর কাঁধ, কিন্তু বয়সের অনুপাতে বেশী লম্বা। বয়স কতো জিজ্ঞেস করায় বাড়িয়ে বলেন ষোলো, লাল ফৌজে নাম লিখিয়ে যাত্রা করেন ফ্রণ্টে। এক বছর পরে কিয়েভ কোর্স শেষ করে নির্বাচিত হন একটা সামরিক ইউনিটের কম্যাণ্ডার আর ষোল বছর বয়সেই হয়ে দাঁড়ান পুরো রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার।

গৃহযুদ্ধের ফ্রণ্টে দীর্ঘ একটা যশোধন্য সংগ্রামী পথ পাড়ি দেন আর্কাদি গালিকভ, ভবিষ্যৎ লেখক গাইদার। বহু বন্ধুর মৃত্যু দেখেছেন তিনি, সয়েছেন পরাজয়ের জ্বালা আর ক্ষোভ, অনুভব করেছেন বিজয়ের উড্ডীন উল্লাস। শোক আর বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে, আঘাতের যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের আগুনের মধ্যে দিয়ে কেটেছে গাইদারের কৈশোর।

লাল ফৌজে তিনি থাকেন ছয় বছর। তাঁর অনাবিল ও অশান্ত অস্তিত্বের পুরোটা দিয়ে তিনি ভালোবেসেছিলেন সোভিয়েত দেশের লাল ফৌজকে, আপন করে নিয়েছিলেন সামরিক পরিবারটাকে, ভেবেছিলেন সারা জীবনই কাটাবেন সেখানে। কিন্তু ১৯২৩ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি, মাথায় পুরনো অভিঘাতটা জানান দেয়। চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে, আর ১৯২৪ সালের এপ্রিলে যখন তাঁর বিশ বছর পূর্ণ হল, তখন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল রেজিমেণ্টের মজুত কম্যাণ্ডার হিসেবে।

মেডিকাল কমিশনের এই নির্দেশে গাইদার প্রচণ্ড দুঃখ ও হতাশা বোধ করেন। ফৌজের বাইরে জীবন কাটানো তাঁর পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। আবেগভরা একটা বিদায়পত্র লিখে তিনি পাঠিয়ে দেন মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ ফ্রুঞ্জের কাছে। তাতে ছিল না কোনো অনুরোধ, কোনো অভিযোগ, লাল ফৌজের কাছ থেকে স্রেফ বিদায় নিচ্ছেন গাইদার — কিছু আশা করে নয়, কোনো ভরসা নিয়ে নয়। কিন্তু সে চিঠি পেয়ে খ্যাতনামা এই প্রলেতারীয় সেনানায়ক, বিপ্লবের এক অসাধারণ কম্যাণ্ডার ও জনকমিসার পত্রলেখককে ডেকে পাঠান। 'বিদায়পত্র'র শোকাচ্ছন্ন ছত্রগুলির মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সত্যিকারের এক অসামান্য প্রতিভা, সাহিত্যের প্রতি

একটা পরিণত আকর্ষণ এবং ভুল করেন নি তিনি: ফ্রুঞ্জের সঙ্গে দেখা হবার এক বছর আগে থেকেই আর্কাদি পেত্রোভিচ তাঁর প্রথম আত্মজীবনীমূলক কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলেন। ফ্রুঞ্জে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। ১৯২৫—১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় আর্কাদি গাইদারের কয়েকটি ছোটো গল্প ও উপন্যাস।

১৯৩০ সালে বেরয় তাঁর সেরা একটি বই 'ইশকুল'। গাইদার বলেন, 'ফৌজে আমি তখনো ছিলাম বাচ্চা, সম্ভবত সেইজন্যেই সাধ হয়েছিল নতুন ছেলে-মেয়েদের বলি কেমন ছিল সে জীবনটা, কি করে সব শুরু হয়, এগিয়ে যায়, কেননা যতই হোক, দেখার সুযোগ তো আমার কম হয় নি।' বিপ্লবের তরুণ পুরুষেরা যে কঠোর বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে গেছে, তা নিয়েই রচিত হল একটি বৃহৎ উপন্যাস — 'ইশকুল'।

খুব বেশি লিখে যেতে পারেন নি গাইদার। কিন্তু উৎসুক চোখে যারা দুনিয়াটাকে দেখতে চায়, বুঝতে চায়; কৈশোরেই নিজেদের স্বস্থান খুঁজে পেতে চায়, তারা চিরকাল গাইদারের 'র.ভ.স.', 'ইশকুল', 'চার নম্বর ডাগ-আউট', 'দূর দেশ', 'সামরিক গুপ্ততথ্য', 'নীল পেয়ালা', 'ড্রাম-বাজিয়ের ভাগ্য', 'বনে ধোঁয়া', 'চুক আর গেক'-এর মতো বই, রণক্ষেত্রের চিত্র, কাহিনী, আমাদের দেশের সীমানা পেরিয়ে বহুশ্রুত 'তিমুর আর তার দলবল' পড়তে চাইবে সাগ্রহে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে 'শক্ত রক্তনক্ষত্র রক্ষীবাহিনী' গড়ে তোলা, 'ইজ্জত', 'সাহস', 'ন্যায়'-এর মহনীয় তাৎপর্য তাদের মনে গেঁথে দেওয়া — এই ছিল আর্কাদি গাইদারের সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য।

স্বাধীনতাচেতা জনগণের সৌভ্রাত্র আর বিপ্লবের মহতাদর্শ নিয়ে লেখা তার 'সামরিক গুপ্ততথ্য' বইয়ে আছে গুপ্ততথ্য আর মালচিশ-কিবালচিশের কাহিনী। পুরনো রূপকথার ঢঙে তা খানিকটা রীতিসিদ্ধ শৈলীতে আঁকা হলেও গাইদারের কাছে যা অন্তরঙ্গ সেই নির্মল হৃদয়ের সুকঠোর ও আবশ্যিক শৌর্যের স্তুতিগানে মুখরিত এই শিশু-অভিজ্ঞান বইয়ের কাঠামো ছাড়িয়ে একটা স্বাধীন সত্তা লাভ করেছে। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, সারা বিশ্ব যখন চমৎকৃত হয় আমাদের বয়স্ক ও নাবালকদের অভূতপূর্ব বীরত্বে, তখন বারম্বার লোকের মনে পড়েছে গাইদারের কাহিনীর 'বড়ো বুর্জোয়া'-র এই উক্তি: 'কী দেশ এটা, একেবারে বোঝা

দায়, একটা ছোট্ট বাচ্চাও সামরিক গুপ্ততথ্য জানে আর এমন করে তা চেপে রাখতে পারে!'

থেকে থেকে রোগের প্রকোপে তিনি অকর্মণ্য হয়ে পড়তেন, সৃষ্টিকর্মে ছেদ ঘটত, কিন্তু সেরে উঠেই প্রতিবার তিনি কাজে নামতেন নতুন ভাবনায়, প্রেরণায়; সৃষ্টির জন্য, বাহিনীতে ঠাঁই নিয়ে দাঁড়াবার জন্য গাইদারের অদম্য অনুপ্রাণনা শক্তির কাছে হটে যেত ব্যাধি।

১৯৪১ সালের হেমন্তে তিনি ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সাংবাদিক। স্বেচ্ছায় তিনি শত্রুর পেছনে থেকে নীপার এলাকার অরণ্যে পার্টিজানদের সঙ্গে সামিল হন। ফ্রণ্ট পেরিয়ে তাঁর স্বদেশে ফেরার জন্য বিমানের প্রস্তাব এসেছিল একাধিক বার। বাহিনী ছেড়ে যেতে আপত্তি করেন গাইদার, বরাবরের মতোই তিনি বিশ্বস্ত থাকেন তাঁর সৈনিক-কর্তব্যবোধে। পরিবেষ্টন বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসার সময় বৃহৎ একটা শক্তিশালী দল গাইদারকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজী হন না গাইদার, নিজের পার্টিজান বাহিনী ছেড়ে যেতে চান নি তিনি।

১৯৪১ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে চার জন পার্টিজানের সঙ্গে গাইদার যান কানেভ-জোলোতোনোশা রেলপথের কাছাকাছি লেপলিয়াভো গ্রামে সামরিক সন্ধান-কার্যের জন্য। এখানেও তিনি ছিলেন সবার আগে — গাইদার-পথপ্রদর্শক।

ফ্যাশিস্ট এস-এস'দের একটা বড়ো বাহিনী ওঁত পেতে ছিল ক্রসিঙের কাছে। পার্টিজানদের ছোট্ট জোটটা এখানে এসে পড়ে ঠিক ভোরের সময়। ফ্যাশিস্টদের প্রথম দেখেন গাইদার। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বোঝেন যে, তাঁর পেছনে যে কমরেডরা আসছেন তাঁদের তিনি সাবধান করতে পারেন কেবল নিজে মরে। পুরো খাড়া হয়ে হাত তুলে যেন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এই ভঙ্গিতে গাইদার হাঁক দেন:

'এগোও, আমার সঙ্গে!..'

ছুটে যান সোজা এস-এস'দের দিকে।

শত্রুর মেসিনগান গর্জে ওঠে পার্টিজানদের দিকে। তবে ব্যাপারটা টের পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ে। গাইদার পড়ে যান রেলওয়ে বাঁধের ওপর। পড়ে যান... এবং আর ওঠেন না। মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর বুক।

রেলপথ পরিদর্শকের চোখে পড়ে তাঁর দেহ। রেলপথের কাছেই তিনি তাঁকে কবর দেন। রাতে তাঁর বাড়িতে আসে পার্টিজানরা, বলে, কী আশ্চর্য মানুষকে

তিনি গোর দিয়েছেন দিনে। তিনি সমাধিটি দেখাশোনা করার কথা দেন। দিন কয়েক পরেই গাঁয়ের সবাই জানল যে, রেলপথে সমাধিস্থ আছেন দেশখ্যাত সাহিত্যিক আর্কাদি গাইদার।

এইভাবেই অস্ত্রহাতে প্রাণ দেন তিনি, নিজের রচিত নায়কদের অনুসরণ করেন, তাঁর লেখা প্রতিটি শব্দের সততা প্রমাণ করে যান জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত।

* * *

আর্কাদি গাইদারের বই আজ পড়া হয় আমাদের সব শহরে, সব স্কুলে। বিদেশের ছেলেমেয়েরাও এসব বইয়ের কথা অনেক দিন জানে, ভালোবাসে।

যুদ্ধের পর গাইদারের দেহাবশেষ স্থানান্তরিত হয় কানেভ শহরে নীপার নদীতীরের টিলায়। সেখানে উচ্চ পাদপীঠে স্থাপিত হয়েছে ব্রোঞ্জে গাইদারের একটি আবক্ষমূর্তি। নীপার এখানে বাঁক নিয়েছে, জেটিতে আসবার বহু আগেই স্টিমার থেকে দেখা যায় গাইদারের সমাধি...

ঠিক তাই ঘটেছে, যা হয়েছিল 'সামরিক গুপ্ততথ্যের' কাহিনীতে: 'মালচিশ-কিবালচিশকে গোর দেওয়া হয় নীল নদীর সবুজ টিলায়...

জাহাজ আসে, বলে, ধন্যি খোকা!
বিমান আসে, বলে, ধন্যি খোকা!
এঞ্জিনও যায়, ধন্যি তোরে খোকা!
আসে তরুণ পাইওনিয়র,
সেলাম তোরে খোকা!'

লেখক: **লেভ কাসসিল**

(গাইদার সম্বন্ধে রেখাচিত্র থেকে)।

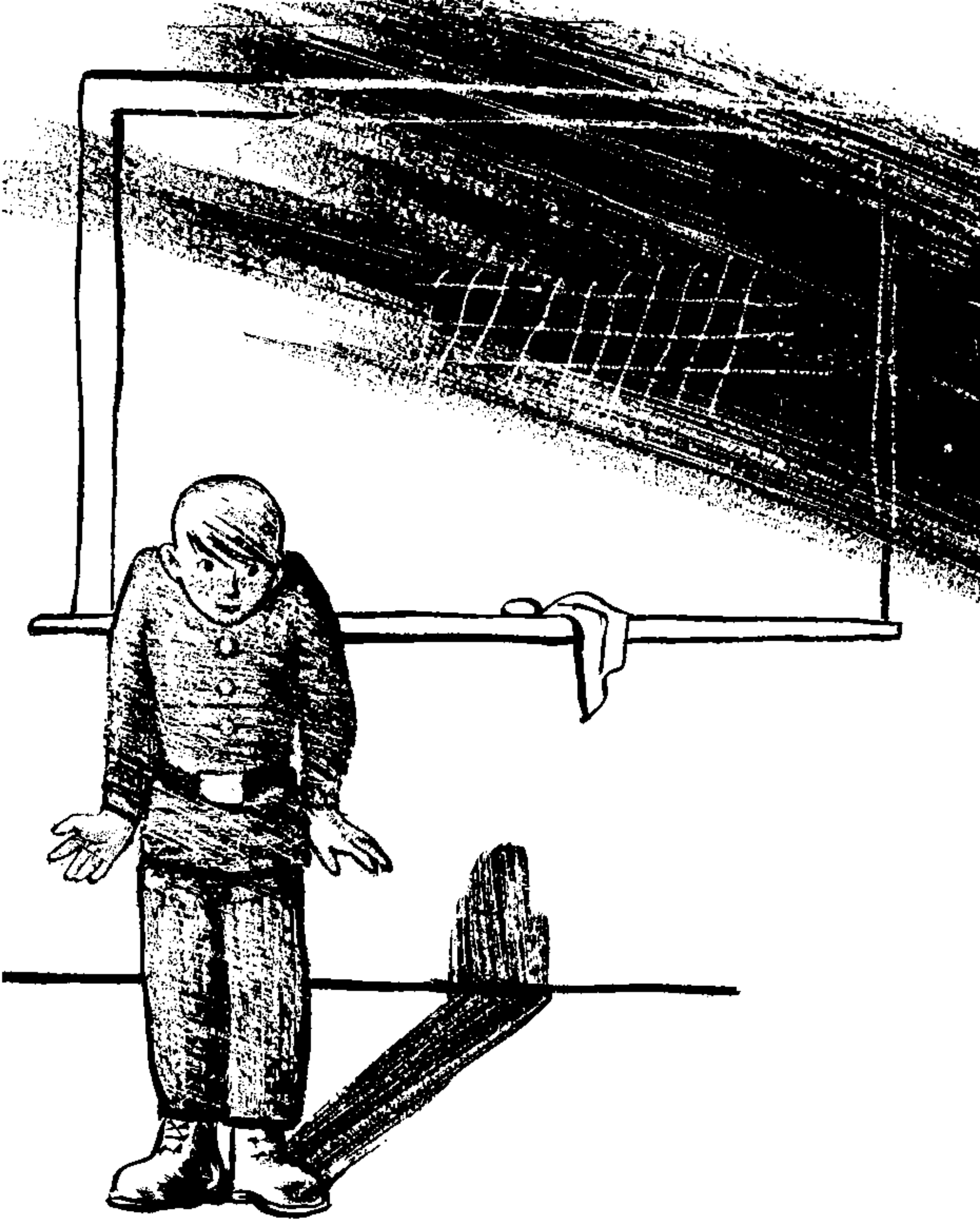

ইছামতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের আর্‌জামাস শহরটি ছিল ভারি শান্ত আর ছোট্ট একটুখানি জায়গা, নড়বড়ে বেড়ায়-ঘেরা ফুল আর ফলের বাগানের ছায়া-ঢাকা। ওই সব বাগানে ফলে থাকত অসংখ্য 'বাপ-মা চোরি' আর অসময়ে-পাকা আপেল, কিংবা ফুটত থরে থরে ব্ল্যাকথর্ন আর রাঙা পিয়োনি ফুল।

আর বাগানের আশেপাশে সারা শহর জুড়ে ছিল যত সব নিস্তরঙ্গ, এঁদো পুকুর। ভালো মাছ বলতে যা-কিছু ছিল পুকুরে, তার বংশ লোপাট হয়ে গিয়েছিল কোন কালে, পুকুরগুলোয় ছিল কেবল হড়হড়ে চুনোপুঁটি আর চট্‌চটে ব্যাঙের রাজত্ব। দূরে, পাহাড়ের পা ঘেঁষে বইত ছোট্ট নদী তেশা।

শহরটাকে দেখলে মনে হত যেন পুরোটাই সন্ন্যাসীদের একটা মঠ। গোটা তিরিশেক গির্জে আর চার-চারটে পাঁচিল-ঘেরা আশ্রম ছিল শহরটাতে। অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার ঘটাতে পারে মেরীমাতা বা যিশুর এমন অনেক মূর্তি ছিল আমাদের শহরে। কিন্তু কেন জানি না, আর্‌জামাসে অলৌকিক ব্যাপার বড়-একটা ঘটত না। এর কারণ হয়ত এই যে আমাদের শহর থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল সেই বিখ্যাত সারোভো আশ্রম আর সেখানকার বাসিন্দা যত পুণ্যাত্মা সাধুসন্তই অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সব নিজেরা একচেটে করে রেখেছিলেন।

আর তখন প্রায়ই শোনা যেত সারোভোতে আজব সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছে। যেমন, কখনও অন্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, পঙ্গু উঠে হাঁটাচলা করছে, আবার কখনও-বা জন্ম-কুঁজো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে, এইসব। কিন্তু আমাদের মূর্তি বা আইকনের সামনে এমন তাজ্জব কাণ্ড কখনও ঘটতে দেখি নি।

আমাদের শহরের মিত্‌কা বেদে ছিল ভবঘুরে আর নামকরা মাতাল। ফি-বছর দ্বাদশতিথি*-তে এক বোতল ভোদ্‌কার বাজি জেতার জন্যে সে জানুয়ারি মাসের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় নদীর ওপরে জমা বরফের ফাঁক-ফোকর দিয়ে জলে নেমে স্নান করত। কী আশ্চর্য, একদিন গুজব রটল এহেন মিত্‌কার নাকি দিব্যদর্শন

---

* দ্বাদশতিথি — ক্রিস্‌মাস বা যিশুর জন্মদিনের পর দ্বাদশ দিনটি বা ৬ই জানুয়ারি। প্রাচ্যের প্রাজ্ঞ মানুষদের সামনে যিশুর আবির্ভাবের দিন হিসেবে ওই দিনে গির্জেয় উৎসব পালিত হয়। — সম্পাঃ

ঘটেছে, সে মদ ছেড়ে দিয়েছে। আরও শোনা গেল, তার জীবনের মোড় গেছে ঘুরে, 'পরিত্রাতার' মঠ-এ সে নাকি সন্ন্যাসী হবে বলে দীক্ষা নিতে যাচ্ছে।

খবর শোনামাত্র লোকে ছুটল 'পরিত্রাতার' মঠ-এ। আর, কী আশ্চর্য, সেখানে গিয়ে দেখা গেল গির্জের গায়করা যেখানে দাঁড়িয়ে গান করে তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে মিত্‌কা কোমর পর্যন্ত সামনে হেলিয়ে নমস্কার জানাচ্ছে সবাইকে আর পাপকাজ যা-কিছু করেছে তার জন্যে সকলের সামনে অনুতাপ প্রকাশ করছে। এমনকি আগের বছর ব্যাপারী বেবেশিনের একটা ছাগল চুরি করে ও যে বিক্রি করেছিল আর সেই পয়সায় মদ খেয়েছিল, তা পর্যন্ত স্বীকার করল। আর এ দেখে ব্যাপারী বেবেশিনের চোখে জল এসে পড়ে আর কী! মিত্‌কার আত্মার মুক্তির জন্যে একটা মোমবাতি কিনে গির্জেয় জ্বালিয়ে দিতে তিনি মিত্‌কাকে পুরোপুরি একটা রুব্‌লই দিয়ে বসলেন। আর তা-ই বা বলি কেন, পাপীতাপী লোকটার জীবনের ধারা বদলানোর ও ধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসার এই তাজ্জব দৃশ্য দেখে অনেক লোকেই সেদিন চোখের জল ফেলেছিল।

পুরো হপ্তা জুড়ে এমনি সব হই-হল্লা চলল, আর তারপর ঠিক যেদিন মিত্‌কার দীক্ষা নেয়ার কথা সেইদিন দেখা গেল মিত্‌কা গির্জেয় গরহাজির। তা তার উলটো ধরনের অন্য কোনো দিব্যদর্শনের জন্যে, নাকি আর কোনো কারণে, তা কেউ বলতে পারলে না। এদিকে গির্জের যজমান-পাড়ায় গুজব রটে গেল, মিত্‌কা নাকি নোভোপ্লোতিন্নাইয়া স্ট্রিটের পাশে নালার মধ্যে পড়ে আছে আর তার পাশে পাওয়া গেছে ভোদ্‌কার একটা খালি বোতল।

ডীকন পাফ্‌নুতি ও গির্জের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবসাদার সিনিউগিনকে তাড়াহুড়ো করে ঘটনাস্থলে পাঠানো হল লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু ওই দুই ভদ্রলোক ঘটনাস্থল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে রেগেমেগে জানিয়ে দিলেন মিত্‌কার সত্যিই জ্ঞানগম্যি নেই, পাঁকে-পড়া শুয়োরের মতো পাশে দ্বিতীয় খালি একটা বোতল নিয়ে শুয়ে আছে সে। আর যখন অনেক ধাক্কাধাক্কির পর ওঁরা তাকে জাগালেন, তখন সে খিস্তি করতে শুরু করল, সটান জানিয়ে দিল সে এতই পাপীতাপী আর এত অযোগ্য যে, সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যাপারে মতটাই সে পাল্‌টে ফেলেছে।

আমাদের ছিল শান্ত গির্জে-গুঞ্জন-মানা শহর। পরবের দিনগুলোয়, বিশেষ করে ইস্টারের আগের সন্ধেগুলোয়, যখন শহরের তিরিশটা গির্জের ঘণ্টা একসঙ্গে বাজতে থাকত, তখন শহরের আকাশেবাতাসে এমন একটা সোরগোল উঠত যে চারপাশের কুড়ি মাইলের মধ্যে সমস্ত গ্রামে সেই আওয়াজ পেঁছত।

যিশুর ভবিষ্যৎ জন্মঘোষণার (বা অ্যানান্সিয়েশন) নামাঙ্কিত গির্জের ঘণ্টার আওয়াজ তখন উঠত সব গির্জের ঘণ্টাধ্বনি ছাপিয়ে। আমাদের 'পরিত্রাতার' মঠের ঘণ্টাটা ছিল আবার ফাটা। বাজবার সময়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে গুরুগম্ভীর উদারায় কর্কশ আওয়াজ তুলত। 'সন্ত নিকোলাসের' মঠের ছোট ঘণ্টাগুলো আবার বাজত তীব্র রিন্‌রিনে সুরে। আর এই তিন প্রধান গায়েনের সঙ্গে দোহার হয়ে ধুয়ো ধরত অন্য সব গির্জের ঘণ্টাঘর। এমনকি শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছোট্ট জেলখানাটার শাদাসিধে গির্জেও এই সর্বজনীন বেসুরো ঐকতানে গলা মেলাত।

ঘণ্টাঘরের মিনারের মাথায় উঠতে ভারি ভালো লাগত আমার। একমাত্র ইস্টারের সময়ই বাচ্চাদের ঘণ্টাঘরে উঠতে দেয়া হত। ওপরে যেতে অন্ধকার সরু সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত অনেকটা। দেয়ালে পাথরের কুলুঙ্গির ভিতর থেকে শোনা যেত পায়রার মিষ্টি-মিষ্টি বকবকম। সিঁড়িতে এত অসংখ্য বাঁক থাকত যে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরত। ঘণ্টাঘরের ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যেত পুরো শহর: পাহাড়ের নিচে দিয়ে বয়ে-যাওয়া তেশা নদী, পুরনো ময়দা-কল, ছাগুলে দ্বীপ, ঝোপঝাড়, তার আরও ওধারে খাদের খোয়াই আর শহর-ঘেরা নীল বনরেখা।

আমার বাবা ছিলেন দ্বাদশ সাইবেরিয়ান রাইফেল রেজিমেন্টের সৈনিক। ওই রেজিমেন্ট ছিল তখন জার্মান ফ্রন্টের রিগা আঞ্চলিক অংশে।

ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন। আমার মা ছিলেন হাসপাতালে ডাক্তারের সহকারী। সবসময়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। আমি বেড়ে উঠেছিলুম নিজের মতো করে একরকম। প্রতি সপ্তায় ক্লাসের রিপোর্ট-কার্ড সই করাতে মা-র কাছে নিয়ে যেতুম। বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে ড্রইং কিংবা হাতের লেখায় খারাপ নম্বর দেখলে মাথা নাড়তেন মা, বলতেন:

'এ কী!'

'আমার কী দোষ, মা? আঁকতে না পারলে আমি কী করব? মাস্টারমশাইকে আমি ঘোড়া এঁকে দেখালুম, তা তিনি বললেন, এটা ঘোড়া নয় শুয়োর। পরের বার ওই আঁকাটাই তাঁকে দেখিয়ে বললুম, শুয়োর এঁকেছি, মাস্টারমশাই। কিন্তু তিনি চটে উঠে বললেন, এটা শুয়োরও নয়, ঘোড়াও নয়, এটা যে কী তা শয়তানই জানে। আমার দ্বারা শিল্পী হওয়া হবে না, মা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু হাতের লেখায় আবার গণ্ডগোল কেন? দেখি তো তোমার এক্সারসাইজ-খাতা। হায় হায়, এ কী বিতিকিচ্ছি ব্যাপার! প্রত্যেক লাইনে কালি ধ্যাবড়ানো, আবার পাতার ফাঁকে একটা থ্যাঁত্‌লানো গুবরে-পোকা। উহ্‌, কী জঘন্য!'

'আচমকা কালি ধেবড়ে গেছে, তো আমি কী করব। আর ওই গুবরে-পোকাটার জন্যে আমার কী দোষ? আমি তো আর ইচ্ছে করে পোকাটাকে পাতার ফাঁকে পুরে রাখি নি। বোকা পোকাটা কী করে যেন পাতার ফাঁকে ঢুকে চেপ্‌টে রয়েছে, তার জন্যে আমার দোষ হল? হুঃ, হাতের লেখা নিয়েও আবার মাথা ঘামাতে হবে, ওটা নাকি আবার বিজ্ঞান! আমি মোটেই লেখক হতে চাই না।'

'তাহলে কী হতে চাও, শুনি?' রিপোর্ট-কার্ডে সই করতে-করতে মা কড়াভাবে শুধোলেন, 'কুঁড়ের বাদশা? ইন্‌স্পেক্টর আবার কার্ডে লিখে দিয়েছেন ফায়ার-প্লেসের চিমনি বেয়ে তুমি স্কুলের ছাদে উঠেছিলে। কী মতলব তোমার? চিমনি-পোঁছা ঝাড়ুদারের কাজ শিখতে চাও নাকি?'

'না-না-না। আমি শিল্পী হতে চাই না, লেখক হতে চাই না, চিমনি-পোঁছা ঝাড়ুদারও হতে চাই না। আমি নাবিক হব।'

'কেন, নাবিক কেন?' থতমত খেয়ে মা শুধোলেন।

'আর কিচ্ছুটি নয়। সব ঠিক করে ফেলেছি। বুঝতে পারছ না, কী দারুণ মজার কাজ?'

তবু মা মাথা নাড়লেন।

'যত সব বিদঘুটে খেয়াল! আর কখনও যদি বাজে-বাজে নম্বর বাড়িতে এনেছ তো দেখাব মজা। এমন মার দেব না যে তোমার নাবিক হওয়া বের করে দেব।'

আহা, বললেই হল! মা আমাকে যেন কতই মারছেন। আমার গায়ে কোনোদিন একটা আঙুলও ছোঁয়ান নি তিনি। একবার শুধু আমাকে বাড়ির যে-ঘরে ভাঙাচোরা

জিনিসপত্র থাকত সেই ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে পরদিন সারা দিন ধরে মাংসর পিঠে নিয়ে অনেক সাধাসাধি করেছেন আর সিনেমায় যাওয়ার জন্যে বিশ কোপেক পর্যন্ত দিয়েছেন। আহা, ওইরকম আমাকে যদি আরও কয়েক দিন বন্ধ করে রাখতেন মা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন কোঁত্-কোঁত্ করে সকালবেলার চা-টা গিলে, কোনোরকমে বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে ইশকুলের দিকে দৌড়চ্ছি, এমন সময় পথে দেখা হয়ে গেল তিম্‌কা শ্‌তুকিনের সঙ্গে। তিম্‌কা আমার ক্লাসের বন্ধু। ছোট্ট ছেলে, ভারি ছটফটে।

এমনিতে তিম্‌কা শ্‌তুকিন ছিল নেহাত নিরীহ, গোবেচারা। তার নাকে যখন তখন স্বচ্ছন্দে ঘুষিটা-আশটা বসিয়ে দেয়া চলত, পাল্‌টা মার খাওয়ার ভয় ছিল না। তিম্‌কা খুশিমনে বন্ধুদের আধ-খাওয়া স্যান্ড্‌উইচ খেয়ে ফেলে তাদের খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাত, একছুটে ইশকুলের পাশের মুদির দোকানে গিয়ে ইশকুলে টিফিন করার জন্যে রুটি কিনে আনত। কেবল মাস্টারমশাইকে আসতে দেখলে ভয়ে-ভয়ে কেমন-যেন চুপ করে যেত, যদিও ভয় পাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।

একটিমাত্র সাংঘাতিক নেশা ছিল তিম্‌কার — ভারি পাখি ভালোবাসত ও। ওর বাবার ওপর ছিল কবরখানার লাগোয়া গির্জের দেখাশোনার ভার। ওই গির্জেয় একটা ছোট্ট আস্তানা ছিল তাঁর। আস্তানাটা ছিল নানা জাতের পাখি-ভরতি খাঁচায় বোঝাই। তিম্‌কা নিজে পাখি কেনাবেচা করত, এর-তার সঙ্গে বদলাবদলি করত, আবার কবরখানায় জাল কিংবা ফাঁদ পেতে পাখি ধরতও।

একদিন হল কী, ব্যাপারী সিনিউগিন তাঁর ঠাকুমার সমাধি দর্শন করতে এসে দেখতে পেলেন সমাধির পাথরের ফলকের ওপর শণের বীজ ছড়ানো আর একটা টানা দড়িতে-বাঁধা জাল পাতা। অর্থাৎ, পাখি ধরার ফাঁদ তৈরি। সিনিউগিনের নালিশে সেদিন বাপের হাতে খুব একচোট মার খেয়েছিল তিম্‌কা। আর আমাদের ধর্ম-শিক্ষার মাস্টারমশাই ফাদার গেন্নাদি বাইবেল-ক্লাসে বিরক্তির সুরে বলেছিলেন:

'সমাধির উপর প্রস্তরফলক মৃত ব্যক্তির স্মরণেই স্থাপন করা হয়, অন্য কোনো কারণে নয়। সেই ফলকের উপর ফাঁদ পাতা বা অন্য কোনো শিকার ধরার কৌশল রচনা পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার সামিল।'

বক্তৃতার মধ্যে তিনি মানবজাতির ইতিহাস থেকে এমন বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিলেন যে-সব ক্ষেত্রে এই ধরনের অধর্মের ফলে অপরাধীর মাথায় দৈবশক্তির কঠোর শাস্তি নেমে এসেছিল।

একথা বলতেই হবে যে, খুঁজে খুঁজে যুতসই উদাহরণ বের করার ব্যাপারে ফাদার গেম্নাদি ছিলেন একেবারে ঝানু ওস্তাদ। আমার মনে হয়, যদি তিনি জানতে পারতেন যে ওই ঘটনার আগের সপ্তায় ইশকুল থেকে অনুমতি না-নিয়ে আমি সিনেমায় গিয়েছিলুম, তাহলে তিনি স্মৃতি হাঁটকে এমন কিছু ঐতিহাসিক নজির খুঁড়ে বের করতেন যাতে পরিষ্কার দেখানো থাকত অপরাধীকে ইহজীবনেই ঈশ্বরের ক্রোধের ফল ভুগতে হয়েছে।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ইশকুল যেতে সেদিন দেখলুম তিম্‌কা থ্রাশ্‌-পাখির মতো মনের আনন্দে শিস্‌ দিতে দিতে হেঁটে চলেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ও বন্ধুভাবে চোখ টিপল, আবার সেইসঙ্গে আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতেও তাকাল। ওর ভাবখানা এইরকম যেন ছেলেটা অত কাছ ঘেঁষে আসছে সহজ মনে তো, নাকি আসছে কোন শয়তানী মতলব নিয়ে?

আমি বললুম, 'তিম্‌কা, ইশকুলে কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে যাবে। পড়া শুরু হওয়ার আগে পেঁছিলেও প্রার্থনায় নির্ঘাত যোগ দিতে পারব না।'

'কেউ টের পাবে না তো?' কথা শুনে মনে হল ও ভয় পেয়েছে, আবার কৌতূহলও বেড়ে উঠেছে যেন।

'সব্বাই টের পাবে, মাইরি। হ্যাঃ, কী আর হবে, বড়জোর আমাদের দুপুরের খাওয়া বন্ধ করে দেবে। এই আর কী।' ধমক খেতে হবে শুনলে তিম্‌কা যে কী সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যায় তা জানতুম। তাই যেন কিছুই হয় নি এমন শান্তভাবে ওকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে কথাগুলো বললুম।

কেমন-যেন চুপসে গেল তিম্‌কা। তাড়াতাড়ি পা চালাতে-চালাতে চিন্তিতভাবে বলল: 'আমার কী দোষ বল্‌! আমায় এক মিনিটের জন্যে বাড়িতে থাকতে বলে বাবা গির্জের তালা খুলতে গেল। তা গেল তো গেলই। পুরো উপাসনা কাটিয়ে তবে ফিরল। জানিস, ভাল্‌কা স্পাগিনের মা এসেছিল ওর জন্যে প্রার্থনা করাতে।'

শুনে মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার। 'অ্যাঁ, কী বললি? ভাল্‌কা স্পাগিনের জন্যে? কেন? মারা গেছে নাকি?'

'আরে, না-না, মড়ার জন্যে উপাসনা নয়, ওর খোঁজ পাওয়ার জন্যে।'

'খোঁজ পাওয়ার জন্যে? কী বলছিস তুই?' কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল আমার। 'যাঃ, তুই বানিয়ে বলছিস তিম্‌কা। নাকে এক ঘুসি ঝাড়ব কিন্তু বলে দিচ্ছি... জানিস, কাল আমি ইশকুলে যাই নি রে। আমার জ্বর হয়েছিল তো।'

সঙ্গে-সঙ্গে তিম্‌কাটা টিট-পাখির মতো শিস দিতে শুরু করল, 'তুইত্‌-তুইত্‌... তা-রা-রা...' আর চলতে লাগল এক-ঠ্যাঙে লাফিয়ে-লাফিয়ে। এমন জবর খবরটা ও-ই প্রথম আমায় দিতে পারায় দারুণ খুশি ও। বলল, 'ঠিক-ঠিক, তুই কাল ইশকুলে ছিলি না বটে। চুঃ-চুঃ, গেলে দেখতে পেতিস কী কাণ্ডটাই না হল!'

'কী হল রে?'

'বলছি-বলছি। ক্লাসে বসে আছি আমরা, বুঝলি। আর প্রথমেই ছিল ফরাসির ক্লাস। বুড়ি ডাইনী আমাদের ক্রিয়াপদ না-শিখিয়ে ছাড়বে না: আলে (যাওয়া) আরিভে (পৌঁছনো), আঁত্রে (প্রবেশ করা), রেস্তে (থাকা), ত'বে (পড়ে যাওয়া) — এই সব ধাতুর পুরাঘটিত সব কটা কালের রূপ। রাইয়েভ্‌স্কিকে বুড়ি ব্ল্যাক বোর্ডে ডাকল। রাইয়েভ্‌স্কি বেচারা সবে লিখতে শুরু করেছে রেস্তে, ত'বে, এমন সময় আচমকা গেল দরজা খুলে। আর ঘরে কে ঢুকল বল্‌ দেখি? একেবারে খোদ ইন্‌স্পেক্টর (নামটা বলে তিম্‌কা নিজেই ভয়ে শিটিয়ে উঠল), হেডমাস্টার-মশাই (বলেই এমনভাবে আমার দিকে তাকাল তিম্‌কা যেন ভাবখানা এই, ব্যাপার বুঝলি তো?) আর আমাদের ক্লাস-টিচার। আমরা যে-যার জায়গায় বসার পর হেডমাস্টার-মশাই বলা শুরু করলেন: 'বিদ্যার্থীবৃন্দ, একটা দুঃসংবাদ দেব তোমাদের। তোমাদেরই ক্লাসের একটি ছাত্র স্পাগিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। বাড়িতে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সে, তাতে বলেছে সে নাকি জার্মান ফ্রন্টে যুদ্ধে যাচ্ছে। বিদ্যার্থীবৃন্দ, আমি কল্পনাও করতে পারি না যে সে তার ক্লাসের বন্ধুদের না জানিয়ে এ-কাজ করেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকে আগে থেকে ওর এই পালানোর কথা জানতে, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে আমায় আর খবরটুকু দাও নি তোমরা। বিদ্যার্থীবৃন্দ, আমি বলতে চাই...' — পাক্কা আধ ঘণ্টারও বেশি এইভাবে হেডমাস্টার-মশাই মুখ চালালেন।'

আমার বুকটা ধক করে উঠল। ও, তাহলে এ-ই ব্যাপার! দ্যাখো কাণ্ড, ঠিক যেদিন কিনা অসুখের ওজর দেখিয়ে ইশকুল পালালুম সেইদিনই এমন সব জবর

কাণ্ডকারখানা ঘটল, এমন সব সাংঘাতিক খবর আমি যার বিন্দুবিসর্গ জানি না! আর না ইয়াশ্‌কা সুক্কারস্তেইন, না ফেদ্‌কা বাশ্‌মোকভ, কেউই এসে ইশকুলের ছুটির পর খবরটা আমায় জানিয়ে গেল না। আবার বলে, আমি নাকি ওদের প্রাণের বন্ধু! ফেদ্‌কার খেলার পিস্তলের জন্যে যখন গুলির দরকার হয় তখন আমি ওর মস্ত বন্ধু বনে যাই। তখন আমার কাছে আসে ও। আর তার বদলে কিনা আমার সঙ্গে এমনি ব্যবহার! ইশকুলের অর্ধেক ছেলে ফ্রণ্টে পালিয়ে যাবে, আর আমি গাধার মতো বসে থাকব এখানে!

দমকলের গাড়ির মতো বেগে ঢুকলুম ইশকুলে। কোটটা খুলে লুকিয়ে ফেলে কৌশলে তত্ত্বাবধায়ককে এড়িয়ে প্রার্থনার হলঘর থেকে বেরিয়ে-আসা ছেলের ভিড়ে মিশে গেলুম।

ভাল্‌কা স্পাগিনের বীরের মতো বাড়ি ছেড়ে পালানোর এই খবরটা নিয়ে এরপর কয়েকদিন সারা ইশকুল বেশ খানিকটা সরগরম হয়ে রইল।

আমরা অনেকেই ভাল্‌কার গোপন প্ল্যানের খবর জানি একথা হেডমাস্টার-মশাই কী করে ভাবলেন জানি না। কিন্তু তিনি ভুল ভেবেছিলেন। আসলে আমরা কেউই এর কিছু জানতুম না। ভাল্‌কা স্পাগিন যে পালিয়ে যেতে পারে একথা কখনও কারও মাথায় আসে নি। ছেলেটা ছিল নেহাতই গোবেচারা। কখনও নিজেকে কোনো উটকোঝামেলায় জড়াত না, পাড়াপড়শীর ফলবাগানে চুরির দলেও থাকত না সে, সব সময়েই থাকত জড়সড় হয়ে — এক কথায়, ছেলেটা ছিল নিতান্ত মিন্‌মিনে। এমন একটা কাজ করার পক্ষে ও ছিল সবচেয়ে অনুপযুক্ত!

সবাই মিলে জোর বৈঠক বসালুম আমরা। বের করবার চেষ্টা করলুম, আগে থেকে কেউ টের পেয়েছিল কিনা যে ও পালানোর তোড়জোড় করছে। দূর ছাই, কেউ কি ঠিক টাইমমাফিক মাথায় টুপি চড়িয়ে ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু না-জানিয়ে সটান যুদ্ধে চলে যেতে পারে নাকি!

ফেদ্‌কা বাশ্‌মোকভের মনে পড়ল, ও ভাল্‌কাকে রেলরাস্তার একটা ম্যাপ হাতে একবার দেখেছিল বটে।

ফেল-করা দুবিলভটা বললে, এই সেদিন একটা দোকানে গিয়ে ও দেখেছিল ভাল্‌কা পকেট-টর্চের ব্যাটারি কিনছে। কিন্তু হাজারো জেরা করা সত্ত্বেও ভাল্‌কার পালানোর গোপন যোগাড়যন্ত্র সম্বন্ধে আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

উত্তেজনায় সারা ক্লাসটা যেন টগবগ করে ফুটল ক-দিন। প্রত্যেকেই এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, চরকি-পাক খেতে লাগল এধার-সেধার, পড়া-ধরার সময় ভুলভাল উত্তর দিতে লাগল। সাধারণ সময়ে যত ছেলেকে শাস্তি হিসেবে ছুটির পরে ইশকুলে আটক থাকতে হয়, দেখা গেল, তার সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এইভাবে কাটল কয়েক দিন। তারপর আচমকা আবার খবরের মতো খবর — প্রথম শ্রেণীর মিত্‌কা তুপিকভ বলে একটা ছেলে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

ইশকুলের কর্তৃপক্ষ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন।

ফেদ্‌কা চুপিচুপি আমায় জানাল, 'আজকের বাইবেল-ক্লাসে এইসব পালানোর ব্যাপার নিয়ে একটা বক্তৃতা হবে, বুঝেছিস। খাতা নিয়ে টিচার্স রুমে যখন ঢুকেছিলুম তখন শুনলুম স্যাররা এই নিয়ে বলাবলি করছেন।'

আমাদের ইশকুলের ধর্মযাজক ফাদার গেন্নাদির বয়েস সত্তর বছরের কাছাকাছি। ঘন দাড়ি আর ভুরুতে মুখটা ভরা, এক ইঞ্চি ফাঁকও চোখে পড়ত না। ফাদার ছিলেন দিব্যি মোটাসোটা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকে দেখতে হলে তাঁকে সারা শরীরটাই ঘোরাতে হত। তাঁর আবার ঘাড় বলতে কিছু ছিল না কিনা, তাই।

ছেলেরা ওঁকে পছন্দ করত। ওঁর ক্লাসে যা-খুশি করা চলত — তাস খেলা, ছবি আঁকা, কিংবা ওল্ড টেস্টামেণ্ট বইটি সরিয়ে সেই জায়গায় নিজেদের টেবিলে নিষিদ্ধ ন্যাট পিংকারটন বা শার্লক হোম্‌সের বই রেখে দেয়া, সবকিছু। ফাদার গেন্নাদি আবার দূরের জিনিস ভালো দেখতে পেতেন না কিনা তাই।

সেদিন ফাদার গেন্নাদি হাতখানি যথারীতি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে ক্লাসে ঢুকছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাস-মনিটর চিৎকার করে উঠল:

'ঈশ্বরই পিতা, সান্ত্বনাদাতা, সত্যের আত্মস্বরূপ...'

ফাদার গেন্নাদি আবার কানে ছিলেন খাটো। তিনি সবসময়েই চাইতেন ছেলেরা প্রার্থনাবাক্যগুলি দরাজ গলায় স্পষ্ট করে উচ্চারণ করুক। কিন্তু সেদিন তাঁরও মনে হল, মনিটর যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে। তাই হাত নেড়ে কঠিন স্বরে বললেন:

'চুপ, চুপ... কী, হচ্ছে কী? কোথায় মিষ্টি সুরে পড়বে, তা নয় ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে।'

ফাদার গেন্নাদি অনেক দূরের ঘটনা নিয়ে ভণিতা শুরু করলেন। উড়নচণ্ডে ছেলের নীতিকথাটি দিয়ে শুরু করলেন বক্তৃতা। সে-সময়ে যতটুকু বুঝেছিলুম তা এই যে ছেলেটা বাপকে ছেড়ে দেশবিদেশ ঘুরতে বেরিয়েছিল, তারপর অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা, দুঃখকষ্ট সহ্য করে ছেলে আবার সুড়সুড় করে ফিরে এসেছিল ঘরে।

এর পরে তিনি আমাদের স্বাভাবিক গুণের বিকাশ সম্বন্ধে নীতিকথাটি শুনিয়েছিলেন। কীভাবে একজন লোক তার গোলামদের সবাইকে টাকা দিয়ে তাদের নিজের নিজের গুণের বিকাশ ঘটাতে বলল, কীভাবেই বা কিছু-কিছু গোলাম ব্যবসা-বাণিজ্যে ওই টাকা খাটিয়ে লাভ করল আর বাকি কেউ-কেউ টাকাটা লুকিয়ে রাখায় কিছুই পেল না এই নিয়ে নীতিকথাটি।

ফাদার গেন্নাদি সেদিন আরও বললেন, 'এই সমস্ত নীতিকথার বক্তব্য কী? প্রথম নীতিকথাটিতে এক অবাধ্য ছেলের কথা বলা হয়েছে। ছেলেটি বাপকে ছেড়ে বহুদিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল, অবশেষে তাকে বাপের আশ্রয়ে ফিরে আসতে হল। তোমাদের যে-সব সহপাঠী জীবনের দুঃখকষ্ট সহ্য করায় অনভ্যস্ত হয়ে লুকিয়ে গৃহত্যাগ করেছে, স্বেচ্ছায় তারা যে-সর্বনাশের পথ বেছে নিয়েছে, সে-পথে চলতে গিয়ে তারা যে কত কষ্টে পড়বে সে কি আর বলতে? আমি তোমাদের আবার বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জান ঘরছাড়ারা কোথায় রয়েছে, তাহলে তাদের লিখে দাও তারা যেন ঘরে ফিরতে ভয় না পায়। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটায় ফেরার সময় পার হয়ে যায় নি এখনও। মনে রেখো, প্রথম নীতিকথায় উড়নচণ্ডে ছেলে যখন ঘরে ফিরে এল, তার ধর্মভীরু বাবা তাকে ধমক দিলেন না তখন, বরং তাকে চমৎকার সব জামাকাপড় পরতে দিলেন আর পরবের ছুটির দিনে লোকে যেমনটি করে তেমনই ভোজের আয়োজন করতে মোটাসোটা বাছুরটি জবাই করতে বললেন। তেমনই এই দুটি ঘরছাড়া ছেলের বাবা-মাও তারা ফিরে এলে তাদের সব কিছু ক্ষমা করে দেবেন আর দু-হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নেবেন তাদের।'

কথাগুলো কতখানি ঠিক সে-সম্বন্ধে আমার অবিশ্যি সন্দেহ ছিল। তুপিকভ — সেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটি — ফের ঘরে ফিরে এলে তার বাবা-মা যে কী করবেন তা অবিশ্যি আমার জানা ছিল না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ছেলে ফিরে এলে রুটিওয়ালা স্পাগিন মোটেই মোটাসোটা বাছুর জবাই করতে বসবেন না, বরং নিজের পরনের বেল্ট খুলে কষে একচোট উত্তমমধ্যম লাগাবেন।

ফাদার গেন্নাদি সেদিন আরও বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক গুণের বিকাশ সম্বন্ধে নীতিকথাটিতে বলা হয়েছে, কারো স্বাভাবিক গুণ কেউ যেন পাথর-চাপা দিয়ে না রাখে। তোমরাও এখানে নানা ধরনের বিদ্যা আহরণ করছ। স্কুলের পড়া শেষ করে প্রত্যেকে তোমরা নিজ নিজ গুণ, ইচ্ছে আর সামর্থ্য অনুযায়ী পেশা বেছে নেবে। ধরো, তোমাদের মধ্যে কেউ হবে মান্যগণ্য ব্যবসায়ী, কেউ ডাক্তার, আবার কেউ-বা সরকারী কর্মচারী। তখন সকলেই তোমাদের খাতির করবে, প্রত্যেকে মনে-মনে বলবে: 'হ্যাঁ, এই যোগ্য মানুষটি নিজ গুণ পাথর-চাপা দিয়ে রাখেন নি, বরং তাকে বাড়িয়ে তুলেছেন, আর তারই ফলে জীবনের সবকিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য এখন ভোগ করতে পারছেন। এ-সবই এ'র ন্যায্য পাওনা। কিন্তু,' এইবার ফাদার গেন্নাদি আকাশের দিকে দুই হাত তুলে বললেন, 'কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এই সব আর এদের মতো আরও অনেক ঘর-পালানের কী দশা হবে বলো তো? জীবনে যে-সুযোগসুবিধে এরা পেয়েছিল তা অবহেলায় পায়ে দলে জড়দেহ আর আত্মার পক্ষে সমান সর্বনাশা দুঃসাহসিক রোমাঞ্চের সন্ধানে এই যে এরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, তাদের কী হবে? সুকুমার কুসুমের মতো তোমরা এখানে লালিত হচ্ছ স্নেহশীল মালাকারের যত্নে-রাখা কাচের ঘরে, জীবনের ঝড়ঝাপ্‌টা, দুঃখ-কষ্ট যে কী তা-ই তোমরা জান না, আস্তে-আস্তে তোমরা ফুটে উঠছ শান্তিতে, আর তাই দেখে তোমাদের শিক্ষকদের চোখ যাচ্ছে জুড়িয়ে। কিন্তু ওরা.... জীবনের সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে যদি ওরা পারেও, তবু ওরা বেড়ে উঠবে অযত্নে, আগাছার মতো, বাতাসের ঝাপ্‌টা খেয়ে-খেয়ে, পথের পাশের ধুলোর সঙ্গে মিশে।'

ভবিষ্যদ্‌বক্তার ঐশ্বরিক মহিমা আর জ্যোতি ছড়াতে-ছড়াতে ফাদার গেন্নাদি যখন ক্লাস ছেড়ে ধীর পায়ে চলে গেলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আমি তখন ভাবনায় ডুবে গেলুম।

বললুম, 'ফেদ্‌কা!'

'উঁ?'

'স্বাভাবিক গুণের বিকাশ সম্বন্ধে তোর কী মনে হয় রে?'

'কিছু না। তোর?'

'আমার?'

এক মুহূর্ত আমতা-আমতা করে শেষে নিচু গলায় বললুম:

'আমার কথা যদি বলিস ফেদ্‌কা, আমিও গুণগুলোকে পাথর-চাপা দিয়ে রাখতে চাই। ব্যবসাদার কিংবা সরকারী কর্মচারী হয়ে লাভ কী?'

অল্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফেদ্‌কাও স্বীকার করল, 'জানিস, আমিও তাই করতুম রে। কাচের ঘরের ফুল হয়ে বেড়ে উঠে কী হবে? এক দলা থুথু ফেললেই তো সে ফুল ঘাড় লটকে পড়বে। আগাছা, আর যাই হোক, বেশ পোক্ত জিনিস — অন্তত রোদবিষ্টি সহ্য করতে পারে তারা।'

বললুম, 'আচ্ছা, ফেদ্‌কা, ফাদার গেন্নাদি ওই যে বললেন 'পরজন্মে এর জবাবদিহি করতে হবে' সে-ব্যাপারে কী বলিস? সেই জবাবদিহিই যদি করতে হয় তাহলে পরজন্মের পরোয়া করতে যাই কেন?'

কথাটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগল। এ-জন্মের পাপের শাস্তি কী করে এড়ানো যায়, মনে হল সে-সম্বন্ধে ফেদ্‌কারও ধারণা অস্পষ্ট। তার উত্তরটাও হল কেমন এড়িয়ে-যাওয়া গোছের।

'শাস্তি তো আর এখুনি হচ্ছে না। সময় হলে ভেবে-চিন্তে যা হোক কিছু বের করা যাবে।'

দেখা গেল, প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সেই তুপিকভ-ছোকরা এক নম্বরের একটি বুদ্ধু। সে জানতই না ফ্রন্টে যেতে গেলে ঠিক কোন্‌ দিকে যেতে হবে। তিন দিনের দিন সে ধরা পড়ল আর্‌জামাস থেকে ষাট মাইলের মধ্যে, নির্জন নভগরোদ যাবার রাস্তায়।

শোনা গেল, বাড়িতে সবাই ওর যত্ন-আত্তিতে নাকি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কত রকমের উপহার যে ও পেল সবার কাছ থেকে, তার ইয়ত্তা নেই। মাকে ও দিব্যি গেলে কথা দিল যে আর কখনও বাড়ি ছেড়ে যাবে না, আর ঐ-জন্যে গরমের সময় ও একটা এয়ার-রাইফেল উপহার পাবে, তাও জানা গেল। ইশকুলে অবিশ্যি তুপিকভ সকলের ঠাট্টার পাত্র হয়ে দাঁড়াল। ছেলেরা ভেংচি কেটে অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'শহরের এখানে-সেখানে দিন তিনেক পালিয়ে থাকলে যদি সত্যিকার রাইফেল পাওয়া যায়, তাহলে তাতে কে না রাজি হবে।' আমাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই মালিনোভ্‌স্কি, যাঁকে আমরা আড়ালে ডাকতুম 'খ্যাপা' বলে, তিনি তুপিকভ্‌কে একদিন কড়া ধমক দিলেন। এটা আমরা মোটেই আশা করি নি।

তুপিকভ্‌কে ব্ল্যাকবোর্ডে ডেকে মালিনোভস্কি বললেন, 'বহুত আচ্ছা, ছোকরা, বলো তো, তুমি কোন্‌ ফ্রন্টে পালানোর মতলব করেছিলে? জাপান ফ্রন্টে কি?'

লাল হয়ে উঠে তুপিকভ্ জবাব দিল, 'না, স্যার। জার্মান ফ্রন্টে।'

গলায় বিষ ঢেলে মালিনোভ্স্কি বললেন, 'ও, তাই বুঝি? তা জানতে পারি কি, কোন্ শয়তান তোমায় নাকে দড়ি দিয়ে নিজনি নভগরোদ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? তোমার মাথাটাই বা কোথায়, আর আমার দেয়া ভূগোলের শিক্ষাই বা কোথায় জমা রেখেছ শুনি? এটা কি একদম জলের মতো সোজা নয় যে জার্মান ফ্রন্টে যাওয়াই যদি তোমার বাসনা ছিল তাহলে তোমার যাওয়ার কথা মস্কো হয়ে, স্মোলেনস্ক আর ব্রেস্ত হয়ে?' এ-সময়ে হাতের ছড়িটা ম্যাপের গায়ে চেপে ধরে ধরে দেখাতে লাগলেন মালিনোভ্স্কি। 'আর তুমি কিনা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে চলে গেলে পুবে, একেবারে উলটো মুখে। ভুল পথে গেলে কেন, কী জন্যে, শুনি? তোমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি এই জন্যেই তো যে তুমি যা শিখছ তা হাতে-কলমে কাজে লাগাতে পারবে। নাকি, শেখাচ্ছি বিদ্যেটাকে মাথার ওই ডাস্টবিনে জমা করে রাখবে বলে? বোসো। খুব খারাপ নম্বর দিচ্ছি তোমায়। ছোকরা, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

এখানে বলা দরকার যে, মাস্টারমশাইয়ের এই কথাগুলো শুনে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের সেই প্রথম মাথায় ঢুকল, পড়াশুনো করার আসল দরকারটা কী জন্যে। দেখা গেল, তারা হঠাৎ অসম্ভব উৎসাহ নিয়ে ভূগোল পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এমন কি তারা 'ঘরপালানে' নামে একটা নতুন খেলা পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেললে। খেলাটা ছিল এইরকম: একটি ছেলে সীমান্তের যে-কোনো একটি শহরের নাম করবে, আরেক জন সঙ্গে সঙ্গে ওই শহরে যাওয়ার পথে বড় বড় জায়গাগুলোর নাম করে যাবে। ঘরপালানে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ছেলেটি, যদি এ-খেলায় ভুল করত তাকে তবে খেসারত দিতে হত। আর খেসারত না দিলে খেলার শর্ত-অনুযায়ী হয় মাথায় এক গাঁট্টা আর নয়তো নাকে এক ঠোনা হজম করতে হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তায় একদিন, প্রতি বুধবার, পড়াশুনো শুরু করার আগে ইশকুলের হলঘরে যুদ্ধে বিজয়কামনা করে একটি প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হত।

প্রার্থনা শেষ হলে পর প্রত্যেকেই বাঁদিকে, যেখানে দেয়ালের গায়ে জার ও জারিনার ছবি ঝুলত, সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াত। সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান-গায়করা

জাতীয় সঙ্গীত শুরু করত 'ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন', আর সকলে যোগ দিত তাতে। আমি যতটা চেঁচানো সম্ভব চেঁচিয়ে গাইতুম। আমার অবিশ্যি ঠিক গানের গলা ছিল না, কিন্তু এমন প্রাণপণে গাইতে চেষ্টা করতুম যে একবার মাস্টারমশাই বলেই ফেললেন:

'আরেকটু সহজভাবে গাও গোরিকভ। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চটে গেলুম। বাড়াবাড়ি হচ্ছে? তার মানে?

তার মানে, আমার যদি গাইবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অন্যদের বিজয়প্রার্থনা করতে দিতে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব চুপচাপ?

বাড়িতে এসে মায়ের কাছে নালিশ জানালুম।

মা কিন্তু বিশেষ উচ্চবাচ্য করলেন না, শুধু বললেন:

'তুমি তো এখনও ছোট্টটি আছ। আরেকটু বড় হও আগে... লোকে লড়াই করছে তো কী হয়েছে? তাতে তোমার কী?'

'কী বলছ মা? আর যদি জার্মানরা আমাদের দেশ জয় করে নেয়? ওদের অত্যাচারের কথা আমিও কিছু কিছু পড়েছি, বুঝেছ তো? আচ্ছা, জার্মানরা এমন হূনদের মতো কেন মা যে তারা বুড়ো, বাচ্চা কাউকেই রেহাই দেয় না? অথচ আমাদের জারকে দ্যাখো তো, সকলের জন্যে তাঁর কত দরদ।'

'ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না!' অসন্তুষ্ট হয়ে মা বললেন। 'ওরা সবাই সমান, স-ব্বা-ই। সবাই ওরা পাগল হয়ে গেছে, বুঝলে? জার্মানরা আর আমাদের দেশের মানুষ কেউই অন্য দেশের লোকের চেয়ে খারাপ নয়।'

ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করার ভার আমার ওপর চাপিয়ে মা চলে গেলেন। জার্মানরা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে খারাপ না হয়ে পারে কী করে, যখন সবাই জানে তারা খারাপ? এই তো সেদিন সিনেমায় দেখলুম জার্মানরা কাউকেই রেহাই না দিয়ে কীভাবে সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। ওরা রীমসের বড় গির্জে ধ্বংস করে দিয়েছে, অনেক ছোটখাট গির্জে অপবিত্র করেছে। আর আমাদের দেশের লোক? কই, তারা তো কিছু ধ্বংস করে নি, কিছু অপবিত্র করে নি। বরং উলটো, ওই একই ছবিতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি একজন রুশ অফিসার একটা জার্মান বাচ্চাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন।

অগত্যা ফেদ্‌কার শরণ নিলুম।

ফেদ্‌কাও আমার সঙ্গে একমত হল।

'সে আর বলতে? ওরা তো জানোয়ার। নিরীহ যাত্রী-বোঝাই 'লুসিটানিয়া' জাহাজ নইলে ডুবিয়ে দেয় ওরা? কই, আমরা তো কিছু ডুবোই নি? আমাদের জার আর ইংরেজদের জার মহৎ লোক। ফরাসীদের প্রেসিডেন্টও ভালো। আর ওদের ওই ভিল্‌হেল্‌মটা একটা লোচ্চা, ইতর!'

'ফেদ্‌কা, ফরাসী জারকে প্রেসিডেন্ট বলে কেন রে?' আমি শুধোলুম।

আস্তে আস্তে প্রশ্নটা হজম করল ফেদ্‌কা।

'কী জানি,' ও জবাব দিল। 'শুনেছি ওদের প্রেসিডেন্ট নাকি মোটেই জার ছিল না, ওই আর কি... অমনিই ছিল।'

'অমনিই মানে? কী রকম ছিল?'

'আসলে আমি ঠিক জানি না, বুঝলি। দুমার লেখা একটা বই পড়েছিলুম একবার। ভারি মজার বই, অ্যাড্‌ভেঞ্চারে একেবারে ঠাসা। ওই বইয়ে লেখা ছিল যে ফরাসীরা একবার ওদের জারকে মেরে ফ্যালে, আর তারপর থেকে ওদের দেশে আছে জারের বদলে প্রেসিডেন্ট।'

শুনে রীতিমতো খেপে গেলুম আমি। বললুম, 'যাঃ, জারকে আবার মারতে পারা যায় নাকি? ফেদ্‌কা, তুই ভারি মিথ্যেবাদী, আর নয়তো সব গুলিয়ে ফেলেছিস, কী বল্‌?'

'সত্যি রে, ওরা জারকে মেরে ফেলেছিল। জারকে মেরেছিল, তাঁর বউকেও মেরেছিল। ও দেশের লোক তাঁদের সব বিচার করেছিল আর তারপর তাঁদের প্রাণদণ্ড দিয়েছিল।'

'বল্‌, বল্‌, আরও বানিয়ে-বানিয়ে বল্‌! জারের আবার বিচার হয় কী করে রে? এই তো আমাদের জজ ইভান ফিয়োদরভিচের কথাই ধর্‌ না। উনি তো চোরেদের বিচার করেন। সেই যে-লোকটা প্লুশ্‌চিখার বেড়া ভেঙে ঢুকেছিল — উনি তার বিচার করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের একবাক্স বিস্কুট হাতসাফাই করে সরানোয় ইভান ফিয়োদরভিচ মিত্‌কা বেদেরও বিচার করেছিলেন। কিন্তু তা বলে উনি কি জারের বিচার করার সাহস রাখেন? উহু। আরে, জার যে সকলের মাথার ওপর, সবচেয়ে বড়।'

এবার তাচ্ছিল্যভরে নাক শিটকে ফেদ্‌কা বললে, 'বিশ্বাস করা না করা সে তোর ইচ্ছে! বইটা সাশা গোলোভেশ্‌কিনের পড়া হয়ে গেলে তোকে পড়তে দিতে পারি। ওখানকার ওই বিচারের সঙ্গে ইভান ফিয়োদরভিচের জর্জিয়তির কোনো মিল নেই, বুঝলি? ওখানে দেশের সব লোক জড়ো হয়ে বিচার করে রায় দিয়েছিল, তারপর ফাঁসিও দিয়েছিল। কীভাবে জার আর তার বউকে ওরা ফাঁসি দিয়েছিল সে-ঘটনাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফরাসীরা মানুষকে ওদেশে ফাঁসিকাঠে ঝোলায় না। ওদের একটা যন্তর আছে, তার নাম গিলোটিন। যন্তরের খাঁড়াটাকে ওরা ঘুরিয়ে ওপরে তোলে, আর তারপর দুই গুনতে না গুণতে ঘচাং করে ঘাড়ে লাগায় এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে ধড় থেকে মুণ্ডুটা যায় আলাদা হয়ে।'

'তাহলে বলতে চাস, ওরা জারের মুণ্ডুটাও অমনি আলাদা করে দিয়েছিল?'

'জারের, জারিনার, আর আরও অনেকের মুণ্ডু। যদি চাস্‌ তো আমি তোকে বইটা দিতে পারি। ভী-ষ-ণ মজার বই। বইটায় এক সন্ন্যাসীর কথাও আছে, বুঝলি। ভারি ধূর্ত, মোটা থপথপে, দেখলে মনে হবে ভারি ধম্মোত্তাব, আসলে কিন্তু ওসব কিছুই নেই, বিলকুল বকধার্মিক। ওর গপ্পো পড়তে গিয়ে হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। মা আমার কাণ্ড দেখে এত রেগে গিয়েছিলেন যে বিছানা থেকে নেমে এসে আলো নিবিয়ে দিয়েছিলেন। মার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত আমি খানিক ঘাপটি মেরে রইলুম, তারপর যিশুর মূর্তির নিচে জ্বালিয়ে-রাখা ছোট্ট বাতিটা নিয়ে ফের পড়া শুরু করলুম।'

একদিন গুজব রটল, অস্ট্রিয়ান যুদ্ধবন্দীদের আমাদের রেল-স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে। শুনে ইশকুল ছুটির পর ফেদ্‌কা আর আমি ছুটলুম সেখানে। স্টেশনটা ছিল শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। সেখানে যেতে হলে লম্বা ছুট লাগিয়ে কবরখানার পথ ধরে, শহরতলীর জঙ্গল পেরিয়ে পাকা রাস্তায় এসে উঠতে হত, তারপর একটা লম্বা আঁকাবাঁকা খাদও পেরোতে হত।

'আচ্ছা, ফেদ্‌কা, তোর কী মনে হয়, যুদ্ধবন্দীদের কি শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে?'

'কে জানে, হতেও পারে। হলে আশ্চর্য্যি হব না। নইলে ওরা তো লম্বা দেবে। তবে শেকল-বাঁধা থাকলে বেশি দূর দৌড়নো যায় না। জেলখানার কয়েদীদের দেখিস, তারা কোনোরকমে পা টেনে চলতে পারে, তার বেশি না।'

'কিন্তু তারা তো কয়েদী, চোর-ছ্যাঁচোড় -- যুদ্ধবন্দীরা তো আর কারো কিছু চুরি করে নি।'

ফেদ্‌কা আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল এবার।

'তুই কি ভাবিস বল্ তো? মনে করিস লোকে জেলে যায় শুধু চুরি করে আর খুন-খারাপি করে? কত কারণে যে লোকে জেল খাটে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে নাকি?'

'আর কী কী কারণে রে?'

'হুঁ, বুঝলি... আচ্ছা, আমাদের হাতের কাজ শেখাতেন যিনি সেই মাস্টারমশাই জেল খাটছেন কেন বল্ দেখি? জানিস না তো? ঠিক ওই কারণে।'

ফেদ্‌কা যে সব ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জানে এতে আমার ভীষণ রাগ হত। পড়াশুনোর ব্যাপার ছাড়া আর যে কোনো বিষয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে দেখা যেত সে কিছু-না-কিছু জানেই। মনে হত, ওর বাবার কাছ থেকে ও সব জানতে পারত। ওর বাবা ছিলেন পোস্টম্যান, আর পোস্টম্যানরা তো বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেক খবর যোগাড় করতে পারেন।

ইশকুলের হস্তশিল্প-শিক্ষককে ছাত্ররা ভারি পছন্দ করত। তাঁর নাম দিয়েছিল ওরা দাঁড়কাক। যুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি আমাদের শহরে এসেছিলেন। বাসা ভাড়া করেছিলেন শহরতলীতে। তখন আমিও কয়েক বার ওঁর কাছে গেছি। উনিও আমাদের — ছেলেদের -- ভালোবাসতেন। ওঁর ছোট্ট কারিগরি-টেবিলে উনি আমাদের খাঁচা, বাক্স, ফাঁদ, এইসব তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন। গ্রীষ্মকালে একদল বাচ্চা জড়ো করে তাদের নিয়ে উনি ঘুরতে যেতেন বনে-জঙ্গলে, কিংবা যেতেন মাছ ধরতে। লোকটি দেখতে ছিলেন কালো আর হাড্ডিসার, আর চলবার সময় পাখির মতো একটু একটু লাফিয়ে লাফিয়ে চলতেন। এই জন্যেই আমরা ওঁর নাম দিয়েছিলুম দাঁড়কাক।

হঠাৎ, আচমকা, উনি একদিন গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কেন, তা আমরা কখনও জানতে পারি নি। কিছু কিছু ছেলে বলল, উনি নাকি গুপ্তচর ছিলেন আর সৈন্য-

চলাচলের ব্যাপারে আমাদের সব গোপন খবর টেলিফোনে জার্মানদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন। আবার কেউ দিব্যি গেলে বললে যে আমাদের মাস্টারমশাই নাকি এককালে রাহাজান ছিলেন, রাস্তায় ডাকাতি করে লোকজনের কাছ থেকে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতেন। তবে এখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে, এই যা।

আমি কিন্তু এ-সব কথা মোটেই বিশ্বাস করি নি। প্রথমত, আমাদের শহর থেকে সীমান্ত পর্যন্ত কেউ টেলিফোন লাইন পাততে পারত না। দ্বিতীয়ত, আর্‌জামাসে এমন কী সামরিক গোপন খবর তৈরি হচ্ছিল কিংবা সৈন্য-চলাচল ঘটছিল, যা শত্রুকে জানানো যেতে পারত? সত্যি কথা বলতে কি, ওখানে সৈন্য ছিল যে তাই বলা যেত না। ছিল তো একজন অফিসারের আর্দালি নিয়ে জনা সাতেক লোকের একটা দল। আর ছিল রেল-স্টেশনে সামরিক সরাইখানার ঘাঁটিতে চারজন রুটি তৈরির কারিগর। তা, তারা ছিল নামেই সৈন্য। আসলে তারা অতি-সাধারণ রুটির কারিগর ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাছাড়া, যুদ্ধের কয়েক বছরে শহরে মাত্র একবারই সৈন্য-চলাচল ঘটেছিল — যখন সামরিক অফিসার বালাগুশিন পিরিয়াতিনদের ওখান থেকে বাসিউগিনদের বাড়িতে বাসাবদল করেছিলেন। এছাড়া আর কখনও কোনো ফৌজী নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা যায় নি।

আর মাস্টারমশাইয়ের রাহাজানি করার গুজবটা ছিল একেবারে ডাহা মিথ্যে। আসলে পেত্‌কা জোলোতুখিনই খবরটা রটিয়েছিল। আর সকলেই জানত, ও ছিল দুনিয়ার সব-সেরা মিথ্যেবাদী। ও যদি কখনও তিন কোপেক ধার নিত, পরে নির্ঘাত দিব্যি গেলে বলত সব শোধ করে দিয়েছে। কিংবা কারো কাছ থেকে ধার-নেয়া ছিপগাছা বঁড়শি ছাড়াই ফেরত দিয়ে বেমালুম বঁড়শি নেয়ার কথা অস্বীকার করত। তাছাড়া, ইশকুলের মাস্টারমশাই আবার রাস্তায় ডাকাতি করেন, কে কবে এমনধারা কথা শুনেছে? আমাদের স্যারের মুখটা মোটেই ডাকাতের মতো দেখতে ছিল না, হাঁটতেনও তিনি অদ্ভুত মজার ধরনে। তাছাড়া মাস্টারমশাই লোকটি ছিলেন দয়ালু, চেহারা ছিল হাড়-জিরজিরে আর কেবলই কেশে কেশে সারা হতেন।

স্টেশনের দিকে দৌড়তে দৌড়তে ফেদ্‌কা আর আমি অবশেষে পৌঁছলুম খাদটায়। আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি ফেদ্‌কাকে শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করলুম:

'না, সত্যি, ফেদ্‌কা, মাস্টারমশাই কেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বল্‌ না রে? উনি নাকি শত্রুর চর ছিলেন, ডাকাত ছিলেন? এসব একেবারেই বাজে কথা, তাই না?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ফেদ্‌কা। তারপর পায়ের বেগ কমিয়ে দিয়ে, আর আমরা যেন মাঠে না-থেকে লোকের ভিড়ের মধ্যে আছি এইভাবে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, 'আরে ইয়ার, উনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজনীতি করতেন বলে।'

আমাদের মাস্টারমশাই ঠিক কী ধরনের রাজনীতি করতেন বলে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সে-কথাটা ফেদ্‌কাকে জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় রাস্তার মোড়ের ওধার থেকে তালে তালে পা-ফেলে এগিয়ে-আসা একদল লোকের ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল।

তারপরই দেখতে পেলুম প্রায় শ'খানেক যুদ্ধবন্দীকে।

কিন্তু কই, শেকল দিয়ে তো বাঁধতে দেখলুম না ওদের, তাছাড়া ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মাত্র ছ'জন সৈন্য।

অস্ট্রিয়ানদের ক্লান্ত, গোমড়া মুখগুলো ওদের পাঁশুটে রঙের ফৌজী কোট আর দোমড়ানো-মোচড়ানো টুপির সঙ্গে মিলেমিশে যেন এক হয়ে গিয়েছিল। ওরা হেঁটে যাচ্ছিল নিঃশব্দে, সার বেঁধে, সৈন্যরা যেমন মাপা পা-ফেলে হাঁটে তেমনিভাবে।

দলটার সার বেঁধে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ফেদ্‌কা আর আমি ভাবছিলুম, 'ওঃ, তাহলে শত্রু হল এইরকম। এরাই তাহলে সেই অস্ট্রিয়ান আর জার্মান যাদের অত্যাচারে সব দেশের লোক আজ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ভুরু কুঁচকেই আছ, তাই না? যুদ্ধবন্দী হওয়াটা তেমন পছন্দসই লাগছে না, কেমন? ঠিক হয়েছে, কেমন জব্দ হয়েছ সব!'

দলটা চলে গেলে ফেদ্‌কা ওদের দিকে ঘুসি বাগিয়ে বার কতক নাড়ল।

'বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করেছে ব্যাটারা!'

বাড়ি ফিরলুম কিছুটা মনমরা হয়ে। কেন, তা বলতে পারব না। ওই সব ক্লান্ত চেহারার, পাঁশুটে মুখওয়ালা যুদ্ধবন্দীরা আমরা যেমন ভেবেছিলুম তেমন ভয়ভক্তি আমাদের মনে জাগাতে পারল না বলে বোধহয়। ছোঃ, ভারি সব বীর, গায়ে ফৌজী কোট না থাকলে ওদের দিব্যি শরণার্থী বলেই চালিয়ে দেয়া যেত। সেই একইরকম রোগা, চিম্‌সানো সব মুখ, চারপাশের সবকিছু সম্বন্ধে সেই একরকম ক্লান্ত আর উদাস-উদাস ভাব।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেল আমাদের। ফেদ্‌কা আর আমার মাথায় তখন ছুটি কাটাবার কত রকম প্ল্যানই যে ঘুরছে। বহু কাজ করবার ছিল সামনে।

প্রথম কথা, একটা ভেলা বানিয়ে আমাদের বাগানের লাগোয়া পুকুরে তা ভাসাতে হবে। তারপর আমাদের নিজেদের ঘোষণা করতে হবে সাত সাগরের অধিশ্বর বলে, আর পুকুরের অপর পারে পানাতিউশ্‌কিন আর সিমাকভ-বাড়ির ফলবাগানের মুখে পাহারা দিচ্ছে ওদের যে যুক্ত নৌবহর তার সঙ্গে চালাতে হবে লড়াই।

আমাদের নৌবহরটা ছিল ছোট্ট। বাগানের বেড়ার দরজাটা মাত্র সম্বল। কিন্তু শত্রুর নৌ-বলের তুলনায় তা ছিল যৎসামান্য। শত্রুদের ছিল একখানা ভারি ক্রুজার, অর্থাৎ পুরনো একটা গেটের আধখানা, আর একটা হালকা টর্পেডো বোট, অর্থাৎ আগে খামারের জীবজন্তুদের খাওয়ার কাজে লাগত এমন একটা কাঠের তৈরি জাবনার গামলা।

দু-পক্ষের লড়াইয়ের বলাবল স্পষ্টতই সমান ছিল না। কাজেই আমরা ঠিক করলুম এঞ্জিনিয়ারিং-এর একেবারে শেষ কথা — একটা প্রকাণ্ড সুপার-ড্রেডনট মানোয়ারী জাহাজ বানিয়ে আমাদের নৌ-বল বাড়াতে হবে।

ঠিক করলুম, ধসে-পড়া স্নানঘরের মোটা মোটা কাঠগুলোকে জাহাজ তৈরির কাজে লাগাব। মা-র কাছে ধমকের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তাঁকে কথা দিলুম, আমাদের ড্রেডনটটা এমনভাবে তৈরি করব যাতে ওটা সবসময়েই কাপড় কাচার মাচা হিসেবেও ব্যবহার করা চলে।

অপর পারে শত্রুপক্ষও আমাদের অস্ত্রসজ্জার তোড়জোড় লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে গেল। ওরাও তাড়াতাড়ি শুরু করে দিল অস্ত্রসজ্জা। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগ খবর দিল যে শত্রুর পক্ষে এ-ব্যাপারে আমাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার কোনো উপায়ই নেই। কারণ ওদের জাহাজ তৈরির মালমশলার একান্ত অভাব। গোলাবাড়ি পোক্ত করে মেরামত করার জন্যে ওদের বাড়ির উঠোনে কিছু কাঠের তক্তা রাখা ছিল, তা থেকে কিছু তক্তা সরাতে গিয়ে আমাদের শত্রুরা ব্যর্থ হল। অন্য কাজের জন্যে নির্দিষ্ট মালমশলা এভাবে বিনা অনুমতিতে ওদের কাজে লাগানোর এই চেষ্টা ওদের পারিবারিক পরিষদ মোটেই সমর্থন করল না। শত্রুপক্ষের দুই নৌ-সেনাপতি, সেন্‌কা

পানতিউশ্‌কিন ও গ্রিশ্‌কা সিমাকভ, ওদের বাবার হাতে এজন্যে প্রচণ্ড মার খেল। চারদিকে কাঠকাটরা ছড়িয়ে ক-দিন আমরা খুব ব্যস্ত রইলুম। ড্রেডনট মানোয়ারী জাহাজ তৈরি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্যে যেমন অনেক অর্থ, তেমনি অনেক সময়ও দরকার। কিন্তু ফেদ্‌কা ও আমার ঠিক ওই সময়টায় কিছুটা দুর্দিন চলছিল। শুধু পেরেক কিনতেই আমরা পঞ্চাশ কোপেকের বেশি খরচ করে বসে ছিলুম। তখনও আমাদের নোঙরের দড়ি আর নিশানের কাপড় কেনা বাকি।

শূন্য তহবিল পূরণ করার জন্যে আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সত্তর কোপেক ধার করতে হল। এর জন্যে জামিন হিসেবে জমা রাখতে হল ধর্ম সম্বন্ধে দু-খানা পাঠ্যবই, একখানা জার্মান ব্যাকরণ ও একটা রুশ রিডার।

আমাদের ড্রেডনট যখন তৈরি হল তখন সে যে কী সুন্দর দেখতে হল, কী বলি। বিকেলবেলা জাহাজটা জলে ভাসালুম আমরা। ভাসানোর সময়ে তিম্‌কা শ্‌তুকিন আর ইয়াশ্‌কা সুক্কারস্তেইনও হাত লাগাল। আর মুচির সব কটা বাচ্চা, আমার ছোট্ট বোনটা আর ছোট্ট পাহারাদার কুকুর ভোল্‌চক, ওরফে শারিক, ওরফে জুচ্‌কা, হল দর্শক। জাহাজখানা ঝন্‌ঝন্‌ ক্যাঁচ্‌কোঁচ করতে করতে প্রচণ্ড আওয়াজে ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল। জোর খুশির হৈ-হল্লা আর খেলনা পিস্তল থেকে গুলি ছোড়ার আওয়াজের মধ্যে জাহাজের মাস্তুলে পতাকা উত্তোলন করা হল। আমাদের পতাকা ছিল কালো রঙের। তার চারপাশে লাল বর্ডার আর মাঝখানে, নীল রঙের একটা গোল ছাপ।

ঈষদুষ্ণ বাতাসে নিশানটা উড়তে লাগল পতপত করে। চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে। নোঙর তুলে আমরা ধাক্কা দিয়ে জাহাজটাকে জলে ঠেলে দিলুম।

তখন সূর্য প্রায় অস্ত যাওয়ার মুখে। ঘরে ফেরার পথে ছাগলের পালের গলায়-বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ দূর থেকে কানে আসছিল। আর্‌জামাসে এমনই ছাগল ঘুরে বেড়াত যত্রতত্র, অসংখ্য।

ড্রেডনট চালাচ্ছিলুম আমি আর ফেদ্‌কা। আমাদের পেছনে সম্ভ্রম নিয়ে বেশ খানিকটা তফাত রেখে ভেসে আসছিল বেড়ার গেটটা। ওটা ছিল আমাদের সাজসরঞ্জাম বইবার জাহাজ।

আমাদের নৌ-বাহিনী নিজেদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে পুকুরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। তারপর শত্রু-তীরভূমির কাছ-ঘেঁষে চলতে লাগল।

কিন্তু চোঙার মধ্যে দিয়ে কথা বলে ও সংকেত দিয়ে মিথ্যেই আমরা শত্রুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগলুম — লড়াই করতে রাজি হল না শত্রু; আর কী লজ্জার কথা, একটা আধ-পচা গাছের গুঁড়ি দিয়ে আড়াল-করা একটা উপসাগরে লুকিয়ে রইল। হঠাৎ ওদের তীরবর্তী কামানশ্রেণী অন্ধ আক্রোশে আমাদের জাহাজের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। কিন্তু আমরা তক্ষুনি জাহাজগুলোকে ওদের কামানের আওতার বাইরে নিয়ে এলুম, তারপর ধীরেসুস্থে, কোনো ক্ষতিস্বীকার না করে জাহাজগুলো ভেড়ালুম বন্দরে। ইয়াশ্‌কো সুক্কারস্তেইনের পিঠে অবিশ্যি একটা আস্ত আলু এসে পড়েছিল, কিন্তু তাতে যে সামান্য আঘাত লাগল তাকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনলুম না।

জাহাজ নিয়ে ফিরে আসতে-আসতে আমরা চেঁচিয়ে বললুম, 'ও-হো-হো! দুয়ো, দুয়ো! বেরিয়ে এসে লড়াই করার সাহস নেই!'

'আরে, যা, যা! আমরা ঠিকই বেরিয়ে আসব। অত বড়াই কিসের? তোদের দেখে ভয় পাব, তবেই হয়েছে!'

'যা, যা, নিজেদের ওই বলে বুঝ দিগে! ভিতু বেড়াল কোথাকার!'

নিরাপদে বন্দরে ঢুকলুম আমরা। নোঙর ফেললুম। তারপর জাহাজগুলোকে শেকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে লাফিয়ে পাড়ে নামলুম।

সেদিন সন্ধেয় ফেদ্‌কার সঙ্গে আমার প্রায় ঝগড়া বাধার যোগাড়। নৌবহরের কম্যাণ্ডার কে হবে তা আমরা আগে থেকে ঠিক করে রাখি নি। আমি প্রথমে প্রস্তাব করেছিলুম যে ফেদ্‌কা সাজসরঞ্জামের জাহাজটা চালাক। অবজ্ঞাভরে একদলা থুথু ফেলে ফেদ্‌কা আমার সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিল। তদুপরি আমি ওকে একই সঙ্গে জাহাজঘাটার ক্যাপ্টেন, তীরবর্তী কামানশ্রেণীর পরিচালক, আর আমাদের বিমানবাহিনী হলেই ওকে বিমানবাহিনীরও কর্তা করতে রাজি হয়ে গেলুম। কিন্তু বিমানবাহিনীর কর্তার পদও ফেদ্‌কাকে টলাতে পারল না। ও চাইল নৌবাহিনীর অ্যাড্‌মিরাল হতে। নইলে, ও ভয় দেখাল ও শত্রুপক্ষে যোগ দেবে।

দামী একজন সহকারীকে হারানোর ভয়ে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলুম। শুধু প্রস্তাব করলুম, পালা করে আমরা অ্যাড্‌মিরাল হব — একদিন ফেদ্‌কা, একদিন আমি।

শেষপর্যন্ত এইভাবে রফা হল।

দুটো ধনুক তৈরি করলুম আমরা। ডজনখানেক তীরও বানিয়ে নিলুম। তারপর রওনা দিলুম বনের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু 'ব্যাঙবাজি'ও ছিল। 'ব্যাঙবাজি' হল, গোল-করে-পাকানো একটা কাগজের নলের মধ্যে পটাশিয়াম ক্লোরেট আর কাঠকয়লার গুড়ো ঠেসে একটুকরো সুতো দিয়ে শক্ত-করে-বাঁধা একরকম বাজি। আমাদের তীরের আগায় ওই 'ব্যাঙবাজি' বেঁধে বাজির পলতের আগুন ধরাতে লাগলুম। তীরগুলো সজোরে আকাশে ওঠার পর 'ব্যাঙবাজি' সব আকাশে ফাটতে লাগল আর সবসুদ্ধ আগুনে-সাপের মতো এঁকেবেঁকে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। দাঁড়কাক আর কাকেরা তো তাই দেখে ভয় পেয়ে তুমুল সোরগোল শুরু করে দিলে।

বনটা ছিল কবরখানার ঠিক পাশেই। ঘন জঙ্গল, অসংখ্য গর্ত আর ছোট-ছোট পুকুরে ভরা। হলদে শাপলা, সোনালি ঝুমকো ফুল আর ফার্নগাছে ছেয়ে ছিল বনের সবুজ ছায়াঢাকা জায়গাগুলো।

প্রাণভরে খেলার পর পাঁচিল বেয়ে উঠে আমরা কবরখানার এক নির্জন কোণে এসে নামলুম। অতক্ষণ ধরে খেলার উত্তেজনার পর এই শান্ত, স্তব্ধ পরিবেশ আমাদের দেহমন যেন জুড়িয়ে দিল। পাতার আড়ালে লুকনো পাখিদের ডাক মাঝে-মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছিল। চাপা গলায় কথা বলতে-বলতে আমরা এক টুকরো পোড়ো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে চললুম। আমাদের চারপাশে কবরের মাটির ঢিবি, কোনো-কোনোটা মাটির ওপর সামান্য একটু মাথা জাগিয়ে ছিল মাত্র।

ফেদ্‌কাকে বললুম, 'দ্যাখ্‌, ওই মোড়টা ঘুরলেই এক্ষুনি আমরা সৈন্যদের কবরগুলোর কাছে পেঁছব। গেল-সপ্তায় হাসপাতাল থেকে এনে এখানে সেমিওন কোঝেভ্‌নিকভকে কবর দেয়া হয়েছে। কোঝেভ্‌নিকভকে আমার খুব মনে পড়ে, জানিস ফেদ্‌কা। যুদ্ধ বাধবার অনেক আগে, আমি তখন একেবারে বাচ্চা, কোঝেভ্‌নিকভ আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। একদিন গুল্‌তি তৈরির জন্যে আমায় এক টুকরো রবারও দিয়েছিলেন। রবারের টুকরোটা ভারি ভালো ছিল রে। পরে বাসিউগিনদের বাড়ির একটা জানলার কাচ পাথর লেগে ভেঙে যাওয়ায় মা আমার রবারের টুকরোটা আগুনে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, আমিই নাকি কাচ ভেঙেছিলুম।'

'কেন, তুই ভাঙিস নি?'

'আরে, ভেঙেছি তো হয়েছে কী? সেটা প্রমাণ করতে হবে তো। কেউ আমায় ভাঙতে তো দ্যাখে নি। সবটাই ছিল নিছক সন্দেহ। তুই কি একে ন্যায়বিচার বলিস? আচ্ছা ধর্, আমি যদি জানলাটা না-ভাঙতুম — তা হলেও সেই আমারই ঘাড়ে দোষ পড়ত নাকি?'

'তা তো পড়তই,' আমার সঙ্গে একমত হল ফেদ্‌কা। 'মা-রা সবাই একরকম, বুঝলি! মেয়েদের জিনিসে ওরা হাত দেবে না, কিন্তু ছেলেরা কোনো কিছু নিয়ে খেলছে দেখলেই আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে তা কেড়ে নেবে। জানিস, পেরেকসুদ্ধ আমার দু-দুটো তীর মা ভেঙে দিয়েছে, ফাঁদে-পড়া ইঁদুরটাকেও বের করে নিয়েছে। আর একবার মা যে আমার কী ক্ষতি করেছিল! আমি একটা খালি ডিবে খাট থেকে খুলে নিয়েছিলুম — ওই-যে, খাটের বাজুতে সব গোল গোল ডিবে থাকে জানিস তো? মা গিয়েছিলেন গির্জেয়। খানিকটা শোরা আর কাঠকয়লা বের করে ঘরে বসে মেশাচ্ছিলুম আমি। ভাবছিলুম, ডিবেটার ভেতর বারুদ ঠেসে ভর্তি করব। তারপর জঙ্গলে গিয়ে বোমা ফাটাব। মশলা তৈরিতে এত ব্যস্ত ছিলুম যে লক্ষ্য করি নি মা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ শুনি মা-র গলা, 'ডিবেটা খুলেছ কী জন্যে শুনি? অ্যাঁ, শয়তান কোথাকার! আর আমি ভাবছি ডিবেটা আবার কোথায় উবে গেল।' সঙ্গে সঙ্গে গালে এক থাপ্পড়। ভাগ্যি ভালো, বাবা আমার পক্ষ নিল। জিজ্ঞেস করল, 'ডিবেটা খুললে কেন?' আমি বললুম, 'দেখছ না? বোমা বানাচ্ছি যে।' বাবা ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'থাক এসব। এসব জিনিস নিয়ে খেলা করো না। সন্ত্রাসবাদীটিকে কেমন বুঝছ?' এই বলে বাবা হেসে আমার মাথায় হাত বুলোল।'

একটু চুপচাপ থেকে আমি বললুম, 'ফেদ্‌কা, সন্ত্রাসবাদী কাকে বলে আমি জানি। ওই যে যারা পুলিসের দিকে বোমা ছোড়ে আর বড়লোকদের বিরুদ্ধে লাগে। আচ্ছা, ফেদ্‌কা, বল্ তো আমরা গরিব, না বড়লোক?'

অল্প একটু ভেবে নিয়ে ফেদ্‌কা জবাব দিল, 'মাঝামাঝি। আমাদের খুব গরিব বলা চলে না। ধর্, বাবা চাকরি করে। রোজ আমরা পেট ভরে খেতে পাই। রবিবার-রবিবার মা পিঠে বানায়, কোনো কোনো দিন ভাপে ফল সেদ্ধ করেও খেতে দেয়। ভাপে-সেদ্ধ ফল কিন্তু আমার ভী-ষ-ণ ভালো লাগে। তোর?'

'আমারও। তবে আপেলের চাট্‌নি আমার আরও ভালো লাগে। বুঝলি, আমারও মনে হয় আমরা মাঝারি অবস্থার লোক। বেবেশিনদের দ্যাখ্ — ওরা একটা আস্ত

ফ্যাক্‌টরির মালিক। ভাস্‌কার সঙ্গে দেখা করতে আমি একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম। কত-যে ওদের লোকলস্কর, চাকরবাকর, কী বলি! ভাস্‌কার বাবা না ভাস্‌কাকে একটা জ্যান্ত ঘোড়া উপহার দিলেন। শুনলুম ওকে নাকি টাট্টুঘোড়া বলে।'

'ওহ্‌, ওদের তো সবকিছুই আছে,' ফেদ্‌কা সায় দিল। 'গাদা গাদা টাকা আছে ওদের। ওই সিনিউগিন ব্যাপারী? ও তো ওর বাড়ির ছাদে একটা উঁচু গম্বুজ বানিয়ে গম্বুজে আবার একটা টেলিস্কোপ বসিয়েছিল। পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ একটা! যখন সংসারে অরুচি ধরে যায় তখন ও নাকি ওই গম্বুজে উঠে যায় আর চাকররা ওখানেই ওকে খাবার আর বোতল দিয়ে আসে... আর গম্বুজেই ও বসে থাকে সারা রাত, বসে বসে গ্রহনক্ষত্র দ্যাখে। সেদিন ও নাকি ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে ওখানেই মদের আসর বসিয়েছিল আর সেই অবস্থায় টেলিস্কোপে দেখাদেখি করতে গিয়ে একটা কাচ না কী যেন ভেঙে ফেলে। ব্যাস, এখন সব দেখাদেখি বন্ধ, নাও ঠেলা!'

'আচ্ছা, ফেদ্‌কা, এমন কেন হয় রে যে শুধু সিনিউগিনই সব কিছু মজা লুটবে, গ্রহনক্ষত্র দেখবে, আর অন্যদের বেলায় জুটবে লবডঙ্কা? যেমন ধর্‌, সিগভ। ওই-যে রে, যে কারখানায় কাজ করে। ও বেচারি তো দুবেলা দু'মুঠো খেতেই পায় না, তারা-দেখা মাথায় থাক। গতকাল ও একতলায় মুচির কাছে পঞ্চাশ কোপেক ধার করতে এসেছিল।'

'কেন এমন হয় কী করে জানব বল্‌? আমায় ওসব জিজ্ঞেস করিস না। মাস্টারমশাইকে কি পাদ্রিসাহেবকে শুধোস।'

হাঁটতে হাঁটতে বুনো যুঁইয়ের একটা ছোট্ট ডাল ভেঙে নিল ফেদ্‌কা। তারপর একটু নিচুগলায় বললে:

'জানিস বাবা বলছিল, শিগ্‌গিরই সবকিছু নাকি বদলে অন্যরকম হয়ে যাবে।'

'কী বদলাবে?'

'সবকিছু। বুঝেছিস বরিস, খোলাখুলি বাবা আমায় কিছু বলে নি। ওরা ভেবেছিল আমি বুঝি ঘুমোচ্ছি। আমিও ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম। বাবা কারখানার পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলছিল, উনিশ শো পাঁচ সালের মতো আবার যে ধর্মঘট হতে যাচ্ছে সেইসব নিয়ে। উনিশ শো পাঁচ সালে কী হয়েছিল জানিস তো?'

'জানি, একটু-একটু,' হঠাৎ লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে উঠতে-উঠতে জবাব দিলুম।

'বিপ্লব হয়েছিল তখন। তবে সফল হয় নি। বিপ্লবীদের মতলব ছিল জমিদারদের পুড়িয়ে মারা, সব জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া আর বড়লোকদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে গরিবদের দেয়া। জানিস, আমি বড়দের কথাবার্তা থেকে সবকিছু জেনেছি।'

এরপর চুপ করে গেল ফেদ্‌কা। এ-ব্যাপারেও ফেদ্‌কা আমার চেয়ে বেশি জানে দেখে আবারও আমার রাগ ধরে গেল। আমাকেও জানতে হবে ব্যাপারটা, কিন্তু এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে জানা যায়। মুশকিল এই যে এর বিন্দুবিসর্গও কোনো বইতে নেই। কেউ কখনও এ-বিষয়ে আমায় কিছু বলেও নি।

বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর মা যখন বিশ্রাম নিতে শুয়েছেন তখন গুটিগুটি বিছানায় উঠে মা-র পাশে বসলুম। বললুম:

'মা-মণি, আমায় উনিশ শো পাঁচ সম্বন্ধে কিছু বল না গো। অন্য ছেলেদের বাবা-মারা তো তাদের এ-সম্বন্ধে কত গল্প বলে। ফেদ্‌কা কত মজার মজার গপ্পো জানে। আমি কিছুই জানতে পারি না, আমায় তোমরা কিছুই বল না।'

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে মা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। মনে হল, বুঝি আমায় বকতে যাচ্ছেন। তারপর আরও কী মনে করে এমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন জীবনে এই প্রথম তিনি আমায় দেখছেন।

'উনিশ শো পাঁচ? কী বলছিস তুই?'

'কী বলছি তা তো ভালোই জান। তুমি তো কত বড়, কত গায়ে জোর তোমার। ওই সময়ে তুমি নিশ্চয় অনেক বড় হয়ে গিয়েছিলে। আমি তো তখন এক বছরের বাচ্চা। আমার যে কিছু মনে নেই।'

'আমি কী বলব বল? বরং তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর। উনি খুব ভালো গল্প বলতে পারেন। উনিশ শো পাঁচ সালে আমার যা জঘন্য দিন গেছে তোকে নিয়ে। এই ছোট্ট বাঁদরটার জন্যে কম ভুগি নি। তুই যা ছিলি না তখন, ভাবলে ভয় হয়। দিনরাত খালি চিল-চ্যাঁচাতিস। এক দণ্ড শান্তি ছিল না আমার। সারা রাত ধরে চ্যাঁচাতিস আর আমায় জ্বালাতিস, তখন আমি কে, কোথায়-বা আছি, এসব কিছু হুঁশ ছিল না কি?'

কথাটা শুনে মনে একটু আঘাত পেলুম। বললুম, 'কেন চ্যাঁচাতুম মা-মণি? বোধহয় ভয় পেয়ে, না? শুনেছি তখন নাকি গুলি চলেছিল আর কসাকরা অত্যাচার করেছিল। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, নয়?'

'ভয় পেয়েছিলি না হাতি! এমনিই। ছিলি তো হাড়জ্বালানে রামকাঁদুনে ছেলে, আবার কী। ভয় পাওয়ার বয়েস হয়েছিল নাকি তখন যে ভয় পাবি? এক রাত্রে ফৌজী পুলিশ এল আমাদের বাড়ি তল্লাসি করতে। কিসের খোঁজে, জানি না। তবে সে-সময়ে বাড়ি-বাড়ি ওরা নিয়ম করে খানাতল্লাসি চালাত। সেরাত্রে আমাদের বাড়িতে সবকিছু ওলটপালট, নয়ছয় করে দিলে ওরা, কিন্তু কিচ্ছু পেলে না। অফিসারটি ছিল যেন বিনয়ের অবতার। তোকে একটা আঙুল দিয়ে কাতুকুতু দিতে লাগল। তুই তো হেসেই কুটিপাটি। অফিসার বললে, 'চমৎকার খোকা আপনার'। বলে খেলার ছলে তোকে কোলে তুলে নিল। ওদিকে একজন সৈন্যকে চোখ টিপে দিতে সে তোর দোলনাটা তল্লাসি করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ তুই পেচ্ছাপ করে দিলি। হি-হি, একেবারে অফিসারের পোশাকের ওপর! আমি তোকে ওর কোল থেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি অফিসারের হাতে একখানা কাঁথা তুলে দিলুম জামা মোছার জন্যে। কী কাণ্ড, একেবারে আনকোরা নতুন পোশাক পরে এসেছিল লোকটা, আর তুই কিনা বিলকুল সব ভিজিয়ে দিলি, মায় ট্রাউজার্স, এমন কি তরোয়ালখানা পর্যন্ত। একেবারে পুরোপুরি নাইয়ে দিলি লোকটাকে। এমনি দুষ্টু বাঁদর ছিলি তুই!' পুরনো কথা মনে পড়ায় মা তো হেসেই অস্থির।

বাধা দিলুম, 'তুমি তো বেশ মা, অন্য ব্যাখ্যান আরম্ভ করলে দেখি।' রীতিমতো চটে গেছি আমি তখন। 'আমি তোমায় জিজ্ঞেস করলুম বিপ্লবের কথা, আর তুমি শুরু করলে যতসব আবোলতাবোল গপ্পো...'

'আঃ, ক্ষ্যামা দাও দেখি। জ্বালিয়ে মারলি একেবারে!' এই বলে মা আলোচনায় ইতি টেনে দিলেন।

কিন্তু আমার মুখে কষ্টের ছাপ লক্ষ্য করে থমকে গেলেন তিনি। পরে একগোছা চাবি বের করে আমায় দিয়ে বললেন:

'আমি কিছু বলব না। যা, এই চাবি দিয়ে ভাঙাচোরা জিনিসপত্তরের ঘরটা খোল। ওখানে একটা বড় বাক্স দেখতে পাবি। তার মধ্যে ওপর দিকে দেখবি নানা ধরনের বাতিল জিনিসপত্তর। ওগুলোর নিচে তোর বাবার এক বস্তা বই আছে।

তার মধ্যে ওই বিষয়ে বই আছে কিনা খোঁজ কর গিয়ে। সেগুলো যদি তোর বাবা ছিঁড়ে না ফেলে থাকেন তাহলে তার মধ্যে উনিশ শো পাঁচ সম্বন্ধে একটা-না-একটা বই পেয়ে যাবি।'

তাড়াতাড়ি চাবির গোছা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোলুম। পেছন থেকে মা সাবধান করে দিলেন:

'বইয়ের বাক্সের বদলে যদি জ্যামের বোয়েমে হাত দিস, কিংবা আগের বারের মতো যদি সবটা খেয়ে ফেলিস তাহলে তোকে বিপ্লব কাকে বলে এমন বুঝিয়ে দেব যে জীবনে কখনও তা ভুলবি না!'

এরপর পরপর কয়েক দিন কাটল খালি বই পড়ে। মনে আছে, যে-দুখানা বই আমি পড়ব বলে বেছেছিলুম, তার মধ্যে প্রথম বইটার পাতা তিনেকের বেশি পড়তে পারি নি। না-ভেবেচিন্তে বাছা এই বইখানার নাম ছিল 'দারিদ্র্যের দর্শন'। লেখাটা এমন যে পড়লে মাথা ধরে যায় অথচ মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। তবে অন্য বইটা — স্তেপ্‌নিয়াক-ক্রাভ্‌চিন্‌স্কির একটা গল্পের বই — পড়ে বুঝতে পারলুম। বইটা একবার পড়ে শেষ করে ফের দ্বিতীয়বারও পড়ে ফেললুম।

এই গল্পগুলোয় সব কিছুই ছিল আমি যা জানতুম তার উল্‌টো। গল্পে যাদের বীর বলা হচ্ছিল তাদের পেছনে সব সময়ে পুলিশ লেগে ছিল, আর পুলিশ গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে সহানুভূতির বদলে ঘেন্না আর রাগ জাগছিল। গল্পগুলো ছিল বিপ্লবীদের নিয়ে। বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন আর ছাপাখানা ছিল। জমিদার, ব্যবসাদার আর ফৌজের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা একটা বিদ্রোহ বাধাবার তোড়জোড় করছিলেন। আর পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। ধরা পড়লে পর বিপ্লবীদের নিয়ে যাওয়া হত জেলখানায়, নয় তো তাঁদের দাঁড়াতে হত ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলির মুখে। যাঁরা বেঁচে থাকতেন তাঁরা অন্যের অসম্পূর্ণ কাজ চালিয়ে যেতেন।

আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল বইটা। কারণ, আগে কখনও আমি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছু পড়ি নি। ভীষণ দুঃখ হল এই ভেবে যে আমাদের সেই আর্‌জামাস জায়গাটা ছিল এমনই একটা অজ-পাড়াগাঁ শহর যে সেখানে কেউ কোনোদিন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছুই শোনে নি। আর্‌জামাসে সিঁধেল চোর ছিল — তুশকভদের বাড়ির চিলেকোঠায় ওদের সব ধোয়া কাপড়জামা সিঁধেল চোর একদিন

চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছিল। বেদে ঘোড়াচোরও ছিল শহরে। এমন কি একটা জলজ্যান্ত ডাকাতও ছিল। তার নাম ছিল ভান্‌কা সেলেদ্‌কিন। সে আবগারি বিভাগের একজন লোককে খুন পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু আর্‌জামাসে বিপ্লবী ছিল না একজনও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেদ্‌কা, তিম্‌কা, ইয়াশ্‌কা সুক্কারস্তেইন আর আমি সবেমাত্র গোরোদ্‌কি* খেলা শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময় মুচির ছেলেটা বাগান থেকে দৌড়ে এসে খবর দিল যে সর্বনাশ হয়েছে, পানতিউশ্‌কিন আর সিমাকভদের দুখানা জাহাজ চুপিচুপি আমাদের পাড়ে এসে নোঙর করেছে আর ওদের দুই শয়তান অ্যাড্‌মিরাল আমাদের জাহাজগুলোর তালা ভাঙছে সেগুলোকে ওদের পাড়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

তুমুল হৈ-হল্লা তুলে আমরা বাগানে ছুটলুম। আমাদের দেখেই শত্রুবাহিনী জাহাজে লাফিয়ে পড়ে সেগুলোকে বেয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক করলুম, শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে ওদের জাহাজ জলে ডুবিয়ে দেব।

ওইদিন ফেদ্‌কা ছিল ড্রেডনটের কম্যান্ডার। যতক্ষণ ও আর ইয়াশ্‌কা আমাদের বেঢপ সাইজের ভারি জাহাজটাকে জলে নামানোর জন্যে ঠেলতে লাগল ততক্ষণে তিম্‌কা আর আমি আমাদের সেই বেড়ার দরজাটায় চেপে শত্রুর পথ অবরোধ করতে রওনা দিলুম। প্রথমেই শত্রুরা একটা ভুল করে বসল। বোঝা গেল, তারা ভাবে নি আমরা পিছু নেব, তাই সোজা নিজেদের পাড়ের দিকে না গিয়ে তারা বাঁ-দিকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল। কিন্তু যখন ভুল বুঝতে পারল তখন নিজেদের পাড় থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তারা। এইসময়ে ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল আমরা ওদের ফেরার পথ আটকে ফেলার আগেই কোনোরকমে নিজেদের পাড়ে ফিরতে। ওদিকে ফেদ্‌কা আর ইয়াশ্‌কা তখনও চেষ্টা করে চলেছে বাঁধন খুলে বড় জাহাজটাকে জলে নামাতে। তিম্‌কা আর আমার ওপর তখন গুরুদায়িত্ব। তা হল, আমাদের হালকা জাহাজখানা দিয়ে বেশি শক্তিশালী শত্রু-বহরকে মাঝ-দরিয়ায় কয়েক মিনিট আটকে রাখা।

---

* গোরোদ্‌কি — ডাণ্ডা ছুঁড়ে সাজানো লক্ষ্য এক ঘায়ে ভেঙে ফেলার একরকম খেলা। — সম্পাঃ

তখনও আমাদের সাহায্য এসে পেঁাছয় নি, এদিকে শত্রু-বহর আমাদের মুখোমুখি হল। কিন্তু আমরা বললুম, কুছ পরোয়া নেই। সরাসরি কামান দাগতে শুরু করে দিলুম। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে দু-দিক থেকে আমরা মারাত্মক গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হলুম।

আমার পিঠে দু-দুবার মাটির ঢেলা এসে লাগল। তিম্‌কার টুপি তো উড়ে গিয়ে পড়ল জলে। আমাদের গোলাবারুদ তখন ফুরিয়ে এসেছে, জলে ভিজে একশা হয়ে গেছি আমরা। অথচ ফেদ্‌কা আর ইয়াশ্‌কা তখন সবে জাহাজ ছেড়েছে মাত্র।

শত্রু সিদ্ধান্ত নিল সে অবরোধ ভেঙে বেরুবে।

দেখলুম, ওদের জাহাজের সঙ্গে সামনাসামনি ধাক্কা লাগলে আমাদের আর কোনো আশা থাকবে না। বেড়ার পলকা গেট যে ডুবে যাবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই।

'শেষ গোলাগুলো দাগো, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও!' আমি হুকুম দিলুম।

মারাত্মকভাবে গোলাবর্ষণ করে মাত্র আধ-মিনিটেক শত্রুকে আটকে রাখলুম। দেখলুম, আমাদের উদ্ধারে ড্রেডনট ছুটে আসছে পুরো দমে।

'রুখে দাঁড়াও!' ফেদ্‌কা হাঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূর পাল্লার কামান দাগতে শুরু করল।

শত্রুর জাহাজগুলো তখন আমাদের প্রায় পাশে হাজির। আমার কাছে দুটি পথ খোলা — হয় ওদের নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে দেয়া, আর নয় তো প্রাণান্ত যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে পথ আগলে দাঁড়ানো। বলা বাহুল্য, আমি শেষের পথই বেছে নিলুম।

গায়ের জোরে লগিতে ঠেলা দিয়ে আমি আমাদের জাহাজখানাকে ওদের পথ আটকে দাঁড় করালুম।

শত্রুর প্রথম জাহাজখানা সজোরে দড়াম করে আমাদের জাহাজে ধাক্কা মারল। হঠাৎ দেখি, তিম্‌কা আর আমি ঈষদুষ্ণ বদ্ধ জলায় গলাজলে দাঁড়িয়ে আছি। তবে ওই ধাক্কায় শত্রুর জাহাজও গেল থেমে। আর ঠিক এইটিই আমরা চাইছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকাণ্ড, বেঢপ গড়নের কিন্তু শক্তসমর্থ, পরাক্রান্ত ড্রেডনট শত্রুর জাহাজের আড়ে সোজাসুজি এসে ধাক্কা মারল। শত্রু-জাহাজ গেল উলটে। তখন অবশিষ্ট রইল ওদের টর্পেডো বোটটা, যা আগে ছিল শুয়োরের জাবনার গামলা।

ওটার সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি। দ্রুত ছোটার সুযোগ নিয়ে ওটা পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু লগির এক ধাক্কায় আমি দিলুম ওটাকে উলটে।

এরপর তিম্‌কা আর আমি উঠে এলুম ফেদ্‌কার জাহাজে। ওদিকে শত্রুর নৌসেনাদের মাথাগুলো জলের ওপর জেগে রইল।

অবিশ্যি উদারতার পরিচয় দিলুম আমরা। শত্রুর উল্‌টোনো জাহাজ দুটোয় পরাজিত নৌসেনাদের উঠে বসার সুযোগ দিয়ে দড়ি বেঁধে ও দুটোকে টেনে নিয়ে ফিরলুম। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন আর যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়গর্বে আমরা যখন বন্দরে প্রবেশ করলুম, তখন বাগানের বেড়ার ওপর সার দিয়ে-বসা বাচ্চা ছেলেরা তুমুল চিৎকার আর হর্ষধ্বনি জুড়ে দিয়েছে।

বাবার কাছ থেকে খুব কমই চিঠিপত্র পেতুম আমরা। কিন্তু যখনই চিঠি লিখতেন তিনি, তখন তাতে ঘুরে-ফিরে এই একটি কথাই থাকত: 'আমি বেঁচে আছি। ভালো আছি। সব সময়ে বসে থাকি ট্রেঞ্চে, কবে যে এর শেষ হবে তা দেখতে পাই নে।'

ওই সব চিঠি পড়ে আমি তো হতাশ। নাঃ, সত্যি, ভাবো একবার ব্যাপারখানা! খোদ ফ্রন্টে বসে আছেন ভদ্রলোক, অথচ মজার কিছু লেখার খুঁজে পাচ্ছেন না! আচ্ছা, একটা বেশ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে — যেমন, একটা আক্রমণ কিংবা কোনো-একটা বেশ বীরত্বপূর্ণ কাজের খবর দিয়ে — চিঠি লিখতে কী হয়। ওইসব চিঠি পড়ে মনে হত, আমাদের সেই কাদামাখা হেমন্তের আর্‌জামাস শহরের চেয়েও যেন ফ্রন্টের ব্যাপারস্যাপার বেশি ক্লান্তিকর, একঘেয়ে।

অথচ অন্যেরা — যেমন, ধর, মিত্‌কার দাদা খুদে অফিসার তুপিকভ — যুদ্ধের আর বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা দিয়ে সপ্তায় সপ্তায় বাড়িতে চিঠিই বা লেখে কী করে, ছবিই বা পাঠায় কী ভাবে? তুপিকভের পাঠানো ছবির কোনোটাতে দেখা যেত সে দাঁড়িয়ে আছে কামানের পাশে, কোনোটাতে মেসিন-গানের পাশে, আবার কোনোটাতে খোলা তরোয়াল হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। একটা ছবিতে এরোপ্লেন থেকে মাথা বের করে থাকতেও দেখা গিয়েছিল তাকে! বাবা কিন্তু কখনও ট্রেঞ্চে-বসা অবস্থার ছবি তোলেন নি, এরোপ্লেন থেকে মুখ বের করা তো দূরস্থান। চিঠিতে মজার কোনো ঘটনার কথাও লিখে জানাতেন না কোনোদিন।

একদিন সন্ধের দিকে কে যেন আমাদের সদর দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলতে ক্রাচে ভর দিয়ে কাঠের পা-ওয়ালা একজন সৈনিক ভেতরে এসে মায়ের খোঁজ করলেন। মা বাড়ি ছিলেন না। বললুম, শিগ্‌গিরই ফিরবেন। সৈনিকটি তখন বাবার একজন সাথী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, উনি আর বাবা একই রেজিমেণ্টে আছেন। তখন সৈনিক-জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে উনি আমাদের ওই জেলারই এক গ্রামে ওঁর ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। জানালেন, আমাদের জন্যে উনি বাবার শুভ কামনা আর চিঠি নিয়ে এসেছেন।

উনোনের গায়ে হাতের ক্রাচটা দাঁড় করিয়ে উনি চেয়ারে বসলেন। তারপর জামার ভেতর দিকের একটা পকেট হাঁটকে বের করলেন একখানা তেলকালিমাখা চিঠি।

ঠিক চিঠি নয়, প্যাকেট বলা চলে। প্যাকেটটা বেশ ভারি দেখে অবাকই হলুম। তার আগে বাবা আমাদের কখনও অত মোটা চিঠি লেখেন নি। আমার ধারণা হল, প্যাকেটের মধ্যে খুব সম্ভব কিছু ফোটোগ্রাফও আছে।

'আপনি আমার বাবার সঙ্গে এক রেজিমেণ্টে থেকে লড়াই করেছেন?' জিজ্ঞেস করলুম। সৈনিকটির পাতলা-পাতলা গম্ভীরমতো মুখখানা, সেণ্ট জর্জের ক্রুশপদক-লাগানো পাঁশুটে রঙের দোমড়ানো-কোঁচকানো গ্রেটকোট আর বাঁ পায়ের সঙ্গে বাঁধা কাঠের খুঁটিটার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছিলুম বারবার।

'শুধু এক রেজিমেণ্টেই নয়, আমরা দু-জন এক কোম্পানিতে, এক প্লেটুনে থেকে, এমন কি এক ট্রেঞ্চে পাশাপাশি থেকে কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে লড়েছি। তুমি ওর ছেলে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ও, তুমি বরিস? তাই তো? আমি জানি তোমাকে। তোমার বাবার কাছে কত শুনেছি তোমার কথা। তোমার জন্যেও একটা প্যাকেট আছে। তোমার বাবা কেবল বলে দিয়েছেন এটা লুকিয়ে রাখতে আর তিনি ফিরে না-আসা পর্যন্ত এটা না ছুঁতে।'

একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে তুলে নিলেন সৈনিকটি। উঁচু বুটের ওপরের কানাত কেটে ঘরে-তৈরি ব্যাগটা। প্রত্যেকবার ওঁর নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়োডোফর্মের কড়া গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছিল।

ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাপড়ে-মোড়া আর সুতো-দিয়ে শক্ত-করে-বাঁধা একটা প্যাকেট বের করে উনি আমায় দিলেন। প্যাকেটটা ছোট্ট, কিন্তু বেশ ভারি। আমি তখুনি সেটা খুলতে গেলুম, কিন্তু সৈনিকটি বললেন:

'এত তাড়া কিসের? পরে খুলো'খন, অনেক সময় পাবে।'

'আচ্ছা, বলুন তো, ফ্রন্টের খবর কী? লড়াই কেমন চলছে? আমাদের সেনাবাহিনীর মনোবল কেমন?' ধীরে-সুস্থে, গম্ভীরভাবে আমি জানতে চাইলুম।

মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে সৈনিকটি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দুঃসহ, কিছুটা বিদ্রুপভরা চোখের দৃষ্টি আমাকে কেমন অপ্রস্তুত করে দিল। প্রশ্নটা আমার নিজের কানেই এবার খানিকটা জাঁকালো আর বোকা-বোকা শোনাল।

'মনের জোরের কথা বলছ?' বলে সৈনিকটি হাসলেন। 'মনের জোরের কথা ঠিক জানি না, তবে দুর্গন্ধটা খুব জোর। ট্রেঞ্চে তা ছাড়া আর কি আশা করা যায়। পায়খানার চেয়েও নোংরা।'

তামাকের থলি বের করে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে কটুগন্ধ মাখোর্কা তামাকের একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন সৈনিক। আমার পেছন দিকে সূর্যাস্তের আভায় ঝলমলে জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন:

'প্রত্যেকেই হাড়ে-মজ্জায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এর কোনো শেষও দেখা যাচ্ছে না।'

হঠাৎ মা ঘরে ঢুকলেন। সৈনিককে দেখে তিনি দোরগোড়াতেই থেমে গিয়ে দু-হাতে দরজার দুই চৌকাঠ চেপে ধরলেন।

'কী... কী খবর?' দুই ঠোঁট একেবারে রক্তশূন্য, ফিসফিস করে শুধোলেন তিনি, 'আলেক্সেইয়ের ব্যাপারে তো?'

'মা, বাবা আমাদের চিঠি পাঠিয়েছে!' আমি হৈ-চৈ করে উঠলুম। 'বেশ মোটা চিঠি। খুব সম্ভব ছবিও আছে। বাবা আমাকেও উপহার পাঠিয়েছে, মা।'

গায়ের শালটা খুলে ফেলে মা এবার প্রশ্ন করলেন, 'ও বেঁচে আছে? ভালো আছে তো? দোরগোড়া থেকে ছাইরঙের কোটটা দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল। ভাবলুম, কত্তার নিশ্চয়ই ভালোমন্দ কিছু হয়েছে।'

'অন্তত এখনও পর্যন্ত কিছু হয় নি,' সৈনিকটি বললেন। 'উনি আপনাদের শুভকামনা জানিয়েছেন আর আমাকে এই প্যাকেটটা আপনাকে দিতে বলেছেন।

এটা ডাকে পাঠাতে ভরসা পান নি। আজকাল তো ডাকের ওপর নির্ভর করা যায় না।'

মা খামখানা ছিঁড়লেন। নাঃ, খামের মধ্যে একখানাও ফোটোগ্রাফ নেই, খালি তেলকালিমাখা আর ঘন-করে-লেখা এক বাণ্ডিল কাগজ। তার মধ্যে একখানা কাগজে আবার এক টুকরো মাটি মাখানো আর সাঁটা ঘাসের শুকনো সবুজ এক চিল্‌তে ডগাও।

আমার প্যাকেটটাও খুলে ফেললুম। দেখি, তার মধ্যে রয়েছে একটা ছোট্ট মাওজার পিস্তল। সঙ্গে বাড়তি একটা ক্লিপ।

'তোমার বাবা ভেবেছেন কী! এটা কি একটা খেলনা হল!' মা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন।

'তা হোক,' সৈনিকটি বললেন। 'আপনার ছেলে বোকাহাবা কি খেপা নয় তো? দেখুন না, কেমন আমার মাথায়-মাথায় হয়ে উঠেছে। এটা এখন ও কিছুদিন লুকিয়ে রাখুক। খুব ভালো পিস্তল, বুঝলেন না? আলেক্সেই এক জার্মান ট্রেঞ্চে এটা পেয়েছিল। যন্তরটা চমৎকার। পরে কাজে লাগতে পারে।'

ঠাণ্ডা, মসৃণ হাতলটায় একবার হাত বুলিয়ে, মাওজারটা যত্ন করে আবার কাপড়ে মুড়ে দেরাজের একটা টানায় রেখে দিলুম।

সৈনিক আমাদের সঙ্গে চা খেলেন এরপর। গ্লাসের পর গ্লাস চা খেতে-খেতে বাবার বিষয়ে আর যুদ্ধ সম্বন্ধে কত কথাই না বললেন। আমি খেলুম আধ গ্লাস আর মা তাঁর কাপ ছুঁলেন না পর্যন্ত। তারপর মা শিশি-বোতলের কাঁড়ি হাঁটকে কোথা থেকে ছোট্ট এক বোতল অ্যাল্‌কোহল বের করে সৈনিকটিকে খেতে দিলেন। চোখ কুঁচকে উনি জল মিশিয়ে পাতলা করে নিয়ে আস্তে-আস্তে গ্লাসের সবটুকু খেয়ে ফেললেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন তারপর।

গ্লাসটা একপাশে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'জীবনটা কেমন যেন নয়ছয় হয়ে গেছে। দেশ-গাঁ থেকে চিঠি পেয়েছি, খেত খামার উচ্ছন্নে গেছে। কিন্তু আমি তার কী করতে পারি? বলে আমরাই ফ্রণ্টে মাসের পর মাস উপোস করে থেকেছি। মনে হত, জঘন্য নরকে পচে মরছি। ভাবতুম, কবে এ যন্তন্না শেষ হবে। যা হোক একটা কিছু এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাক। মানুষের পক্ষে যতদূর সহ্য করা সম্ভব লোকে তা করছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেটলিতে ঘোলাটে চায়ের জল যেমন ফোটে তেমনি ভেতরটায়

সবকিছু যেন টগবগ করে ফুটছে। মনে হয়, ধুত্, সব কিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে চলে যাওয়ার সাহস যদি আমার থাকত। যাদের ইচ্ছে হয় লড়াই করুক, কিন্তু আমার কী দায় পড়েছে! আমি তো জার্মানদের কাছে কিছু ধারি না, জার্মানও আমার কাছে ধারে না কিছু। আলেক্সেই আর আমি এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। লম্বা লম্বা রাত যেন কাটতেই চায় না। ছারপোকার দৌরাত্মিতে ঘুমোনোর তো উপায় নেই। একমাত্তর সান্ত্বনা হল, গান গাওয়া কিংবা কথা বলা। মাঝে মাঝে মনে হত, প্রাণভরে কাঁদি আর নয় তো কারো গলা টিপে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই। কিন্তু কিছুই করতুম না, খালি স্থির হয়ে বসে গান ধরে দিতুম। পোড়া চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছিল। ভাবতুম, কারো উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ি, কিন্তু সাধ্যি কী যে তা করি! কাজেই শেষ পর্যন্ত বলতুম, ইয়ার-দোস্ত ভাইসব, সাথী ভাইসব, এসো একটা গান গাই!'

সৈনিকটির মুখখানা লাল হয়ে ঘামে ভিজে উঠেছিল, আয়োডোফর্মের গন্ধ ঘন হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ। জানলাটা খুলে দিলুম। তর্‌তাজা সন্ধে, উঠোনে জমা-করা খড় আর বেশি-পাকা চেরির সুবাস বয়ে হাওয়া এসে ভরিয়ে দিল ঘর।

জানলার ধারে উঠে বসে শার্সির গায়ে এক আঙুলে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে সৈনিকটির কথা আমি শুনছিলুম একমনে। কথাগুলো আমার বুকটার মধ্যে যেন শুকনো খর্‌খরে ধুলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল, আর সেই ধুলো ক্রমশ জমতে-জমতে পুরু হয়ে যুদ্ধ, যুদ্ধের পবিত্র তাৎপর্য আর তার বীরদের সম্বন্ধে আমার এতদিনের সাধের ধারণাকে দিচ্ছিল একেবারে চাপা দিয়ে। অথচ সেদিন পর্যন্ত ওই সব ধারণা আমার কাছে কেমন স্পষ্ট, কতখানি বোধগম্যই না ছিল। সৈনিকটির দিকে তাকিয়ে আমার কেমন ঘৃণা বোধ হল। উনি কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেললেন, তারপর শার্টের ভেজা কলারের বোতাম খুলে বাঁধন আলগা করে দিলেন। বোঝা গেল, অল্প একটু নেশা হয়েছে ওঁর।

ফের উনি শুরু করলেন, 'মৃত্যু কেউ চায় না, এটা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুর জন্যেই যে যুদ্ধটা খারাপ লাগে তা নয়, খারাপ লাগে এর মধ্যে একটা অন্যায়ের বোধ মিশে আছে বলে। মৃত্যুর মধ্যে কিন্তু এই বোধটা নেই। প্রত্যেককেই মরতে হবে, আগে আর পরে এই যা তফাত। এ নিয়ে কিছু করার নেই, এ তো নিয়ম। কিন্তু লড়াই

করতে হবে, এ নিয়ম কে চাল্ব করল? আমি, আপনি, এ-ও-সে আমরা কেউ নয়, তব্ব কেউ নিশ্চয় নিয়মটা র্বজ্ব করেছে। আচ্ছা, বইতে যেমন লেখে ঈশ্বর যদি সত্যিই তেমন সর্বশক্তিমান, চির-দয়াল্ব আর সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, তবে তিনি সেই বেয়াদব লোকটাকে তো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলতে পারতেন: 'আমার এই কথাটার জবাব দে দিকি — এই লক্ষ লক্ষ মান্বষকে য্বদ্ধে ঠেলে দিলি তুই কী জন্যে? এতে ওদেরই বা লাভ কী, আর তোরই বা লাভ কোথায়? আচ্ছা, আসল ব্যাপারটা কী এখন খোলসা করে বল্ দেখি, যাতে সবাই জানতে পারে ওরা য্বদ্ধ করছে কী জন্যে?' 'কিন্তু', এই পর্যন্ত বলে সৈনিক হঠাৎ টলে উঠলেন, গ্লাসটাও তাঁর হাত থেকে প্রায় পড়ে যাবার মতো হল। পরে সামলে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু ঈশ্বর এই সব ঐহিক ব্যাপারে মাথা গলাতে চান না, এই তো? ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করি। আমরা ধৈর্যশীল জাত। কিন্তু এটা ঠিক, যখন আমাদের ধৈর্য টলে যাবে তখন নিজেরাই আমরা গিয়ে জজ আর আসামীদের খ্বঁজে বের করব।'

উনি চুপ করলেন আর রাগে ম্বখটা কালো করে একবার মা-র দিকে তাকালেন। মা এতক্ষণ দ্ব-চোখ টেবলক্লথের দিকে নামিয়ে ঠায় বসে ছিলেন, সারাক্ষণ একটিও কথা বলেন নি। সৈনিকটি এবার উঠে হেরিং মাছের থালার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আর এতক্ষণে হঠাৎ সান্ত্বনা দেয়ার মতো নরম স্বরে বললেন:

'নাঃ, সত্যি, এতক্ষণ কী নিয়ে যে বকবক করছি! কিছ্ব মনে করবেন না... সময়ে সবকিছ্ব ঠিক হয়ে যাবে। বোতলে আর কি কিছ্ব আছে বৌঠান?'

চোখ না-তুলেই মা ওঁর গ্লাসে গন্ধওয়ালা উষ্ণ মদ আরও কিছ্বটা ঢেলে দিলেন।

সেদিন সারা রাত পার্টিশনের ওধার থেকে মা-কে কাঁদতে শ্বনল্বম। থেকে থেকে শ্বনতে পাচ্ছিল্বম বাবার চিঠির পাতা ওল্টানোর আওয়াজ। পরে পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল্বম হালকা সব্জেটে আলোর আভা। আন্দাজ করল্বম, ছোট্ট তেলের কুপির নিচে বসানো যিশ্বর ম্বর্তির সামনে মা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করছেন। বাবার ওই চিঠিটা আমাকে আর দেখান নি মা। কী যে লিখেছিলেন বাবা আর মা-ই বা সে রাত্রে কেন কাঁদছিলেন তা সে-সময়ে জানতে পারি নি।

পরদিন সকালে সৈনিকটি চলে গেলেন।

রওনা হবার আগে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে, যেন আমি ওঁকে কিছ্ব জিজ্ঞেস করেছি তারই জবাব দেয়ার ভঙ্গিতে, বললেন:

'তাতে হয়েছে কি, খোকা... তুমি তো এখনও বাচ্চা। আমি নিশ্চয় বলছি, তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখবে, ঢের বেশি!'

বিদায় নিয়ে পা ঠুকে-ঠুকে চলে গেলেন উনি। সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওঁর ক্রাচজোড়া, আয়োডোফর্মের গন্ধ, ওঁর উপস্থিতির দরুন আমাদের মধ্যে যে-মনমরা-ভাব দেখা দিয়েছিল তা, আর ওঁর কাশির দমক-মেশানো হাসি, আর তিত্‌কুটে সব কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছিল। ফেদ্‌কা তখন ওর দ্বিতীয় পরীক্ষার পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আর ইয়াশ্‌কা সুক্কারস্তেইন জ্বরে শয্যাশায়ী। হঠাৎ কেমন একা হয়ে পড়লুম। বিছানায় গড়িয়ে বাবার বইগুলো আর খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটাতে লাগলুম।

যুদ্ধ শেষ হবার কোনো লক্ষণ কোনোদিকে দেখা যাচ্ছিল না। ওদিকে শহর ভরে গিয়েছিল শরণার্থীতে। জার্মানরা এগিয়ে আসছিল সারা ফ্রন্ট জুড়ে। পোল্যান্ডের অর্ধেকেরও বেশি দখল করে নিয়েছিল তারা। যাদের অবস্থা ছিল একটু ভালো সেই সব শরণার্থী অন্য লোকের বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। আমাদের মহাজন ব্যবসাদার, সন্ন্যাসী আর পাদ্রিসাহেবরা সবাই ছিলেন ধর্মভীরু লোক, তাই তাঁরা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে নারাজ ছিলেন। কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ইহুদি, আর তাঁদের পরিবারও ছিল মস্ত-মস্ত। তাই বেশির ভাগ শরণার্থীই শহরের বাইরে বনের ধারে ধাওড়ায় বাস করতে লাগল।

এই সময়ের মধ্যে গাঁয়ে-গাঁয়ে যত যুবক ছিল, যত ছিল স্বাস্থ্যবান চাষী সবাইকে চালান করে দেয়া হয়েছিল ফ্রন্টে। ফলে অনেক খামার দেখাশোনার অভাবে যাচ্ছিল নষ্ট হয়ে। মাঠে খাটার লোক রইল না। দলে দলে ভিখারীরা — বুড়ো-বুড়ি, মেয়েমানুষ আর কচি বাচ্চা — শহরে আসতে শুরু করল।

আগে আমাদের শহরের রাস্তায় সারা দিন হাঁটলেও একজন অচেনা লোকের দেখা পাওয়া যেত না। সকলেরই যে নাম জানতুম তখন তা নয়, কিন্তু আগে কখনও-না-কখনও দেখায় চিনে গিয়েছিলুম প্রত্যেককে। আর এখন পা ফেললেই নতুন

লোকের সঙ্গে দেখা, — আর তারা ছিল নানা জাতের, কেউ-বা ইহুদি, কেউ রুমানিয়ান, কেউ পোল। তাছাড়া অস্ট্রিয়ান যুদ্ধবন্দী আর রেড ক্রশ হাসপাতালের জখম-হওয়া সৈন্যরা তো ছিলই।

এরপর দেখা দিল খাবারের ঘাটতি। মাখন, ডিম আর দুধ ভোরবেলাতেই বাজার থেকে চড়া দামে বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। রুটিওয়ালার দোকানে রুটি কিনতে লাইন পড়ে গেল। পাঁউরুটি তো পাওয়াই যাচ্ছিল না, সকলের খাবার মতো রাইয়ের রুটিও যথেষ্ট ছিল না। ব্যবসাদাররা নির্দয়ভাবে সব জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে লাগল, এমন কি খাবার ছাড়া অন্য জিনিসপত্রের দরও।

লোকে বলতে লাগল, বেবেশিন একা নাকি আগের এক বছরে যত পয়সা কামিয়েছিল তার আগের পাঁচ বছরে তত কামায় নি। আর সিনিউগিন এত ধনী হয়ে উঠল যে একটা গির্জেয় সে ছ-হাজার রুব্‌ল দান করে বসল। এ-সময়ে টেলিস্কোপ-ওয়ালা তার সেই গম্বুজের দিকে আর ফিরেও তাকাত না, বরং মস্কো থেকে অর্ডার দিয়ে আনাল জলজ্যান্ত একটা কুমির আর একটা নতুন পুকুর কাটিয়ে সে কুমিরটাকে তার মধ্যে জীইয়ে রাখল।

কুমিরটাকে যেদিন রেলস্টেশন থেকে শহরে আনা হল সেদিন কুমিরের গাড়ির পিছু পিছু কৌতূহলী মানুষের এমন একটা প্রকাণ্ড ভিড় এসেছিল যে 'পরিত্রাতার' গির্জের পবিত্র জিনিসপত্রের রক্ষক টেরা গ্রিশ্‌কা বোচারভ ব্যাপারটাকে আমাদের মাতৃদেবীর ওরান্‌স্কের প্রতিমূর্তি-বাহী ধর্মীয় শোভাযাত্রা বলে ভুল করে গির্জের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে দিয়েছিল। এর জন্যে বিশপ গ্রিশ্‌কাকে তেরো দিন প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দিয়েছিলেন। গির্জের যজমানদের মধ্যে অনেকে কিন্তু বললেন, গ্রিশ্‌কা যে ভুল করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়ার কথা বলেছিল সেটা নাকি ডাহা মিথ্যে। তাঁদের মতে, ও বজ্জাতির মতলব নিয়েই ইচ্ছে করে ঘণ্টা বাজিয়েছিল। তাই প্রায়শ্চিত্তের শাস্তি ওর পক্ষে যথেষ্ট নয়। উচিত, ওকে গারদে ভরে একটা উদাহরণ স্থাপন করা। মড়া নিয়ে শোকযাত্রাকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বলে ভুল করলে তবু সহ্য হয়, কিন্তু কুমিরের মতো একটা ঘৃণ্য জন্তুকে দেবীমূর্তি বলে ভান করা মারাত্মক পাপকাজ ছাড়া কিছু নয়।

বই বন্ধ করে রাস্তায় বেরুলুম। কিছু করার না-থাকায় শহরের বাইরে কবরখানায় তিম্‌কা শ্‌তুকিনের সঙ্গে দেখা করতে দৌড় দিলুম। তিম্‌কাকে বাড়িতে পাওয়া

গেল না। প্যাকা মাথা, বলিষ্ঠ চেহারার বৃদ্ধ তিম্‌কার বাবা আমার বাবার অনেক দিনের চেনা। উনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন:

'বাঃ, দিব্যি বড় হয়েচ যে খোকা! তোমার বাবা ফিরে এসে তোমায় দেখি চিনতেই পারবেন না। ঠিক বাপের মতো হচ্চ — অমনি বড়সড়, শক্তসমর্থ হয়ে উঠবে সময়ে! আমার তিম্‌কাটা একেবারে বেঁটেখাটো ক্ষয়া-খপপুরে হচ্চে, কপালটাই খারাপ। নিঘ্‌ঘাত ও ওর মা-র বাবা দাদামশাইয়ের মতো হচ্ছে। যা খায় তা কোথায় যে যায় কে জানে! তারপর, বাবার খবর ভালো তো? তাঁকে চিঠি লেখার সময় আমার নমস্কার জানিও। সত্যিকার একজন মহাশয় লোক, তোমার বাবা। তিনি আর আমি এক সময়ে এক গাঁয়ের ইশকুলে আট বছর চাকরি করেছি। উনি ছিলেন মাস্টার। আর আমি চৌকিদার। তবে সে হল গিয়ে আজ বহুকালের কথা... তুমি তখন দুধের বাচ্চা, তোমার এ-সব মনে থাকার কথা নয়। আচ্ছা, আচ্ছা, দৌড় লাগাও। তিম্‌কা এই কাছাকাছি কোথাও আছে, গোল্ডফিঞ্চ-পাখি ধরছে বোধ হয়। সৈন্যদের কবরগুলোর পেছনে, কোণের দিকে, বার্চ-বনে খোঁজ কর দেখি। ওর এদিকে ও বড় একটা পাখি ধরে না, গির্জের চৌকিদার দেখতে পেলে বকে কিনা, তাই।'

বার্চ-বনেই পেলুম তিম্‌কাকে। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে লাঠির ডগায় ফাঁস লাগিয়ে ও লাঠিটাকে সাবধানে একটা গোল্ডফিঞ্চ-পাখির কাছাকাছি সরিয়ে সরিয়ে আনছিল। হলুদ-হয়ে-আসা গাছের পাতার ফাঁকে পাখিটাকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে প্রায় মিনতির ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল তিম্‌কা, তারপর জোরে-জোরে মাথা নেড়ে সাবধান করে দিল আমি যেন আরও কাছে গিয়ে পড়ে পাখিটাকে ভয় পাইয়ে না দিই। আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

যদি আমার মত চাও তো বলব, গোল্ডফিঞ্চের চেয়ে বোকা পাখি দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ছেলেরা গোল ফাঁসের আকারে এক টুকরো ঘোড়ার বালামচি একটা লম্বা লাঠির আগায় বেঁধে নেয়, তারপর পাখির গলায় সাবধানে ওই ফাঁসটা গলিয়ে দেয়। এতেই গোল্ডফিঞ্চ ধরা পড়ে।

তিম্‌কা আস্তে আস্তে ওর লাঠির ডগাটা ফিঞ্চের কাছে সরিয়ে আনল। পাখিটা একচোখে ফাঁসের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরেসুস্থে পাশের ডালে সরে গেল। গভীর মনোযোগে জিভ বের করে, দম বন্ধ করে তিম্‌কা আবার ফাঁসটা পাখির দিকে সরিয়ে আনতে লাগল। আর বোকা ফিঞ্চটা তিম্‌কার কাজকর্ম যেন বেশ কৌতূহলের সঙ্গে

লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর হাঁদার মতো নির্বিকারভাবে ফাঁসটাকে ওর মাথার ওপর দিয়ে গলাতে দিল। তিম্‌কা হাতের লাঠিতে একটা ঝাঁকুনি দিতেই আধা-ফাঁসি-যাওয়া অবস্থায় ফিঞ্চটা একটা টুঁ-শব্দ পর্যন্ত না করে পাগলের মতো ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে ঝুপ করে ঘাসে এসে পড়ল। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল পাখিটা আর তার আরও গোটা পাঁচেক সঙ্গী একটা খাঁচার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

এক পায়ে লাফিয়ে নাচতে নাচতে ওদিকে তিম্‌কাও চেঁচাতে লাগল, 'দেখছিস, দেখছিস! কী দুর্দান্ত কায়দা! ছ-ছটা পাখি। কেবল সবকটাই ফিঞ্চ এই-যা। তা বলে টিট-পাখিকে এভাবে ধরা যাবে না। ফাঁদ, জাল, এই সব ব্যবহার করতে হবে। ওরা ভীষণ চালাক! এই বোকাগুলোই কেবল মাথা গলিয়ে দেয়...'

আচমকা থেমে গেল তিম্‌কা। মুখখানা স্থির হয়ে এমন পাথরের মতো হয়ে গেল যে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি মোটা লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে মাথায়। আমাকে সাবধান করে ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে পুরো দু-মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই লাফিয়ে উঠল। বলল:

'শুনলি তো?'

'কী শুনব? আমি তো শুধু রেলস্টেশনে এঞ্জিনের বাঁশি বাজতে শুনলুম।'

'হায় কপাল! কিছু শুনতে পায় না!' অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো আকাশপানে তুলে তিম্‌কা বলল, 'রবিন রে! শুনলি না, ডেকে উঠল? সত্যিকার রাঙা বুকওলা রবিন। এক হপ্তার বেশি আমি ওটাকে খুঁজছি। সেই জলে-ডোবা লোকটাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল, জানিস তো? সেই, সেইখানে ওর বাসা। কোনো একটা মেপ্‌ল-গাছে। মেপ্‌ল-গাছে জঙ্গল হয়ে আছে জায়গাটায়, আর গাছের পাতাগুলো এখন দেখতে লাগছে আগুনের মতো, ঝলমল করছে যেন। চল্‌, যাবি? দেখে আসব।'

প্রতিটি কবর, প্রতিটি স্মৃতিফলক তিম্‌কার চেনা। পাখির মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে-চলতে ও চিনিয়ে দিতে লাগল।

'এটা সেই দমকলের লোকটার — ওই-যে গত বছর আগুনে পুড়ে যে মারা গেল, তার। আর এটা অন্ধ চুর্‌বাকিনের। এদিকটায় সব ওই ধরনের লোকের কবর। ব্যবসাদার মহাজনদের এখানে গোর দেয়া হয় না। ওদের জন্যে একটা সরেস জমিতে

বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ওই যে, দেখতে পাচ্ছিস, সিনিউগিনের ঠাকুরমার কবরের ওপর পাথরের মূর্তি আর কটা দেবদূত। এদিকে দ্যাখ্,' কোনোরকমে নজরে পড়ে এমন একটা মাটির ঢিবির দিকে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল তিম্‌কা, 'এটা যার কবর সে লোকটা আত্মহত্যা করেছিল। বাবা বলছিল লোকটা নাকি ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। লোকটা ডিপো-কারখানায় ফিটার-মিস্ত্রির কাজ করত। আমি তো বুঝতেই পারি না ইচ্ছে করে কেউ নিজের গলায় দড়ি দেয় কী করে।'

'জানিস তিম্‌কা, আমার মনে হয় লোকটার নিশ্চয় কষ্টের জীবন ছিল, সুখের জীবন ছিল না। তাই না?'

'কী বলতে চাস্ তুই!' তিম্‌কা প্রতিবাদ করল। মনে হল, ও কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেছে। 'এটা নিশ্চয়ই খারাপ নয়?'

'কোন্‌টা খারাপ নয়?'

'জীবনটা। জীবনটা ভারি মজার, ভারি ভালো। মরাটা কী করে আরও ভালো হতে পারে? বেঁচে থাকলে ছুটে বেড়াতে পারিস, যা খুশি করতে পারিস। আর এখেনে তোকে তো চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকতে হবে!'

হেসে উঠল তিম্‌কা। রিন্‌রিনে ঢেউ-খেলানো হাসি। তারপর আচমকা হাসি বন্ধ করল। ওর চোখের চাউনিতে কেমন যেন একটা হতবুদ্ধি ভাব। এক মিনিট চুপ করে থেকে ও ফিসফিসিয়ে বলল:

'এখন চুপ। পাখিটা কাছেই কোথাও আছে। লুকিয়ে আছে দুষ্টু মিষ্টু পাখিটা! যাই হোক, ওকে ধরবই আজ।'

সেদিন সন্ধে পর্যন্ত তিম্‌কার সঙ্গে কাটালুম আমি। ভারি মজার ছেলে তিম্‌কাটা। আমার চেয়ে ও ছিল মোটে দেড় বছরের ছোট, কিন্তু দেখতে এত ছোটখাট ছিল যে বারো কেন ওর বয়েস দশ বছর বলেও মনে হত না। আর এমন সদা-ত্রস্তব্যস্ত ভাব ছিল ওর যে ক্লাসের বন্ধুরা ওকে নিয়ে মজা করার সুযোগ পেলে ছাড়ত না। প্রায়ই ওর মাথার টাকে গাঁট্টাটাঁট্টাও ঝাড়ত দু-চারটে, কিন্তু ও কখনই রাগ করত না, কিংবা করলেও তা বেশিক্ষণ রাখত না। তিম্‌কা যখন কারো কাছে কিছু চাইত, যেমন, ধরা যাক, পেন্সিল কাটতে বা কলমের নিব সরু করতে একটা ছুরি, কিংবা একটা শক্ত অঙ্ক কষার ব্যাপারে একটু-সাহায্য, ও তখন সেই অন্য ছেলেটার মুখের দিকে ওর বড়-বড় গোল-গোল চোখ মেলে আর মুখে একটা কিন্তু-কিন্তু হাসি

নিয়ে সটান চেয়ে থাকত। তিম্‌কা ছিল ভিতু, কিন্তু ওর ভয়টা ছিল এক বিশেষ ধরনের। ইন্‌স্পেক্টর কিংবা হেডমাস্টার-মশাই আসছেন শুনলে ও যে কী সাংঘাতিক ভয় পেত তা কহতব্য নয়। একবার ক্লাস চলবার সময় ইশকুলের দারোয়ান এসে খবর দিলে টিচার্স রুমে তিম্‌কার ডাক পড়েছে। আর তিম্‌কা! তিম্‌কা তখন জবুথবু হয়ে নিজের সিটে বসে আছে। অনেক কষ্টে যখন সে সিট ছেড়ে উঠল, তখন প্রথমেই আস্তে-আস্তে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল। যেন বলতে চাইল: 'কী করেছি আমি? মাইরি বলছি, আমি কিছু করি নি!' ওর অল্পস্বল্প বসন্তের দাগওয়ালা মুখ তখন ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে। টলতে-টলতে ও ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

খেলার সময় আমরা অবিশ্যি জানতে পারলুম কেন ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কেন, বল দেখি? না-না, হাতে হাতকড়া লাগিয়ে কয়েদখানায় পাঠানোর জন্যে নয়, এমন কি খারাপ আচরণের জন্যে লিস্টে ওর নাম তোলার উদ্দেশ্যেও নয়, শুধু আগের বছর বিনা পয়সায় তিম্‌কা যে গণিতের পাঠ্যবইটা ইশকুল থেকে পেয়েছিল সেজন্যে কোথায় যেন একটা সই করতে!

দু-দিন পরে আবার খুলে গেল ইশকুল। আবার গমগম করতে লাগল ক্লাসরুমগুলো। প্রত্যেকেই কী করে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়েছে তা বলতে লাগল, এককে জনে কত কত মাছ, কাঁকড়া, গিরগিটি আর শজারু ধরেছে তার হিসেব দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একজন বড়াই করে বললে সে বাজপাখি শিকার করেছে, আরেকজন উত্তেজিত হয়ে বর্ণনা দিতে লাগল কেমন করে সে জঙ্গল থেকে ব্যাঙের ছাতা আর বুনো স্ট্রবেরি সংগ্রহ করেছে, তৃতীয় জন দিব্যি গেলে বলতে লাগল সে একটা জ্যান্ত সাপ ধরেছে। ইশকুলে এমনও কিছু ছেলে ছিল যারা সারা গ্রীষ্ম ক্রাইমিয়া আর ককেশাসের স্বাস্থ্যনিবাসগুলোয় কাটিয়েছিল। তবে সংখ্যায় এরা ছিল খুবই কম। এরা নিজেদের আর সকলের থেকে একটু তফাত করে রাখত, শজারু কি বুনো স্ট্রবেরির গপ্পো ফাঁদত না, কেবল পামগাছ, সমুদ্রে স্নান আর ঘোড়া নিয়ে গম্ভীর চালে আলাপ করত নিজেদের মধ্যে।

ওই বছর, এবং সেই প্রথম, আমাদের জানানো হল যে জিনিসপত্র সাংঘাতিক দুর্মূল্য হয়ে ওঠায় সাধারণত আমরা যে-রকম পশমী কাপড় ব্যবহার করতুম

অভিভাবকরা আমাদের তার চেয়ে শস্তার কাপড় দিয়ে বানানো ইশকুলের পোশাক ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছেন।

মা আমাকে এক রকম কাপড় দিয়ে টিউনিক আর ট্রাউজার্স বানিয়ে দিলেন। কাপড়টাকে বলা হত শয়তানের চামড়া।

নির্ঘাত কাপড়টা শয়তানের পিঠের চামড়া থেকে তৈরি হয়েছিল তা না হলে একদিন মঠের ফলবাগানে ফল চুরি করতে গিয়ে প্রকাণ্ড, জবুথবু চেহারার এক সন্ন্যাসী লাঠি হাতে আমাদের তাড়া করলে পাঁচিল টপকে হাঁচড়পাঁচড় করে পালাতে গিয়ে আমার ট্রাউজার্স যখন একটা বড় পেরেকে আটকে গেল তখন শত টানাটানিতেও কাপড়টা ছিঁড়ল না কেন। আর এর ফলে সেদিন পেরেকে ট্রাউজার্স বেধে আমি ঝুলতে থাকলুম আর সন্ন্যাসীটা বেশ আশ মিটিয়ে আমার পিঠে সজোরে গোটা দুই লাঠির ঘা লাগাল।

আরও একটা নতুনত্ব ঘটল জীবনে। আমাদের ইশকুলের সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার যুক্ত হলেন। আমাদের জুটল সত্যিকার রাইফেলের মতো দেখতে সব কাঠের রাইফেল। তাই নিয়ে আমাদের সামরিক কুচকাওয়াজ শুরু হল।

এক পা-ওয়ালা সেই সৈনিকটি আমাদের চিঠি এনে দেবার পর বাবার কাছ থেকে আর একটিও চিঠি পাই নি। আমার ছোট্ট বোনটা সব সময়ে বাবার চিঠির অপেক্ষায় থাকত। ফেদ্‌কার বাবাকে তাঁর ডাকপিওনের ব্যাগ নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলেই আমার ছোট বোনটি জানলা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে রিন্‌রিনে গলায় ডাকাডাকি শুরু করত:

'সের্গেই-কাকা, বাবা কিছু পাঠিয়েছে?'

আর ওঁর কাছ থেকে সেই একই উত্তর মিলত:

'না, খুকি, আজ তো আসে নি। তবে কাল নিশ্চই আসবে, দেখো।'

কাল — কাল — কাল। সেই কাল কিন্তু আসত না কিছুতেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একদিন — তখন সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেছে — ফেদ্‌কা আমার সঙ্গে বেশ রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে রইল। একসঙ্গে আমরা ক্লাসের পড়া তৈরি করছিলুম সেদিন।

আমরা সবে কাজ শেষ করেছি, বাড়ি যাবে বলে ফেদ্‌কা বই গ্‌ছোচ্ছে, এমন সময় জোর বৃষ্টি নামল।

বাগানের দিকের জানলাটা বন্ধ করতে দৌড়ল্‌ম আমি।

দমকা বাতাসে রাশি রাশি শ্‌কনো ঝরা পাতা উড়তে লাগল। বৃষ্টির কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা আমার ম্‌খে পড়ল।

জানলার একটা পাল্লা শার্সি অনেক কষ্ট করে টেনে বন্ধ করল্‌ম। আরেকটা পাল্লা টানব বলে জানলা দিয়ে ঝুঁকতেই একটা বেশ বড় মাটির ঢেলা জানলার তাকে এসে পড়ল।

আমি ভাবল্‌ম, 'ঝড় বটে একখানা! গাছটাছ সব মড়মড়িয়ে না ভাঙে এবার।'

ফিরে এসে ফেদ্‌কাকে বলল্‌ম:

'বাইরে রীতিমতো ঝড় হচ্ছে রে। এখন চল্‌লি কোথায়, বোকা গাধা? ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নেমেছে! দেখছিস এই মাটির টুকরোটা? হাওয়ার চোটে উড়ে এসে জানলার ভেতরে পড়ল।'

ঢেলাটার দিকে ফেদ্‌কা কিন্তু সন্দেহের চোখে তাকাল।

'বানিয়ে বলার আর জায়গা পাস না? অত বড় ঢেলাটা হাওয়ার চোটে উড়ে এসে ঘরে পড়ল?'

'ভাবছিস গ্‌ল্‌ মারছি?' চটে উঠে বলল্‌ম। 'বলছি না? জানলাটা বন্ধ করছি এমন সময়ে ঠক করে জানলার তাকের ওপর এসে পড়ল।'

মাটির ঢেলাটার দিকে আরেকবার তাকাল্‌ম। আচ্ছা, বাইরে থেকে কোনো লোক দ্‌ষ্টুমি করে এটা ছোড়ে নি তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা মন থেকে দ্‌র করে দিয়ে বলল্‌ম:

'দ্‌র, বাজে কথা! ঢেলা আবার কে ছ্‌ড়তে যাবে? এই দ্‌র্যোগে বাগানে আবার কে থাকতে যাবে? নিশ্চয়ই বাতাসের ঝাপ্‌টায় এসেছে।'

মা ছিলেন পাশের ঘরে। সেলাই করছিলেন। ছোট বোন ঘ্‌মোচ্ছিল। ফেদ্‌কা বসে রইল আরও আধঘণ্টা। তারপর আকাশ পরিষ্কার হল। জানলার ভিজে শার্সি ভেদ করে চাঁদ উঁকি দিল ঘরে। বাতাসের দাপটও এল কমে।

'এবার চলি,' বলল ফেদ্‌কা।

'ঠিক আছে। আমি আর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি না, বুঝলি। তুই খালি দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে যা। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে'খন।'

মাথায় টুপি চড়িয়ে, বইগুলো যাতে জলে ভিজে না যায় সেজন্যে কোটের ভেতর পুরে নিয়ে ফেদ্‌কা চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজে বুঝলুম ও বেরিয়ে গেল।

শুতে যাব বলে জুতো ছাড়তে লাগলুম। মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি, ফেদ্‌কা ভুলে ওর একখানা এক্সারসাইজ খাতা ফেলে চলে গেছে। ও মা, এ তো দেখি যে খাতায় আমরা অঙ্ক কষছিলুম সেই খাতাখানাই।

'দেখেছ কাণ্ড, আচ্ছা আহাম্মক তো!' মনে মনে ভাবলুম। 'কাল আমাদের প্রথম পিরিয়ডেই অ্যালজেব্রার ক্লাস। খাতাখানা আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে দেখছি।'

জামাকাপড় ছেড়ে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লুম। পাশ ফিরে ঘুমোবার উদ্যোগ করতে যাচ্ছি এমন সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। কে যেন আস্তে, সাবধানে ঘণ্টা বাজাল।

মা অবাক হলেন, 'এ-সময়ে কে এল আবার? কত্তার টেলিগ্রাম নয় তো? না বোধহয়। ডাকপিওন তো সব সময়ে জোরসে ঘণ্টাটা বাজায়। যাও, দোরটা খুলে দ্যাখো দেখি, কে।'

'জামাকাপড় খুলে ফেলেছি যে। এ নিশ্চয়ই ফেদ্‌কা। ওর এক্সারসাইজ খাতাখানা ভুলে ফেলে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে হয়তো মনে পড়েছে, তাই। কাল ওর দরকার হবে কিনা।'

মা বললেন, 'জ্বালিয়ে মারলে! কাল সকালে এলে চলত না? কই, খাতাখানা কোথায়?'

এক্সারসাইজ খাতাখানা হাতে নিয়ে, খালি পায়ে স্লিপার গলিয়ে মা দরজা খুলতে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামছেন মা। তাঁর স্লিপারের আওয়াজ পাচ্ছি। তারপর দরজা খোলার শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গেই চাপা গলায় একটা চিৎকার কানে এল। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। এক মুহূর্তে মনে হল, চোরডাকাত নয় তো? টেবিল থেকে একটা বাতিদান তুলে নিলুম। ভাবছি, জানলার শার্সি ভেঙে পাড়াপড়শির সাহায্যের জন্যে চেঁচাব। এমন সময় একতলা থেকে হাসি কিংবা চুমো খাওয়ার শব্দ আর চাপা

গলায় কথার আওয়াজ কানে এল। তারপরই শুনলুম দু-জোড়া পা ঘস্‌টাতে ঘস্‌টাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

দরজা খুলে গেল। হাতে বাতিদান, জামাকাপড় খোলা অবস্থায় বিছানায় আমি তখন আঠার মতো সেঁটে বসে আছি।

দেখি, দোরগোড়ায় চোখভরা জল আর মুখে সুখের হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা। আর তাঁর পাশে মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, সারা গায়ে কাদামাখা আর টুপটুপে ভেজা পোশাক-পরা দুনিয়ায় আমার সব থেকে প্রিয় সৈনিক, আমার বাবা দাঁড়িয়ে।

এক লাফে তাঁর শক্ত হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লুম আমি।

এই গোলমালে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় পার্টিশনের ওধারে আমার বোন তার বিছানায় নড়ে উঠল। ছুটে গিয়ে তাকে জাগাতে চাইলুম আমি, কিন্তু বাবা আমায় থামিয়ে দিলেন। চাপা গলায় বললেন:

'থাক, বরিস... ওকে জাগিও না... আর, বেশি গোলমাল কোরো না এখন।'

মায়ের দিকে ফিরে বললেন:

'ভারিয়া, বাচ্চা জেগে উঠলে ওকে বোলো না আমি ফিরেছি। ও ঘুমোক। আচ্ছা, দিন দুয়েকের জন্যে ওকে কোথায় পাঠানো যায় বল তো?'

'কাল সকালে খুব ভোর-ভোর ওকে ইভানোভ্‌স্কোয়ে পাঠিয়ে দেব'খন,' মা বললেন, 'অনেক দিন ধরেই ও দিদিমার কাছে গিয়ে থাকতে চাইছে। আকাশটা, মনে হচ্ছে, পরিষ্কার হয়েছে। বরিস ভোরবেলায় উঠে প্রথমেই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ফিস্‌ফিস করে কথা বলার দরকার নেই, আলেক্সেই। মেয়েটার ঘুম খুব গাঢ়। অনেক সময় রাত্রে হাসপাতাল থেকে আমাকে ডাকতে লোকজন আসে। ও এতে অভ্যস্ত।'

হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। যা শুনছি তা যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

ভাবছি, 'কী ব্যাপার?.. গোল-চোখো ছোট্ট তানিয়াটাকে বাবা-মা ভোর হতে-না-হতে দিদিমার কাছে চালান করে দিতে চাইছে যাতে ও বাপিকে দেখতে না পায়। বাপি তো ছুটিতে এসেছে। তাহলে? এর মানে কী?'

'তুমি আমার ঘরে শুতে যাও, বরিস,' মা বললেন, 'আর কাল সকালে ছ-টা নাগাদ

তানিয়াকে দিদিমার কাছে নিয়ে যাবে কিন্তু। আর শোনো, ওখানে যেন কাউকে বোলো না যে বাপি বাড়ি এসেছেন।'

বাবার দিকে তাকালুম। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। কী যেন বলতেও গেলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বললেন না। খালি আরও ঘন হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

আমি মা-র বিছানায় শুলুম। বাবা-মা রইলেন খাবার ঘরে, দোর বন্ধ করে। অনেকক্ষণ ঘুম এল না আমার। বারবার এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম। গুনতে চেষ্টা করলুম পঞ্চাশ পর্যন্ত। তারপর এক শো পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

মাথার মধ্যে তখন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেদিন যা যা ঘটেছে যে-মুহূর্তে আমি তা ভাবতে চেষ্টা করলুম অমনি নানান চিন্তা এলোমেলোভাবে মাথার মধ্যে ভিড় করে এলো। এটা-না-ওটা, আর প্রতিটি অনুমানই ছিল অপরটার চেয়ে বেশি অবাস্তব। অনেকক্ষণ ধরে নাগরদোলায় চাপলে মাথার মধ্যে যেমনধারা রগ দুটো টিপটিপ করে আমারও সেইরকম করতে লাগল।

অনেক রাত্তিরে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট মচমচ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলুম, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বাবা ঘরে ঢুকলেন।

আধ-খোলা চোখে দেখলুম শুধু মোজা পায়ে দিয়ে পা-টিপেটিপে ঘরে ঢুকে বাবা তানিয়ার খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মোমবাতিটা নিচু করে ধরলেন।

প্রায় মিনিট তিনেক ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ঘুমন্ত তানিয়ার সোনালী কোঁকড়া চুল আর গোলাপী মুখখানার দিকে তাকিয়ে। তারপর ওর দিকে একটু নিচু হলেন। বোধহয় দুই মনোভাবের লড়াই চলল ওঁর মনে -- এক, মেয়েকে একটু আদর করার ইচ্ছে, আর দুই, ও পাছে জেগে ওঠে এই ভয়। শেষপর্যন্ত অবিশ্যি দ্বিতীয় মনোভাবই জয়ী হল। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে উনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

দরজাটা আবার একবার ক্যাঁচ করে উঠল। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

যখন চোখ খুললুম তখন ঘড়িতে সাতটা বাজছে। জানলার বাইরে বার্চ গাছটার হলুদ পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক ঝলমলে রোদ্দুর এসে পড়েছে ঘরে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলুম। মা-বাবা তখনও ঘুমুচ্ছেন। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আমি বোনকে ডেকে তুললুম।

চোখ মুছতে মুছতে পাশের খালি বিছানাটার দিকে তাকিয়ে তানিয়া বললে, 'মা-মণি কই, বরিস?'

'মা-মণিকে হাসপাতালে ডেকে নিয়ে গেছে। যাবার সময় মা আমায় বলে গেছে তোকে দিদিমার বাড়ি নিয়ে যেতে।'

'আঃ, তুই ভারি মিথ্যুক, বরিস!' আমার দিকে একটা আঙুল নেড়ে হাসল তানিয়া। 'এই তো কালই দিদিমা আমায় তাঁর কাছে থাকতে বললেন, কিন্তু মা-মণি তো আমায় থাকতে দিল না।'

'কাল দেয় নি তো কী হয়েছে, আজ মা কিন্তু অন্যরকম বলে গেছে। যা-যা, তাড়াতাড়ি জামাজুতো পরে নে। দ্যাখ্ না, কী সুন্দর সকাল। দিদিমা ঠিক তোকে বনে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কত অ্যাশ্বেরি ফল কুড়োতে পারবি। কেমন?'

তানিয়া বুঝল আমি ঠাট্টা করছি না। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল ও। আর আমি যখন জামাজুতো পরায় ওকে সাহায্য করছি তখন বকবক শুরু করল:

'মা-মণি মত বদলেছে বুঝি? সত্যি, মা-মণি মত বদলালে এত ভালো লাগে! আমি বলি কি, বরিস, লিজ্‌কা বেড়ালটাকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? আচ্ছা, আচ্ছা, বেড়াল না নিতে চাস তো জুচ্‌কাকে নিই, কী বল! ভারি মিষ্টি কুকুর, না-রে? জানিস, কাল ও না, আমার মুখটা চেটে দিয়েছে। মা-মণি কী বকুনি দিল আমায়। কুকুর মুখ চাটলে মা-মণি না ভী-ষ-ণ রাগ করে। মা-মণি যখন একদিন বাগানে শুয়ে ছিল জুচ্‌কাটা কোত্থেকে এসেই দিল মা-মণির মুখ চেটে। আর মা-মণি ওকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দিল।'

এক লাফে বিছানা থেকে নেমেই তানিয়া ছুটল পাশের ঘরের দিকে।

'এই বরিস, দরজাটা খুলে দে না ভাই। আমার মাথার রুমালটা ওঘরের কোণে পড়ে আছে। আমার প্র্যাম্‌টাও আছে।'

দরজা থেকে ওকে টেনে এনে বিছানায় বসিয়ে দিলুম।

'ও-ঘরে যাওয়া চলবে না, তানিয়া। একজন অচেনা লোক ওঘরে ঘুমোচ্ছেন। কাল রাত্তিরে এসেছেন উনি। আমি তোর মাথার রুমালটা এনে দিচ্ছি, দাঁড়া।'

'কোন্ লোক রে?' ও বলল। 'আগের বার যেমন এসেছিল তেমনি?'

'হ্যাঁ, আগের বারের মতো।'

'কাঠের পা-ওলা?'

'না, লোহার পা-ওলা।'

'ওহ্ বরিস! আমি লোহার পা-ওলা লোক কখনও দেখি নি। দরজায় চাবির ফুটোটা দিয়ে একবার একটুখানি শুধু উঁকি মেরে দেখব। পা টিপে টিপে যাব, কেমন?'

'না, ওসব কিছুটি করা চলবে না। বোস্ দেখি চুপ করে।'

নিঃশব্দে পাশের ঘরে ঢুকে আমি তানিয়ার মাথার রুমালটা নিয়ে ফিরে এলুম।

'কই, প্র্যাম্টা আনলি না?'

'বোকামো করিস না তো! প্র্যাম্ নিয়ে গিয়ে করবি কী শুনি? ইয়েগর মামা সত্যিকার গাড়িতে তোকে ঘুরিয়ে আনবেন, দেখিস।'

তেশা নদীর ধার ঘেঁষে ইভানোভ্স্কোয়েতে যাবার পথ। বোনটা আমার সারাটা পথ নাচতে নাচতে চলল। আর মিনিটে মিনিটে থামতে লাগল, কখনও-বা গাছের ডাল কুড়োতে, আবার কখনও-বা হাঁসেদের জলে হুটোপাটি করা দেখতে। আর পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম আমি। ভোরবেলার টাটকা বাতাস, হেমন্তের হলুদ-সবুজ মাঠের পর মাঠ, চরতে-ব্যস্ত গরুগুলোর গলায়-বাঁধা পেতলের ঘুণ্টির একঘেয়ে টুংটাং আওয়াজ আমার শরীর-মন জুড়িয়ে দিল।

নাছোড়বান্দা যে-চিন্তা, যে-সন্দেহটা আমায় আগের সারা রাত জ্বালিয়েছে সেটা এখন মনের মধ্যে ভালো করে জেঁকে বসল। আর সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও করলুম না।

জানলা দিয়ে ছুটে-আসা মাটির ঢেলাটার কথা মনে পড়ল আমার। ওটা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ে নি নিশ্চয়। বাগানের মাটি থেকে অত বড় একটা মাটির চাঙড় বাতাস কি অত ওপরে তুলতে পারে? ওটা নিশ্চয়ই বাবার কাজ, বাবা ওটা ছুড়েছিলেন আমাদের জানান দিতে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাবা লুকিয়ে ছিলেন বাগানে, ফেদ্কার চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার বোন বাবাকে দেখুক, তাও উনি চান নি। কারণ বাচ্চা মেয়ে তো, ভয় ছিল সব জানাজানি করে দিতে পারে। যে-সব সৈন্য ছুটিতে বাড়ি আসে তারা এভাবে লোকের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখে না।

তবে কি... নাঃ, এ-ব্যাপারে অন্য কোনোরকম ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। আমার বাবা ফৌজ থেকে পালিয়েছেন।

ফেরার পথে ইশকুল ইন্‌স্পেক্টরের একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলুম।

কড়া সুরে উনি বললেন, 'এ কী ব্যাপার, গোরিকভ? এখন ক্লাস চলছে আর তুমি ইশকুলের বাইরে যে?'

উত্তরটা যে কত হাস্যকর শোনাচ্ছে তা হিসেব না করেই যন্ত্রের মতো বললুম, 'আমার অসুখ।'

'অসুখ?' ইন্‌স্পেক্টর সন্দেহ প্রকাশ করলেন। 'কী বলছ তুমি? অসুস্থ হলে লোকে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে না, বিছানায় শুয়ে থাকে।'

একগুঁয়ের মতো তবু বললুম, 'অসুস্থই তো। আমার গায়ে তো টেম্পারেচার রয়েছে।'

উনি ধমকে উঠলেন, 'সকলেরই গায়ে টেম্পারেচার থাকে। বাজে কথা বোকো না। চল, ইশকুলে চল!'

'নাও, এখন ফ্যাসাদে পড়লুম তো!' ইন্‌স্পেক্টরের পিছু পিছু ইশকুলমুখো যেতে-যেতে ভাবলুম, 'কী দরকার ছিল অসুখের কথা বানিয়ে বলার? আসল কারণটা না বলেও ইশকুল কামাই করার আর কোনো লাগসই অজুহাত কি মাথা খাটিয়ে বের করা যেত না?'

ইশকুলের বুড়ো ডাক্তারবাবু একবার খালি আমার কপালে হাতটা ছুঁইয়েই, টেম্পারেচার না নিয়ে রায় দিয়ে দিলেন।

'ইশকুল-পালানোর সাংঘাতিক অসুখে ভুগছে। আমি বিধান দিচ্ছি, অসৎ আচরণের জন্যে খারাপ নম্বর দেয়া হোক আর ইশকুল ছুটির পর আরও দু-ঘণ্টা আটক রাখা হোক।'

ইন্‌স্পেক্টরও পণ্ডিত কম্পাউন্ডারের মতো বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে এই বিধানে সায় দিলেন।

ইশকুলের দারোয়ান সেমিওনকে ডেকে তিনি তার ওপর ভার দিলেন আমায় ক্লাসে পেঁছে দেবার।

সেদিন ছিল আমার কপালে বিপদের ওপর বিপদ।

যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন আমাদের জার্মান ভাষাশিক্ষার শিক্ষিকা এল্‌সা ফ্রান্সিস্‌কোভ্‌না তোরোপিগিনকে প্রশ্ন করছিলেন। হঠাৎ এভাবে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন:

'গোরিকভ, কোমেন্ জী হীর্ (এদিকে এস)। আচ্ছা, 'থাকা' ধাতুর সবকটা কালের ক্রিয়ারূপ বল। যেমন, ইখ্ হাবে (আমার আছে),' উনি নিজেই শুরুটা ধরিয়ে দিলেন।

'ড্যু হাস্ট্ (তোমার আছে),' চিজিকভ চুপিচুপি খেই ধরিয়ে দিল।

এবার নিজেই বললুম, 'য়্যার্ হাট্ (তার আছে)।' তারপর 'ভির্... (আমাদের...)।' আবার হোঁচট। জার্মান ক্রিয়াপদে সেদিন কিছুতেই মন বসছিল না।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন শয়তানি করে বললে, 'হাস্টুস'।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না-ভেবেচিন্তে আমিও পুনরাবৃত্তি করলুম, ‘'হাস্টুস'।

'কী আবোলতাবোল বকছ? মনটা কোন্‌দিকে আছে শুনি? বোকা ছেলেটার কথায় কান না দিয়ে নিজের মাথাটা একটু খাটাও না। কই, তোমার এক্সারসাইজ খাতাটা দাও দেখি।'

'আনতে ভুলে গেছি, এল্‌সা ফ্রান্সিসকোভনা। বাড়ির কাজ করেছি, কিন্তু বইখাতা আনতে ভুলে গেছি। খেলার পিরিয়ডে বাড়ি গিয়ে ঠিক নিয়ে আসব।'

'একসঙ্গে সব বইখাতা আনতে ভোলো কী করে?' শিক্ষিকা চটে উঠে বললেন। 'নিশ্চয় ভোলো নি তুমি। আমাকে ঠকানোর মতলব করেছ। ইশকুল ছুটির পর আজ এক ঘণ্টা আটক থাকবে।'

'এল্‌সা ফ্রান্সিসকোভ্‌না; ইন্‌স্পেক্টর আজ ইশকুল ছুটির পর আমায় দু-ঘণ্টা আটক থাকার শাস্তি দিয়েছেন। আপনিও এক ঘণ্টা আটক থাকতে বলছেন। আমি কি তবে সারা রাত্তির ইশকুলে বসে থাকব?' আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম।

উত্তরে শিক্ষিকাটি আবার এক লম্বা-চওড়া জার্মান বাক্য আওড়ালেন। যার সার কথা — আমি অবিশ্যি যতটুকু বুঝলুম — তা এই যে আল্‌সেমি আর মিথ্যে কথা বলার জন্যে শাস্তি পেতেই হবে আর ভালো করে বুঝলুম যে এই তৃতীয় ঘণ্টা আটক থাকার হাত থেকে রেহাই নেই।

মাঝের বিরতির সময় ফেদ্‌কা কাছে এল।

'তুই বইপত্তর ছাড়াই ইশকুলে এলি যে বড়? সেমিওনই বা তোকে ক্লাসে নিয়ে এল কেন?'

যা হোক একটা কৈফিয়ত বানিয়ে বললুম ওকে। এরপর ছিল সেদিনের শেষ ক্লাস — ভুগোলের। ক্লাসটায় সারাক্ষণ ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে বসে রইলুম। মাস্টারমশাই

যে কী বললেন, ছাত্ররা যে কে কী উত্তর দিল কিছুই মাথায় ঢুকল না আমার। ইশকুলের ছুটির ঘণ্টা বাজতে শুরু করল যখন, কেবল তখনই আমার চমক ভাঙল।

ক্লাসের মনিটর প্রার্থনা-বাক্য আউড়ে গেল। ছেলেরা দমাদ্দম ডেস্কের ঢাকা বন্ধ করে একের পর এক ছুটে বেরিয়ে গেল। ক্লাসরুম গেল ফাঁকা হয়ে। একা বসে রইলুম আমি।

অসহ্য কষ্ট হতে লাগল। 'হা ভগবান! আরও তিন ঘণ্টা.... তিন-তিনটে আস্ত ঘণ্টা, ওদিকে বাবা বাড়িতে, আর সব কী রকম গোলমেলে...'

নিচে নেমে গেলুম। টিচার্স রুমের বাইরে একটা লম্বা সরু বেঞ্চি পাতা, তাতে ছুরি দিয়ে নানারকম আঁকিবুকি কাটা। তিনটে ছেলে আগে থেকেই বসে আছে সেখানে। ওদের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। ক্লাসের অপর এক ছেলের গায়ে কাগজ চিবিয়ে গুলি পাকিয়ে ছুড়ে মারার জন্যে তার এক ঘণ্টা আটক থাকার শাস্তি। দ্বিতীয় জন আটক মারামারি করার দায়ে। আর তৃতীয় জন সিঁড়ির তেতলার চাতাল থেকে নিচের একজন ছাত্রের মাথায় টিপ করে থুথু ফেলার চেষ্টায় শাস্তি ভোগ করছিল।

আমি বেঞ্চিটায় বসে গেলুম, ভাবনার বোঝা মাথায় নিয়ে। দারোয়ান সেমিওন চাবির গোছার ঝনাত্ ঝনাত্ আওয়াজ তুলে চলে গেল।

আটক ছাত্রদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব যে মাস্টারমশাইয়ের, এক সময়ে তিনি বাইরে এলেন। একটা হাই তুলে ফের অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

নিঃশব্দে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে টিচার্স রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালুম। অ্যাঁ? মাত্র আধঘণ্টা কেটেছে এতক্ষণে? অথচ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারতুম অন্তত এক ঘণ্টা ওই বেঞ্চিতে বসে ছিলুম।

হঠাৎই একটা বজ্জাতি বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল:

'দূর হোক গে ছাই। আমি কি চোর? না, জেলে আটক আছি? বাড়িতে আমার বাবা এসেছেন, দু-বছর তাঁর সঙ্গে দেখা নেই, আর এখন আজগবি, রহস্যময় সব ব্যাপারস্যাপারের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে। আর এদিকে আমাকে আবার জেলের কয়েদীর মতো এখানে বসে থাকতে হচ্ছে। কেন? না, ইন্স্পেক্টর আর জার্মানভাষার শিক্ষিকার মাথায় পোকা নড়েছে যে আমায় জব্দ না করলে চলছে না!'

দাঁড়িয়ে উঠলুম। তবু ইতস্তত করতে লাগলুম। যখন কাউকে আটক রাখা হয় তখন অনুমতি না নিয়ে চলে যাওয়ার মতো ঘৃণ্য অপরাধ ইশকুলের ছাত্রদের পক্ষে আর হয় না।

ঠিক করলুম, 'নাঃ, বরং অপেক্ষা করাই ভালো।' ফিরে এসে বেঞ্চিতে আবার বসলুম।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অসহ্য রাগের ভাব আমাকে পেয়ে বসল। 'কিসের পরোয়া? বাবা তো ফ্রন্ট থেকেই দিব্যি পালিয়ে চলে এসেছেন। আর আমি এখান থেকে পালাতে ভয় পাচ্ছি?' তিক্ত হাসি হেসে ভাবলুম।

যে ভাবা সেই কাজ। এক দৌড়ে জামাকাপড়ের ঘরে গিয়ে কোটটা গায়ে চড়িয়ে ফের একছুটে একেবারে রাস্তায়। বেরোবার সময় সজোরে দড়াম করে দরজাটা দিলুম বন্ধ করে।

ওইদিন সন্ধেয় অনেক ব্যাপারে বাবা আমার চোখ খুলে দিতে চেষ্টা করলেন।

'আচ্ছা, বাপি, ফ্রন্ট থেকে পালাবার আগে তুমি তো বেশ সাহসী লোক ছিলে, তাই না?' বললুম আমি। 'তুমি ভয় পেয়েছিলে বলে পালাও নি তো?'

'আমি এখনও ভিতু নই, বাবা,' শান্তভাবে বাবা বললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি আমার চোখ দুটো চলে গেল জানলার দিকে আর আমি চমকে উঠলুম।

দেখলুম, রাস্তার ওপার থেকে একজন পুলিস সোজা আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। লোকটা আস্তে-ধীরে হেলে-দুলে এগুচ্ছে দেখলুম। রাস্তার মাঝামাঝি এসে সে হঠাৎ ডানদিকে ফিরল, তারপর বাজারের দিকে হেঁটে চলে গেল।

'নাঃ, ও... এখানে আসছে না,' দমকে দমকে বললুম আমি, প্রায় প্রতিটি অক্ষরে থেমে থেমে। ভয়ানক হাঁপাচ্ছিলুম।

পরদিন সন্ধেয় বাবা আমাকে বললেন:

'বরিস, বাড়িতে যে-কোনোদিন কেউ-না-কেউ এসে পড়তে পারে। তোমাকে যে খেলনাটা পাঠিয়েছি ওটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রেখো। আর মনে সাহস রেখো! তুমি এখন আর বাচ্চা নও — দ্যাখো, কত বড়টি হয়ে উঠেছ তুমি! আমার জন্যে ইশকুলে যদি কোনো ঝামেলায় পড়, কিছু মনে কোরো না, কেমন? আর, কিছুতে ভয় পেয়ো না যেন। চারপাশে কী ঘটছে ভালো করে নজর রেখো, তাহলেই আমি তোমাকে যা বলেছি তার মানে বুঝতে পারবে।'

‘তোমার সঙ্গে আবার তো দেখা হবে, বাপি, তাই না?’

‘হ্যাঁ। মাঝে মাঝে আসব বই কি, তবে এ-বাড়িতে নয়।’

‘তবে? কোথায়?’

‘সময় হলেই জানতে পারবে।’

ইতিমধ্যেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাড়ার মুচি আমাদের বাড়ির গেটের পাশে তার হারমনিয়ম-বাজনাটা বাজাচ্ছিল বসে। আর ওকে ঘিরে একপাল ছেলেমেয়ে হৈ-হল্লা জুড়ে দিয়েছিল।

‘আমার যাবার সময় হয়েছে,’ বাবা একটু চঞ্চল হয়ে বললেন। ‘পেঁছিতে দেরি না করাই ভালো।’

‘কিন্তু বাপি, ওরা বোধহয় অনেক রাত্তির পর্যন্ত ওখানে থাকবে। আজ শনিবার কিনা, তাই।’

বাবা ভুরু কোঁচকালেন।

‘আচ্ছা জ্বালাতন তো। বেড়া ডিঙিয়ে কিংবা কারো বাগানের মধ্যে দিয়ে অন্য কোনো দিক থেকে বেরোনো যায় না? একটু মাথা খাটাও দেখি, বরিস। তোমার তো এখানকার সব অন্ধিসন্ধি জানা থাকার কথা।’

‘অন্য কোনো দিক দিয়ে বেরোনো সম্ভব না,’ আমি বললুম। ‘বাঁয়ে আগ্‌লোকভদের পাঁচিলটা ভীষণ উঁচু। তার ওপর, পাঁচিলের মাথায় আবার পেরেক পোঁতা। ডানদিকের বাড়ির বাগান দিয়ে অবিশ্যি বেরনো যায়। কিন্তু ও-বাগানে একটা সাংঘাতিক কুকুর আছে। একেবারে নেকড়ে বাঘের মতো। শোনো, আমি বলি কী, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে পুকুরঘাটে নিয়ে যাই, কেমন? ওখানে আমার একখানা নৌকো আছে। আমি তোমায় নৌকো করে সব বাড়ির পেছন দিক দিয়ে সোজা একেবারে নালায় নিয়ে গিয়ে পেঁছে দেব। এখন তো অন্ধকার, জায়গাটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে এতক্ষণে। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।’

বাবার মতো ভারি ওজনের লোক নৌকোয় উঠতেই নৌকোয় জল উঠে পড়ল। আমাদের বুটজুতো গেল ভিজে। না-নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা। কালো জল ভেদ করে নৌকোটা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। আমার হাতের লগি প্রায়ই পুকুরের তলার কাদায় পাঁকে বেধে যেতে লাগল। প্রত্যেক বারই লগি টেনে তুলতে বেশ বেগ পেতে হল।

দু-দুবার পাড়ে নৌকো ভেড়ানোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু খোয়াইয়ের ওই জায়গায় পুকুরের পাড়টা নিচু আর ভিজে থাকায় সুবিধে হল না। তাই আরও খানিকটা ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে পুকুরের একেবারে শেষপ্রান্তের বাগানটায় নৌকো বাঁধলুম।

বাগান ছিল এককালে, এখন পোড়ো জমি। পাহারাও নেই, বেড়াও আগাগোড়া ভাঙা।

সামনেই বেড়ায় যে ফাঁক ছিল সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিলুম বাবাকে। ওই ফাঁক দিয়ে নালা ছাড়িয়ে চলে যাওয়া সম্ভব। ওইখান থেকেই বাবার কাছে বিদায় নিলুম।

আরও মিনিট কয়েক অপেক্ষা করলুম ওখানে। বাবার ভারি পায়ের নিচে ডালপালা ভাঙার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলে পর তবে ফিরলুম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এর তিন দিন পর পুলিশ-থানায় ডাক পড়ল মা-র। তাঁকে জানানো হল যে তাঁর স্বামী ফৌজ থেকে পালিয়েছেন। তাঁকে একটা লেখা বিবৃতিতে সইও করতে হল। বিবৃতিতে লেখা ছিল, মা তাঁর স্বামীর বর্তমান খবরাখবর জানেন না, কিন্তু যদি তিনি কখনও স্বামীর খোঁজ পান তাহলে অবিলম্বে, কোনো রকম ইতস্তত না করে, অবশ্যই সে-খবর কর্তৃপক্ষের কানে তুলবেন।

স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তার ছেলের মারফত পরদিন ইশকুলের সবাই জানতে পারল, আমার বাবা ফৌজ থেকে ফেরার হয়েছেন।

সেদিন বাইবেল-ক্লাসে ফাদার গেন্নাদি মহামান্য সম্রাট ও স্বদেশের প্রতি অনুরক্তি এবং দেশরক্ষার শপথ গ্রহণের পরম পবিত্রতা সম্বন্ধে ছোটখাট একটি নীতিবাচক ধর্মোপদেশ দিলেন। জাপানী যুদ্ধের সময় একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কীভাবে এক হিংস্র বাঘের কবলে প্রাণ দিয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক উদাহরণটি বক্তৃতার মধ্যে জুড়ে দেয়ায় তাঁর নীতিকথার গুরুত্ব বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

ফাদার গেন্নাদির মতে, ওপরের ওই ঘটনা ছিল ঐশ্বরিক দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানেরই ফলস্বরূপ। পলাতকের ওপর তাই কঠিন শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হল। এটা যে অলৌকিক ব্যাপার ছিল তার প্রমাণ, বাঘটি স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী

একসঙ্গে সবটা না-খেয়ে ফেলে সৈন্যটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

এই ধর্মোপদেশ কিছু কিছু ছেলেকে অভিভূত করে ফেলল। ওই দিন মাঝের বিরতির সময় তোরোপিগিন ভয়ভক্তির চোটে গবেষণা করে ফেলল যে সেই বাঘটা আসলে সত্যিকার বাঘ ছিল না, হয়তো স্বয়ং দেবদূত মিখাইলই বাঘের মূর্তি ধরে এসেছিলেন।

সিম্‌কা গোরবুশ্‌কিন কিন্তু এ-কথায় একমত হল না। সে বললে, বাঘটি মিখাইল ছিল কিনা সন্দেহ, কারণ মিখাইলের শাস্তিবিধানের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কখনও দাঁত ব্যবহার করেন না, তরোয়াল দিয়ে কুপিয়ে কিংবা বর্শা দিয়ে বিঁধে মারেন।

বেশির ভাগ ছেলেই এতে একমত হল। এর কারণ, ক্লাসরুমের দেয়ালে টাঙানো পবিত্র ছবিগুলির একটিতে দেবদূতদের সঙ্গে নরকের রক্ষীদের লড়াইয়ের একটি দৃশ্য ছিল। আর তাতে মিখাইলকে বর্শাধারী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। আর সেই বর্শার ফলকে গাঁথা তিনটে ভূতপ্রেতকে ছটফট করতে আর আরও তিনটেকে পা-ওপরে-মাথা-নিচে-করে সোজা তাদের মাটির তলাকার আশ্রয়ের দিকে দৌড় দিতে দেখা যাচ্ছিল।

এর দু-দিন পর আমাকে জানানো হল যে টিচার্স কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ইশকুল পালানোর মতো অন্যায়ের জন্যে আমাকে আচার-আচরণের ঘরে খারাপ নম্বর দেয়া হবে।

সাধারণভাবে এর অর্থ দাঁড়াল এই যে এর পরে আর কোনো অন্যায় করলে আমাকে ইশকুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে।

এরও তিন দিন পর আমার হাতে একটা লিখিত বিজ্ঞপ্তি ধরিয়ে দেয়া হল। তাতে বলা হয়েছিল, আমার মাকে আমার ইশকুলের সেই বছরের প্রথম ছ-মাসের মাইনের পুরো রুবল অবিলম্বে জমা দিতে হবে। বাবা সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে এর আগে পর্যন্ত আমাকে পুরো মাইনের অর্ধেক দিতে হত।

আমার জীবনে সে-ই শুরু হল কঠিন সময়। আমার নাম দেয়া হল ‘ফেরারীর ছেলে’। কী লজ্জা! যে-সব ছাত্রের সঙ্গে আগে আমার বন্ধুত্ব ছিল, একে একে দূরে

সরে গেল তারা। অন্যেরা, যারা তখনও আমার সঙ্গে মিশত, তারাও কেমন অদ্ভুত আচরণ শুরু করল, যেন আমার একটা ঠ্যাঙ্ কাটা পড়েছে, কিংবা আমার পরিবারে কেউ সদ্য মারা গেছে। ক্রমে ক্রমে সকলের কাছ থেকে সরে এলুম আমি, খেলাধুলোয় যোগ দেয়াও ছেড়ে দিলুম, বন্ধ করলুম দলের সঙ্গে ভিড়ে অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করা আর ক্লাসের ছেলেদের বাড়ি যাওয়া।

হেমন্তের লম্বা লম্বা বিকেল আর সন্ধেগুলো হয় বাড়িতে, নয়তো তিম্‌কা শ্‌তুকিন আর তার পাখিদের সঙ্গে কাটাতে লাগলুম।

ওই সময়টায় তিম্‌কার সঙ্গে ভারি ভাব জমে উঠল। ওর বাবাও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তবে মাঝে মাঝে কেন যে তিনি আড় চোখে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন, তারপর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে একটাও কথা না-বলে ঝমঝম করে চাবি বাজিয়ে চলে যেতেন, তা কিছুতেই বুঝতে পারতুম না।

শহরেও সে-সময়ে অদ্ভুত সব পরিবর্তন ঘটছিল। লোকসংখ্যা দেখতে দেখতে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। দোকানগুলোর সামনে ক্রেতার লাইন পাড়া ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে উঠতে লাগল। সর্বত্রই লোকে গোল হয়ে ভিড় জমিয়ে দাঁড়াত, প্রতিটি রাস্তার মোড়ে জমত জটলা। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অবতারদের প্রতিমূর্তি কাঁধে বয়ে একটার পর একটা ধর্মীয় শোভাযাত্রার আনাগোনা শুরু হল। হঠাৎ-হঠাৎ নানারকম আজগবি সব গুজব রটতে লাগল। কখনও বা শোনা গেল, প্রাচীন খ্রীস্টধর্মপ্রবক্তারা সেরেঝা-নদীর ওপর-মুখে যে-সব হ্রদ আছে তাদের পারের বনে চলে যাচ্ছেন। আবার কখনও শোনা গেল, নদীর ভাঁটায় যে-সব বেদে বাস করে তারা নাকি জাল, অচল রুব্‌ল চালাচ্ছে, আর ওই সব জাল রুব্‌লে বাজার ছেয়ে যাওয়ায় নাকি জিনিসপত্র এত আক্রা হয়ে উঠেছে। আবার একদিন এক রীতিমতো ভয়ের খবর রটল যে তার সামনের শুক্রবার রাত্রে ইহুদি ঠ্যাঙানো হবে, কারণ ওদের গুপ্তচরগিরি আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই নাকি লড়াই শেষ হতে চাইছে না।

হঠাৎ দেখা গেল, শহরটা ভবঘুরেতে ভরে গেছে। কোথা থেকে যে এল ওরা, ঈশ্বর জানেন। কেবল শোনা যেতে লাগল, এখানে কে বা কারা যেন একটা তালা ভেঙেছে, ওখানে একটা ফ্ল্যাটে সিঁদ কেটে চুরি হয়ে গেছে, এই সব। শহরে ছোট

একটা কসাক-বাহিনী মোতায়েন হয়ে গেল। গোমড়া-মুখো, কপালের ওপর চুল-দোলানো কসাকরা ঘন হয়ে সার বেঁধে বিকট চিৎকার আর হুপ্‌হুপ শব্দ করতে করতে যখন একবার রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল, সহ্য করতে না-পেরে মা তখন জানলার কাছ থেকে সরে এসে বলেছিলেন:

'বহুদিন ওগুলোর দেখা পাই নি... সেই উনিশ শো পাঁচ সালের পর থেকে। আবার নেত্য শুরু করেছে এখন।'

বাবার কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার মনে মনে একটা সন্দেহ ছিল যে বাবা বোধহয় নির্জনি নভগরোদের কাছে সর্‌মোভোতে আছেন। অবিশ্যি এটা নেহাতই একটা অনুমান ছিল মাত্র। চলে যাবার আগে বাবা মাকে তাঁর ভাই নিকোলাই সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আর নিকোলাই-মামা সর্‌মোভোর একটা গাড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। এই সব থেকেই আমার ওই ধারণার উৎপত্তি।

এক দিন — তখন শীত পড়ে গেছে — তিম্‌কা শ্‌তুকিন ইশকুলে আমার কাছে এসে একটু আড়ালে যেতে বলল। ওর রহস্যজনক হাবভাবে আমার যত না কৌতূহল হল তার চেয়ে অবাকই হয়েছিলুম বেশি। নেহাতই উদাসভাবে ওর পিছু পিছু ফাঁকা দেখে একটা কোণে গিয়ে হাজির হলুম।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তিম্‌কা ফিসফিস করে বললে:

'আজ সন্ধেয় আমাদের ওখানে আসিস। বাপি বলে দিয়েছে আসতে। ভুলিস না যেন।'

'তোর বাবার আমাকে কী দরকার? এবার কী মতলব এঁটেছিস বল দেখি?'

'কিছুই মতলব আঁটি নি। আসবি কিন্তু, ভুলবি না।'

তিম্‌কাকে গম্ভীর ঠেকল, কিছুটা যেন উৎকণ্ঠাও রয়েছে মনে হল। বুঝলুম, ও তামাশা করছে না।

সেদিন সন্ধেয় কবরখানায় গেলুম। তখন তুষার-ঝড় বইছে। তুষারে-মোড়া টিম্‌টিমে বাতিগুলোয় রাস্তায় আলো হয়েছে কিনা সন্দেহ। বনে আর কবরখানায় যেতে গিয়ে একটা ছোট মাঠ পার হতে হল। ধারালো তুষারফলক মুখে কেটে বসতে লাগল। মাথাটা কোটের কলারের মধ্যে ডুবিয়ে তুষারের জাজিম-পাতা পথ

ধরে জোরে-জোরে কবরখানার গেটের সবুজ বাতিটা লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলুম। হঠাৎ একটা কবরের পাথরে পা বেধে বরফের ওপর আছাড় খেলুম। চৌকিদারের বাসার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিলুম, সাড়াশব্দ নেই। আবার ধাক্কা দিলুম। তারপর দরজার ওধারে পায়ের শব্দ পেলুম।

'কে?' চৌকিদারের পরিচিত হেঁড়ে গলা শোনা গেল।

'আমি, ফিয়োদর-কাকা।'

'বরিস, তুমি?'

'হ্যাঁ। শিগ্গির দোর খুলুন।'

আগুনে উত্তপ্ত হয়ে-থাকা বাসার মধ্যে ঢুকলুম। টেবিলের ওপর সামোভার দাঁড় করানো। একটা প্লেটে খানিকটা মধু আর পাঁউরুটি। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে তিম্কা বসে-বসে একটা খাঁচা সারাচ্ছিল।

আমার লাল-হয়ে-ওঠা জলে-ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কি, তুষার-ঝড়?'

'নয় তো কী,' আমি জবাব দিলুম। 'উহ্, পায়ে যা লেগেছে। বাইরে একেবারে কালি-ঢালা অন্ধকার।'

তিম্কা হাসল। কেন হাসল ও, বুঝলুম না। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এবার আরও জোরে হেসে উঠল তিম্কা। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলুম আমাকে দেখে নয়, আমার পেছনে অন্য কিছু দেখে হাসছে ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, পেছনে ফিয়োদর-কাকা আর আমার বাবা দাঁড়িয়ে।

সবাই মিলে যখন চা খেতে বসলুম তখন তিম্কা বলল, 'উনি তো আজ দু-দিন আমাদের সঙ্গে আছেন'।

'দু-দি — ন... আর তুই আমাকে এর আগে বলিস নি! এরপরও বলবি তুই আমার বন্ধু?'

অপরাধী-অপরাধী ভাব করে তিম্কা প্রথমে ওর বাবার দিকে তারপর আমার বাবার দিকে চাইল। যেন ওঁদের কাছে ওর কাজের সমর্থন খুঁজছে।

ভারি ভারি হাত দিয়ে ছেলের পিঠ চাপড়ে চৌকিদার বললেন, 'একেবারে যেন পাথর। দেখতে তেমন কেউ-কেটা না-হলে কী হবে, বেশ নির্ভর করার মতো খুদে মানুষ।'

বাবা পরে ছিলেন বেসামরিক পোশাক। তাঁকে বেশ খুশি-খুশি আর প্রাণবন্ত লাগছিল। আমাকে তিনি ইশকুলের ব্যাপার-স্যাপার জিজ্ঞেস করছিলেন আর হাসছিলেন কথায়-কথায়। বারবার বলছিলেন খালি:

'কিছু না... কিছু না... কিছু এসে-যায় না। চিন্তা কোরো না। দেখবে অখন কী দিন আসছে। কী? কিছু বুঝতে পারছ না?'

আমি বললুম আমার মনে হচ্ছে এরপর আরেক বার বকুনি খাওয়ার কারণ ঘটলেই আমাকে ইশকুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।

'তাতে চিন্তার কী আছে!' ধীরভাবে বললেন বাবা। 'যতক্ষণ তোমার শেখার ইচ্ছে আছে আর মাথাটা পরিষ্কার থাকছে ততক্ষণ ইশকুলে যাও আর না-যাও তুমি বোকা হয়ে থাকবে না।'

বললুম, 'বাপি, আজ তুমি এত খুশি কেন গো, সব সময়েই হাসছ? আমাদের ইশকুলের পাদ্রিসাহেব কিন্তু তোমাকে নিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছেন আর সবাই তোমার সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলছে যেন তুমি মরেই গেছ। আর এদিকে তুমি খুশিতে ডগমগ। ব্যাপার কী গো!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকচক্রে যখন থেকে আমি বাবার সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলতুম — বয়সে বড় অথচ সমকক্ষ লোকের সঙ্গে যেভাবে লোকে কথা কয়, সেইভাবে। আমি বুঝতে পারতুম, বাবা এই ভঙ্গিটা পছন্দ করছিলেন।

'আমার ফুর্তি লাগছে এইজন্যে যে রোমাঞ্চকর সময় শুরু হতে চলেছে। যথেষ্ট চোখের জল ফেলেছি আমরা! আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন একছুটে বাড়ি চলে যাও দেখি। আবার শিগ্গিরই আমাদের দেখা হবে, কেমন?' বাবা বললেন।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বিদায় জানিয়ে কোটটা গায়ে দিয়ে দৌড়ে বাইরের বারান্দায় এলুম। কিন্তু চৌকিদার এগিয়ে এসে আমার পেছনে দরজাটা বন্ধ করার আগেই আমার মনে হল কে যেন আমায় একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। এত জোরে ছুড়ে দিল যে উড়ে গিয়ে মাথা গুঁজে একরাশ হালকা তুষারস্তূপে পড়লুম। ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেলুম দোরগোড়ায় অনেকগুলো পায়ের দাপাদাপি, হুইস্‌লের আওয়াজ আর লোকের চিৎকার। চট করে উঠে ফিরে এসে দেখলুম পুলিশম্যান

এভ্‌গ্রাফ তিমোফেইচ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওর ছেলে পাশ্‌কা একসময় আমার সঙ্গে একই প্রাথমিক ইশকুলে পড়েছিল।

'দাঁড়াও!' আমায় চিনতে পেরে হাত ধরে দাঁড় করাল ও। 'তুমি ছাড়াই ওদের চলবে। লাও, আমার পশমের স্কার্ফের এই কোনাটা দিয়ে মুখখান ভালো করে মুছে ফ্যালো দেখি। ভগবান না করুন, মাথায় লাগে নি তো? নাকি, লেগেছে?'

'না, লাগে নি,' ফিস্‌ফিস করে বললুম। 'ব্যপির খবর কী?'

'তার খবরে কাজ কী? কেউ তারে আইনের বিরুদ্ধে লাগতে কয়েছিল? আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না, বুইলে বাপু।'

বাবাকে আর চৌকিদারকে পিছমোড়া করে হাত-বাঁধা অবস্থায় বাসার বাইরে আনা হল। ওঁদের পিছু পিছু যেতে লাগল তিম্‌কা। কোটটা কাঁধের ওপর ফেলা, মাথায় টুপি নেই। ও কাঁদছিল না, কেবল অদ্ভুতভাবে শিউরে-শিউরে উঠছিল।

চৌকিদার গম্ভীরভাবে বললেন, 'রাত্তিরটা তোর ধর্মবাপের ওখানে কাটাস তিম্‌কা। ওকে বলিস, আমাদের বাসাটার একটু দেখাশোনা করতে। তল্লাসির পর কোনো কিছু খোয়া যায় না যেন।'

বাবা হেঁটে চলছিলেন নিঃশব্দে, মাথা নিচু করে। আমাকে দেখে খাড়া হয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন:

'কুছ পরোয়া নেই, খোকন। বিদায়। তোমার মাকে আর তানিয়াকে আমার হয়ে চুমো দিও। চিন্তার কিছু নেই। রোমাঞ্চকর সময় শুরু হতে যাচ্ছে, বাপধন!'

রোমন্থনের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯১৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ সেনা-বাহিনীর সামরিক আদালত দ্বাদশ সাইবেরিয়ান রাইফেল রেজিমেণ্টের নিম্নপদস্থ সৈনিক আলেক্সেই গোরিকভকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালানো ও অন্তর্ঘাতমূলক প্রচারকার্যের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে গুলি করে মারার হুকুম দিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হল আর তার মাত্র কয়েকদিন পর, ২রা মার্চ, পেত্রোগ্রাদ থেকে এই মর্মে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল যে বিদ্রোহী জনসাধারণ জার স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে দিয়েছে।

বিপ্লবের প্রথম স্পষ্ট দৃশ্য যা আমার নজরে পড়েছিল তা হল, পোলুতিনদের জ্বলন্ত জমিদার-বাড়ির আগুনের আভা। ঢালু ছাদের জানলাটা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত দেখেছিলুম সেদিন, লকলকে জিভ বের করে আগুন সদ্য-বসন্তের হাওয়া নিয়ে খেলছে। পকেটে-রাখা পিস্তলটার মসৃণ উষ্ণ হাতলটায় অনেকক্ষণ আলতোভাবে হাত বুলিয়েছিলুম সেদিন, মনে পড়ে পিস্তলটা ছিল বাবার কাছ-থেকে-পাওয়া আমার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন। যে 'রোমাঞ্চকর সময়' আসছিল তার কথা মনে ভেবে চোখের জল ফেলতে-ফেলতেও হাসলুম আমি। বাবার মৃত্যুর ফলে আমার গুরুতর ক্ষতির জন্যে যে-চোখের জল ঝরতে শুরু করেছিল তা তখনও শুকোয় নি।

ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের গোড়ার দিনগুলোয় আমাদের ইশকুলটার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল উইয়ের ঢিপিতে জ্বলন্ত আঙরা গুঁজে দিলে যেমন হয় তেমনি। যুদ্ধে জয়কামনা করে প্রার্থনা শেষ করার পর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী কিছু ছেলে সেদিনও গান ধরে দিয়েছিল 'ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন', কিন্তু অন্যেরা 'নিপাত যাক' চিৎকার করে সজোরে শিস আর হুপহুপ আওয়াজ দিয়ে তাদের থামিয়ে দিল। এরপরই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, ছাত্ররা লাইন ভেঙে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, জারিনার ছবির দিকে কে-একজন ছুড়ে মারল একটা বান্-রুটি, আর বেপরোয়া হল্লা করার এমন একটা সুযোগ পাওয়ায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা প্রাণের আনন্দে বেড়াল আর ভেড়ার ডাক শুরু করে দিল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ইন্স্পেক্টর কত বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই বীভৎস চিৎকারে তাঁর গলাই চাপা পড়ে গেল। যতক্ষণ-না দারোয়ান সেমিওন দেয়াল থেকে রাজপরিবারের ছবিগুলো নামিয়ে নিল, ততক্ষণ চিৎকার আর বেড়ালের ডাক থামল

না। পাগলের মতো চেঁচাতে-চেঁচাতে আর পা দাপাতে-দাপাতে উত্তেজিত ছেলেগুলো ছুটোছুটি করে নিজের নিজের ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। কোত্থেকে লাল ফিতে যোগাড় হয়ে গেল অনেকের। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দেখিয়ে-দেখিয়ে তাদের উঁচু বুটের মধ্যে ট্রাউজার্সের তলাটা গুঁজে নিল (আগে ইশকুলে এটা নিষিদ্ধ ছিল), আর পেচ্ছাপখানার বাইরে জড়ো হয়ে ক্লাসের মাস্টারমশাইদের চোখের সামনেই দেখিয়ে-দেখিয়ে সিগারেট টানতে শুরু করল। আমাদের ড্রিলের টিচার সামরিক অফিসার বালাগুশিন ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই তাঁর দিকেও ওরা সিগারেট বাড়িয়ে দিল আর তিনি বেমালুম সেটা নিলেন। ইশকুল কর্তৃপক্ষ আর ছাত্রদের মধ্যে অভূতপূর্ব মিলনের এই দৃশ্য দেখে জোর একটা জয়ধ্বনি উঠল।

এই সমস্ত কান্ডকারখানা থেকে ওই সময়ে ছাত্ররা যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারল তা এই যে জারকে গদিচ্যুত করা হয়েছে আর বিপ্লব শুরু হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই, বিশেষ করে নিচের ক্লাসের ছেলেরা, বুঝতে পারল না বিপ্লব হলে আনন্দ করার কী আছে, আর যে-জারের ছবির সামনে ক-দিন আগেও ইশকুলের গায়কদল একান্ত আগ্রহে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিল তাঁকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়েই-বা লাভটা কী হল।

প্রথম কয়েক দিন বলতে গেলে কোনো ক্লাসই হল না। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা যোগ দিল স্থানীয় রক্ষীবাহিনীতে। রাইফেল কাঁধে নিয়ে হাতে লাল কাপড়ের পাট্টি বেঁধে তারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিয়ে গর্বের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবিশ্যি এমনিতেই শান্তি-শৃঙ্খলা ভাঙার কথা কারো মাথায় আসে নি। শহরের তিরিশটা গির্জের ঘণ্টাই খ্রীস্টের শেষ ভোজন-সংক্রান্ত বাজনাটা বাজাতে লাগল। পাদ্রিরা সব উজ্জ্বলরঙের আঙরাখা পরে যজমানদের অস্থায়ী সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাতে লাগলেন।

রাস্তাঘাটে লাল রঙের শার্ট-পরা লোক দেখা যেতে লাগল। পাদ্রি ইয়োনার ছেলে উচ্চশিক্ষার্থী আর্থান্‌গেল্‌স্কি, গাঁয়ের ইশকুলের দুজন শিক্ষক আর আমার অচেনা আরও তিন জন লোক নিজেদের সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি, বা সংক্ষেপে 'এস-আর' বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগল। কালো কুর্তা-পরা লোকও দেখা গেল, এরা বেশির ভাগই ছিল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ঈশ্বরতত্ত্ব-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র। নিজেদের এরা পরিচয় দিচ্ছিল নৈরাজ্যবাদী বলে।

শহরের বেশির ভাগ লোকই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'এস-আর'-দের দলে যোগ দিল। এ-ব্যাপারে রেভারেন্ড পাভেলের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। কারণ, বড় গির্জেয় অস্থায়ী সরকারের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ করার জন্যে আয়োজিত প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যিশু খ্রীস্ট স্বয়ং ছিলেন সমাজতন্ত্রী আর বিপ্লবী। আর আমাদের শহরের বাসিন্দারা, যারা বেশির ভাগই ছিল মহাজন-ব্যবসাদার, কারিগর, সন্ন্যাসী আর তীর্থযাত্রী, অর্থাৎ ধর্মভীরু লোক, যিশু খ্রীস্টের চরিত্রের এই নতুন দিকের সন্ধান পেয়ে তারা 'এস-আর'-দের দিকে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল। বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধে 'এস-আর'-দের তেমন কিছু বক্তব্য না থাকায়, আর তারা প্রধানত স্বাধীনতার কথা আর দ্বিগুণ শক্তিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলায় তাদের প্রতি অনেকের সহানুভূতি উথলে উঠল। নৈরাজ্যবাদীরা যুদ্ধ সম্বন্ধে একই কথা বললেও ঈশ্বরকে গালমন্দ করত। যেমন, ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার্থী ভেলিকানভ বক্তৃতামঞ্চ থেকে সোজাসুজি ঘোষণা করে বসল যে ঈশ্বর নেই। আর যদিই-বা ঈশ্বর থেকে থাকেন তাহলে তিনি তার, অর্থাৎ ভেলিকানভের, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সকলের সামনে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিন। এই বলে ভেলিকানভ মাথাটা পেছনে হেলিয়ে সোজা আকাশের দিকে থুথু ছুড়ল। উপস্থিত জনতা হতবুদ্ধি হয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল এই বুঝি আকাশ চৌচির হয়ে মহাপাতকীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। কিন্তু সে-সব কিছুই হল না, আকাশও চৌচির হল না দেখে ভিড়ের মধ্যে থেকে লোকে বলতে লাগল ঐশ্বরিক শাস্তিবিধানের জন্যে অপেক্ষা না করে পাপের প্রকাশ্য শোধন হিসেবে নৈরাজ্যবাদীটার পেছনে একটি লাথি কষানো উচিত। এ-ধরনের কথাবার্তা কানে যেতে ভেলিকানভ অবিশ্যি সুবুদ্ধির মতো সুড়সুড় করে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তবে পালাতে গিয়ে তাকে হিংসুটে বুড়ি মারেমিয়ানা সের্গেইয়েভনার হাতে ছোটখাট একটা ঘুষি খেতে হল। এ ছিল গিয়ে সেই বুড়ি যে ঈশ্বরের মাতার সারোভো-প্রতিমূর্তির বাতিগুলো থেকে রোগ-প্রতিষেধক তেল, আর সারোভোর সেরাফিম পরমহংস নিজের হাতে বুনো ভল্লুক আর নেকড়েদের যে শুকনো রুটির টুকরো খাওয়াতেন তা-ই বিক্রি করত।

যাই হোক, মোটের ওপর আর্জামাসে বিপ্লবীর সংখ্যা অগুনতি দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। বলতে কি, সকলেই তখন বিপ্লবী বনে গেছে। এমনকি আগে যে লোকটা ছিল সরকারী গ্রাম-অধীক্ষক সেই জাখারভও কোটের ওপর মস্ত বড় একটা

লাল রেশমী ফিতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পেত্রোগ্রাদ আর মস্কোয় তখন লড়াই চলছিল, বাড়ির ছাদ থেকে পুলিশ গুলি চালাচ্ছিল সেখানে। কিন্তু আমাদের শহরে পুলিশ স্বেচ্ছায় অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে, সাধারণ নাগরিকের মতো পোশাক পরে ভালোমানুষের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একদিন এক জনসভায় ভিড়ের মধ্যে আবিষ্কার করলুম পুলিশম্যান এভ্‌গ্রাফ তিমোফেয়েভিচকে। বাবাকে গ্রেপ্তার করার সময় সেই যে উপস্থিত ছিল।

এভ্‌গ্রাফের হাতে ছিল একটা টুকরি। তা থেকে এক বোতল ভেজিটেব্‌ল তেল আর একটা বাঁধাকপি উঁকি দিচ্ছিল। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোশ্যালিস্টদের বক্তৃতা শুনছিল। আমাকে দেখে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে তারপর নিচু হয়ে বিনীতভাবে নমস্কার করলে।

বললে, 'কেমন চলছে? তুমিও শুনতে এসেছ বুঝি? বেশ, বেশ, শোনো... তোমাদের বয়েস অল্প এ-সব ভালো লাগবে বই কি। আমাদের বুড়োদেরই ভালো লাগে তা আর... দেখলে তো, কোথা থেকে কী হয়ে গেল!'

'বাবাকে গ্রেপ্তার করতে আপনিও এসেছিলেন, মনে পড়ে এভ্‌গ্রাফ তিমোফেয়েভিচ?' আমি বললুম। 'আপনি তখন আইন দেখিয়েছিলেন, আইনের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না, এই-সব। তা, এখন আপনার সেই আইন কোথায় গেল? আপনার সেই আইনের এখন দফারফা হয়ে গেছে। আপনাদের, পুলিশদের, সকলের বিচারও হবে, বুঝলেন?'

শুনে ভালো মানুষের মতো হাসতে লাগল এভ্‌গ্রাফ তিমোফেয়েভিচ। সঙ্গে সঙ্গে বোতলের কানায়-কানায় ভরা তেলটাও দুলতে লাগল।

'আগেও আইন ছিল, এখনও আইন থাকবে। আইন ছাড়া চলা যায় না, বুইলে ছোকরা। আর, কি কইলে, আমাদের বিচার? তা হোক না বিচার। ফাঁসি যাব না তো আর। আমাদের বড়কর্ত্তাদেরও ফাঁসি হচ্ছে না। স্বয়ং জারকেই ওরা বাড়িতে অন্তরীণ করে রেখেছে, তা আমাদের আর কী হবে! শোনো হে, বক্তা কী বলচে। বলচে, শোধ-নেয়ানেয়ি থাকবে না, সব লোক হবে ভাই-ভাই। আর এমন মুক্ত রুশিয়ায় না-থাকবে জেল, না-থাকবে ফাঁসি। তার মানে, আমাদেরও জেল হবে না, ফাঁসিও হবে না।'

বলে ধীরে-সুস্থে চলে গেল লোকটা।

ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ভাবলুম: 'এ কী করে হতে পারে? এর মানে ও কি বলতে চায় যে আজ বাবা যদি জেলে থাকতেন আর জেল থেকে খালাস পেতেন তাহলে তিনি তাঁর জেলের কত্তাকে ধীরে-সুস্থে ঘুরে বেড়াতে দিতেন, তার একগাছা চুলও ছুঁতেন না? আর তা এই কারণে যে সব মানুষকে ভাই-ভাই ভাবতে হবে?'

ফেদ্‌কাকেও জিজ্ঞেস করলুম কথাটা।

ও বলল, 'এর সঙ্গে তোর বাবার সম্বন্ধ কী। তোর বাবা ছিলেন ফৌজ থেকে ফেরারী। তাঁর নামে একটা কলঙ্কের দাগ পড়ে গেছে। পলাতকদের এখনও তাড়া করে ধরা হচ্ছে। পলাতক তো আর বিপ্লবী নয়। দেশের জন্যে লড়তে চায় না বলে সে সরে পড়েছে, এই মাত্র।'

ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বললুম, 'আমার বাবা মোটেই ভীরু ছিলেন না। তুই অমন মেজাজে কথা বলছিস কেন? তাছাড়া আমার বাবাকে গুলি করা হয়েছিল শুধু ফৌজ থেকে পালানোর জন্যে নয়, বিপ্লবী প্রচারের জন্যেও। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার একটা নকল আমাদের বাড়িতে আছে, জানিস তো।'

ফেদ্‌কা যেন নিভে গেল। মিটমাট করে নেয়ার সুরে বললে:

'তুই কি ভাবলি আমি এটা নিজের কথা বলছি? সব কটা খবরের কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে না? 'রুস্‌কোয়ে স্লোভো'তে কেরেন্‌স্কির বক্তৃতাটা পড়ে দ্যাখ্। চমৎকার বলেছেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে একটা সভায় ওটা যখন পড়ে শোনানো হল তখন হলের অর্ধেক লোক কাঁদতে শুরু করল। ওতে যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে। কীভাবে যুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, পলাতকরা-যে সেনাবাহিনীর কলঙ্ক, এই সব কথা। আরও বলা হয়েছে, 'জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সমাধির উপর মুক্ত রাশিয়া অক্ষয় মহিমার এক কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করবে'। বুঝলি, 'অক্ষয় মহিমা!' আর তবু তুই কিনা তর্ক করিস!'

এদিকে বক্তারা একের পর এক মঞ্চ দখল করে বলে চলেছেন। ধরা গলায়, বসে-যাওয়া গলায় বলে চলেছেন সমাজতন্ত্রের কথা। তাঁদের পার্টিতে যারা নাম লেখাতে চায় আর স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চায় তাঁরা ওইখানেই তাদের নাম

লিখে নিতে লাগলেন। এমনও অনেক বক্তা দেখা গেল যারা মঞ্চে উঠে আর নামতে চায় না। যতক্ষণ-না তাদের টেনে নামানো হল তারা বলে চলল। তাদের জায়গায় আবার মঞ্চে উঠল নতুন বক্তা।

কত-যে বক্তৃতা শুনলুম তার ইয়ত্তা নেই। শুনতে-শুনতে মনে হল মাথাটা যেন ফুলনো বেলুনের মতো কথায় টইটম্বুর, ফাটো-ফাটো হয়ে উঠেছে। নানা লোকের নানা কথা মাথার মধ্যে মিলেমিশে খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। ফলে, একজন এস-আর আর একজন কাদেত, কাদেত আর নারোদবাদী, একজন দ্বন্দোভিক আর একজন নৈরাজ্যবাদীর মধ্যে তফাত যে কোন দিক থেকে কী করে করব তা বুঝে উঠতে পারলুম না। সব কটা বক্তৃতা ছেঁকে মাত্র একটি কথাই আমার মধ্যে রয়ে গেল:

'মুক্তি... মুক্তি... মুক্তি...'

'গোরিকভ,' পেছন থেকে কে যেন ডাকল আমায়। তারপরই আমার কাঁধে অনুভব করলুম কার যেন হাত।

দেখি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, আর কেউ নয়, আমাদের সেই হস্তশিল্প-শিক্ষক 'দাঁড়কাক'।

দারুণ খুশি হয়ে উঠলুম আমি। বললুম, 'আপনি? আপনি এখানে কবে, কী করে?'

'নিজনি নভগরোদ থেকে আসছি। জেল থেকে। চল, খোকা, আমার বাসায় চল। কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি আমি। এস, চা খাওয়া যাবে, শাদা পাঁউরুটি আর মধুও খাব আমরা। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হয়েছি। মাত্র গতকাল এখানে এসেছি। আজই তোমাদের বাড়ি যাব ভাবছিলুম।'

আমার হাত ধরলেন উনি। গোলমাল আর ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে চললুম।

পাশের চত্বরে, আরেকটা ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। সেখানে আগুন জ্বালিয়ে কিছু পোড়ানো হচ্ছিল। কৌতূহলী লোকে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এখানে-ওখানে।

'এখানে আবার কী হচ্ছে?'

'কী আবার? ভাঁড়ামি,' দাঁড়কাক হেসে বললেন। 'নৈরাজ্যবাদীরা জার-রাজত্বের পতাকা পোড়াচ্ছে। কাপড়গুলো না পুড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে লোকের মধ্যে বিলি

করলে কাজে দিত। চাষীরা কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। বাপরে, আজকের দিনে একেক টুকরো কাপড়ের দাম কি কম?'

দাঁড়কাকের হাত দু-খানা লম্বা আর লিকলিকে। চা তৈরি করতে করতে অনবরত হুড়হুড় করে কথা বলতে থাকলেন উনি। আর মাঝে মাঝে হাসতে লাগলেন।

'তোমার বাবা বড্ড তাড়াতাড়ি মারা গেলেন। সামরিক আদালতে বিচারের জন্যে ওঁকে নিয়ে যাবার আগে উনি আর আমি একই কামরায় কয়েদ ছিলুম।'

চা খেতে-খেতে আমি বললুম, 'সেমিওন ইভানোভিচ, আপনি বলছেন আপনি আর বাপি একই পার্টির কমরেড ছিলেন। কিন্তু বাপি কি পার্টিতে ছিল না কি? কই, আমায় তো বাপি এ-সম্বন্ধে কখনও কিছু বলে নি।'

'তিনি বলেন নি, কারণ তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না।'

'আপনিও তো আগে একথা বলেন নি। আপনাকে যখন পুলিস গ্রেপ্তার করল পেত্‌কা জোলোতুখিন তখন বলেছিল আপনি নাকি গুপ্তচর ছিলেন।'

দাঁড়কাক হাসলেন।

'গুপ্তচর? হা-হা-হা! পেত্‌কা জোলোতুখিন বলেছে? হা-হা! নাঃ, পেত্‌কা জোলোতুখিন বলেই কথাটা ক্ষমা করা যায়। ছেলেটা নেহাতই হাঁদারাম। কিন্তু এখন যখন ধাড়ি ধাড়ি হাঁদারা আমাদের গুপ্তচর বলে গুজব ছড়াচ্ছে তখন আরও বেশি মজা পাচ্ছি, বুঝলে ইয়ার।'

'ওরা কাদের সম্বন্ধে গুজব রটাচ্ছে, সেমিওন ইভানোভিচ?'

'আমাদের সম্বন্ধে। বলশেভিকদের সম্বন্ধে।'

কথাটা শুনে আমি ওঁর দিকে বাঁকা চোখে তাকালুম।

'আপনারা তাহলে বলশেভিক — মানে, বাবাও বলশেভিক ছিল?'

'হ্যাঁ, তা ছিলেন।'

এক মুহূর্ত কী ভেবে দুঃখিতভাবে বললুম:

'আচ্ছা, বাবার বেলায় সব গোলমাল হয়ে গেল কেন? অন্যদের মতো তো হল না?'

'তার মানে?'

'মানে, অন্যেরা যখন সৈনিক হয় তখন সৈনিকই হয়। আবার যখন বিপ্লবী হয় তখন খাঁটি বিপ্লবীই হয়। তখন তাদের সম্বন্ধে কেউ কোনো মন্দ কথা বলতে পারে

না। সকলেই তাদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমার বাবা — তিনি যে কী, ঠিক বুঝলুম না। কখনও শুনি তিনি পলাতক, আবার কখনও শুনি তিনি নাকি বলশেভিক। আচ্ছা, বাবা বলশেভিক কেন, খাঁটি বিপ্লবী — এই ধরুন 'এস-আর' কিংবা নৈরাজ্যবাদীদের মতো — নয় কেন? যেন, বাবা আমায় জব্দ করার জন্যে ইচ্ছে করেই গিয়ে বলশেভিক হয়েছেন! তা না হলে, আমি অন্তত সকলকে বলতে পারতুম যে আমার বাবা বিপ্লবী বলে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। তাহলে সকলেরই মুখ বন্ধ হয়ে যেত, কেউ আর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বাবার নিন্দে করতে পারত না। কিন্তু এখন আমি যদি বলি বাবা বলশেভিক বলে তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে, তাহলে সকলে বলবে, 'ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে'। কারণ, সব খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে, বলশেভিকরা হল জার্মানদের গুপ্তচর, দালাল। ওদের লেনিন পর্যন্ত ভিল্‌হেল্‌মের হয়ে কাজ করছে।'

'আচ্ছা, বল তো, এই 'সকলে'-টা কারা?' দাঁড়কাক বললেন। আমার ওই উত্তেজিত বক্তৃতার সময় আগাগোড়া তিনি হাসি-হাসি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

'হ্যাঁ, সকলে, সকলেই। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই। পাড়াপড়শিরা, গির্জেয় প্রার্থনার পর ভাষণের সময়ে পাদ্রিরা, আজ যে বক্তারা বক্তৃতা দিচ্ছিল তারা, সব সব...'

দাঁড়কাক এবার আমার কথায় বাধা দিলেন, 'পড়শিরা! বক্তারা! বোকা ছেলে কোথাকার! এই সব বক্তা আর তোমাদের পড়শিদের চেয়ে তোমার বাবা ঢের ঢের বেশিগুণ খাঁটি বিপ্লবী, বুঝেছ? তোমাদের পাড়াপড়শি কারা? যত সব সন্ন্যাসী, ফসলের আড়তদার, ব্যাপারী, তীর্থযাত্রী, বাজারখোলার কসাই, আর রাস্তার লোক, এই তো? মুশ্‌কিল এই যে তোমার এই সব পাড়াপড়শির মধ্যে একজনও ন্যায়নীতি-বোধওয়ালা স্থিরবুদ্ধি লোক আছে কিনা সন্দেহ। আমরা এই ধরনের পাঁচমিশেলি লোকেদের দলে টানার চেষ্টাও করি না। এদের আমরা ওইসব লাল-কুর্তা গায়ে ভাপে-ভরা ফানুসদের কাছে বোকা বানানোর জন্যে ছেড়ে রেখে দিই। এদের নিয়ে নষ্ট করার মতো যথেষ্ট সময়ই আমাদের নেই। তাছাড়া এই সব সন্ন্যাসী আর ব্যাপারীরা চেষ্টা করলেও কোনোদিন আমাদের বন্ধু হবে না। আচ্ছা, রোসো, আমরা যেখানে যেখানে সভা করি সেই সব জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে। যেমন, ধরো,

আহতদের ব্যারাক, সৈনিকদের ব্যারাক, রেলস্টেশন, গ্রামাঞ্চল এমনি সব জায়গা। ওই সব জায়গায় গেলে তবেই আসল খবর জানতে পারবে! এখানে তো মস্ত-মস্ত সব জজ বসে আছে কিনা! হুঃ, পড়শির নিকুচি করেছে!'

বলে হেসে উঠলেন দাঁড়কাক।

...তিম্‌কা শ্‌তুকিনের বাবা বিপ্লব শুরু হওয়ার পরই ছাড়া পেলেন, কিন্তু তাঁকে আর পুরনো চাকরিতে ফিরিয়ে নেয়া হল না। গির্জের তত্ত্বাবধায়ক সিনিউগিন তাঁকে অবিলম্বে দখলে-রাখা বাসা তাঁর জায়গায়-নেয়া নতুন লোকটিকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিল।

অন্য কোনো মহাজনও চৌকিদারকে চাকরি দিতে রাজি হল না। এখানে-সেখানে অনেক হাঁটাহাঁটি করলেন তিনি, কিন্তু দেখা গেল উনোন চালু রাখার কিংবা কাঠগোলার পাহারাদারের কোনো চাকরি খালি নেই।

সিনিউগিন লোকটা ক্যাটক্যাট করে বলে দিল:

'রুশ সেনাবাহিনীকে আমি সাহায্য করে থাকি। রেড ক্রশকে হাজার রুব্‌ল দান হিসেবে দিয়েচি আমি। আর দু-শো রুব্‌ল দামের নানান উপহার, নিশান আর কেরেন্‌স্কির ছবি ফৌজী হাসপাতালগুলোয় বিলি করেচি বুয়েচ? তুমি কী করেচ বাপু? না, ফৌজ থেকে পলাতকদের সাহায্য করেচ। না-না, তোমায় দেবার মতো কোনো কাজ নেই আমার।'

কথাগুলো চৌকিদারের কাছে অসহ্য ঠেকায় তিনিও পাল্‌টা জবাব দিতে কসুর করলেন না:

'তা যা বলেছেন বাবু, অনেক ধন্যবাদ এজন্যে। তবে আমি বলি কী, নিশান আর ছবি বিলিয়ে আপনি বাবু পার পাবেন না। যা পাবার-না, সময়ে তা ঠিকই পাবেন, বুঝলেন! আর আমায় অত চোখ রাঙাবেন না!' দেখা গেল বলতে বলতে ফিয়োদর-কাকাও হঠাৎ গলা চড়িয়েছেন। 'নিজেরে ভাবেন কী আপনি? ভেবেচেন পেট মোটা করে, বাড়ির ছাদে দূরবীন বসিয়ে আর পোষা কুমিররে গোমাংস খাইয়ে আপনি জার কি ঈশ্বরের চেয়ে বেশি শক্তি ধরচেন? মোটেও মনে স্থান দেবেন না তা। আপনার ওই সব কারখানায় লোকে কী বলাবলি করচে দয়া করে একবার কান

পেতে শুনবেন। আমরা তো শুনচি ওরা বলচে কারখানাগুলো নাকি ওদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তা আপনি কী বলেন?'

'আমি... আমি তোমারে ফাটকে দেব!' স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে সিনিউগিন তোত্‌লাতে শুরু করল। 'ও, তাহলে তোমার এই ব্যাপার! আমি এখুনি লিখে নালিশ জানাচ্ছি... জানো, আমার কারখানা সামরিক প্রয়োজনে কাজ করচে। নয়া সরকারও আমারে মান্যগণ্য করে, আর তুমি... বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও এখেন থেকে!'

মাথায় টুপি চাপিয়ে চৌকিদার গটগট করে বেরিয়ে এলেন।

'দূর, ছাই, এরই নাম নাকি বিপ্লব। যতো সব নোংরা লোক, যে-যার নিজের জায়গায় জাঁকিয়ে বসে আচে। আমায় বলে কিনা বেরিয়ে যেতে, ব্যাটা নিজে ফৌজী বড়কত্তা আর শহর পরিষদের কত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে কাজ চালাচ্চে। আচ্ছা করে পেরেক ঠুকে ঠুকে মারা উচিত ওগুলোরে, তাইলেই উপযুক্ত সাজা হয়। ওহ্, ভারি আমার দেশভক্ত রে!' রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আপন মনে গর্‌গর করতে লাগলেন ফিয়োদর-কাকা। 'রদ্দি বুটজুতো বেচে ব্যাটা হাজার হাজার কামিয়েচে। পয়সা ঘুস দিয়ে ছেলেটারে পর্যন্ত ফৌজ থেকে ছাড়িয়ে এনেচে। ফৌজের কত্তার হাতে গুঁজে দিয়েচে তিন শো রুব্‌ল, আর হাসপাতালের ডাক্তারের পকেটে দিয়েচে পাঁচ শো। মাতাল হয়ে নিজেই আবার বড়াই করে বলেচে এ-সব। অন্যের ঘাড় ভেঙে লড়াই জিততে ভারি ওস্তাদ সব। আবার নাকি কেরেন্‌স্কির ছবি কিনেচে। ব্যাটা, তোরে আর তোর ওই কেরেন্‌স্কিরে একই গাছে লটকে দেয়া দরকার। এই নাকি স্বাধীনতা, এর জন্যেই ধৈর্য ধরে ছিলাম এতকাল! বাহবা, বাহবা!'

সে-সময়ে মনে হত, সবাই যেন পাগল হয়ে গেছে। যেদিকে যাও, চারিদিকে খালি শোনো:

'কেরেন্‌স্কি, কেরেন্‌স্কি।'

প্রতিটি খবরের কাগজের প্রতি সংখ্যায় তখন কেরেন্‌স্কির ছবি। 'কেরেন্‌স্কি বক্তৃতা দিচ্ছেন', 'যে-পথে কেরেন্‌স্কি, সেই পথেই ফুলের গালিচা', 'খুশিতে ডগমগ মহিলারা কেরেন্‌স্কিকে কোলে তুলে নিয়েছেন', এই সব। আর্‌জামাস শহর-পরিষদের সদস্য ফেওফানভ নিজের কাজে মস্কো গেলেন কিন্তু ফিরে এলে শোনা গেল তিনি কেরেন্‌স্কির হাতে হাত মিলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে এসেছেন। ব্যস, আর যায় কোথায়, দলে দলে লোক ছুটল ফেওফানভের পেছনে।

'আপনি বলতে চান, কেরেন্‌স্কি স্বয়ং আপনার হাতে ঝাঁকুনি দিয়েছেন?'

'দিয়েছেন বই কি,' গম্ভীর চালে বললেন ফেওফানভ।

'মানে, সত্যিসত্যিই আপনার হাতে হাত দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমার এই ডান হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন।'

জনতার মধ্যে থেকে উত্তেজিত ফিস্‌ফিসানি উঠল। 'দেখলে? জার হলে কখনও এমন করতেন? কিন্তু কেরেন্‌স্কি করেছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়, উনি কিন্তু প্রত্যেককেই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে অভিবাদন জানান। অথচ আগে হলে...'

'আরে, আগে যে জারের রাজত্বি ছিল।'

'সে তো বটেই। আর এখন আমরা স্বাধীন।'

'জয় হোক! জয় হোক! স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক! কেরেন্‌স্কি দীর্ঘজীবী হোন! আচ্ছা, ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠালে হয় না!'

এখানে বলা দরকার, ওই সময়ে পোস্ট-অফিস মারফত যে-সব টেলিগ্রাম বাইরে যেত তার প্রতি দশটিতে একটি থাকত কেরেন্‌স্কির কাছে অভিনন্দনজ্ঞাপক তারবার্তা। আর ওই তারবার্তা যেত জনসভা থেকে, ইশকুলের সভা থেকে, গির্জা-পরিষদের সমাবেশগুলো থেকে, শহর-পরিষদ আর উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমিতির বৈঠক থেকে — এক কথায়, সর্বত্র থেকে। এমন কি কয়েক জনে মিলে একটা গোষ্ঠী গড়ে তার তরফ থেকেও টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগল।

একদিন গুজব রটল 'আর্‌জামাস কুক্কুট-প্রজনন প্রেমী সমিতির' তরফ থেকে তখনও পর্যন্ত 'প্রিয় নেতা'-র কাছে নাকি একটিও টেলিগ্রাম পাঠানো হয় নি। এর জবাবে স্থানীয় দৈনিক কাগজে সমিতির সভাপতি ওফেন্‌দুলিনের একটি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ প্রকাশিত হল। ওফেন্‌দুলিন সরাসরি ঘোষণা করলেন যে গুজবটা অসৎ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিন্দারটনা ছাড়া কিছু নয়। আসলে অভিনন্দনজ্ঞাপক দু-দুটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে। কাগজের সম্পাদকরা সেই সঙ্গে একটি বিশেষ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে জানালেন যে মিঃ ওফেন্‌দুলিনের এই বিবৃতিটি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের ছাপমারা উপযুক্ত রসিদদ্বারা যথারীতি প্রমাণিত হয়েছে।

দাঁড়কাকের সঙ্গে সেই দেখা হওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেছে।

সাল্‌নিকভ স্ট্রিটে উচ্চ ধর্ম শিক্ষালয়ের প্রকাণ্ড বাড়িটার পাশেই ছিল বাগানওয়ালা একটা ছোট্ট বাড়ি। রাস্তার লোকে ওই বাড়ির খোলা জানলাগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেত ঘন সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে কিছু কিছু মুখের আনাগোনা। আর তারা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে এসে, ওদের কানে কথাটা যাতে না-যায় সেদিক খেয়াল রেখে, রাগ দেখিয়ে থুথু ফেলে বলত:

'উস্কুনিদাতাদের গুল্‌তানির জায়গা আর কি!

জায়গাটা ছিল বলশেভিকদের ক্লাব। শহরে মোটমাট জনাবিশেক বলশেভিক ছিলেন, কিন্তু ওই ব্যাড়িটা সব সময়ে লোকে গিস্‌গিস করত। ওখানকার দোর অবিশ্যি সকলের জন্যেই খোলা ছিল, তবু সচরাচর যাঁরা ওখানে যেতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাসপাতালে ভরতি-হওয়া সৈনিক, অস্ট্রিয়ান যুদ্ধবন্দী আর চামড়া কারখানা ও পশমী কাপড়ের কলের মজুররা।

বলতে গেলে, আমার পুরো অবসর সময়টাই আমি ওখানে কাটাতুম। নিছক কৌতূহলবশেই দাঁড়কাকের সঙ্গে প্রথমে ওখানে গিয়েছিলুম। তারপর যেতুম অভ্যেসবশে। আর তারও পরে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য আমাকে গ্রাস করে নিল ওই ঘূর্ণি। আর মাথার মধ্যে যে-সব জঞ্জাল এতদিন ধরে জমা হয়ে ছিল ধারালো ছুরির ফলায় ছাড়ানো আলুর খোসার মতো তা খসে পড়ল।

গির্জের বিতর্কসভায় কিংবা মহাজন-ব্যাপারীদের জমায়েতে আমাদের বলশেভিকরা বক্তৃতা দিতেন না। তাঁরা সভাসমিতির অনুষ্ঠান করতেন শ্রমিক-বস্তির ধারে-কাছে, শহরের বাইরে আর রণক্লান্ত গ্রামগুলোয়।

কামেন্‌কায় এমনি একটা সভার কথা আমার এখনও মনে পড়ে।

দাঁড়কাক বলেছিলেন, 'আমাদের যেতেই হবে। সত্যিকার লড়াই হবে ওখানে। 'এস-আর'-দের পক্ষে ক্রুগ্‌লিকভ স্বয়ং বক্তিমে ঝাড়বে। ওর ধানাই-পানাই একবার শোনা উচিত তোমার। বুঝেছ, ইভানোভ্‌স্কোয়েতে ওর এমনি এক বক্তিমে শোনার পর চাষীদের এমন ধোঁকা লেগে গেল যে তারা আমাদের মারে আর কী।'

আমি আগ্রহ নিয়ে বললুম, 'চলুন তাহলে। আচ্ছা, সেমিওন ইভানোভিচ, আপনি

কখনও আপনার রিভলবার সঙ্গে নেন না কেন বলুন তো? ওটা তো আমি যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখি। একদিন দেখলুম ওটা আপনার তামাকের টিনে রয়েছে, আবার কাল দেখি রিভলবার রয়েছে আপনার রুটির টুকরিতে। আমি কিন্তু আমার রিভলবার সবসময়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াই। ঘুমনোর সময়ও আমি ওটাকে বালিশের নিচে রেখে দিই।'

দাঁড়কাক হাসলেন। সেই সঙ্গে ওঁর দাড়ির গায়ে লেগে-থাকা মাখোর্‌কা তামাকের টুকরোগুলো দুলে উঠল।

বললেন, 'তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ আছ, গোরিকভ! আরে, বক্তৃতায় কাজ না হলে লোকে ত আমায় মারতে পারে, কিন্তু এখন যদি রিভলবার বের করি তাহলে উলটে লোকে আমায় থুড়ে মাংসর কিমা বানিয়ে দেবে যে। সময় হলেই রিভলবার ব্যবহার করব বৈ কি! তবে এখন আমাদের সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হল কথা। আজ আমাদের হয়ে বাস্‌কাকভ বক্তৃতা দেবে।'

আমি অবাক হলুম, 'বাস্‌কাকভ? কিন্তু ও তো খুব খারাপ বক্তা। পরপর সাজিয়ে কথাই বলতে পারে না। ওর একটা কথার পর দ্বিতীয় কথা বলার ফাঁকে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেয়া যায়।'

'এখানে ওকে এরকম দেখছ, কিন্তু সভায় ওর বক্তৃতা শুনো, তাক লেগে যাবে।'

পুরনো, ঝরঝরে একটা পুল পেরিয়ে ছিল কামেন্‌কা যাবার রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে ঘাস-ভরা বন্যার জল জমা মাঠ আর লম্বা, ঘন শর-গাছে ভরা সরু সরু নালি। সেদিন শহর-ফেরা চাষীদের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি লম্বা সার বেঁধে রাস্তা জুড়ে চলেছিল। চাষী-মেয়েরা খালি পায়ে দুধের খালি টিন নিয়ে শহরের বাজার থেকে ঘরে ফিরছিল। আস্তে-ধীরে এগোচ্ছিলুম আমরা, এমন সময় 'এস-আর'-দের লোকে-ভরতি একটা দ্রোশ্‌কি গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে আমরাও দ্রুত পা চালালুম।

নানা দিক থেকে চওড়া চওড়া সব রাস্তা বেয়ে আশপাশের গাঁ থেকে চাষীরা দলে দলে কামেন্‌কার মাঠে এসে পেঁাছচ্ছিলেন। সভার কাজ তখনও শুরু হয় নি, কিন্তু দূর থেকেই একটা জমাট চিৎকার আর হৈ-হল্লা কানে আসছিল।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম ফেদ্‌কাকে। ও আগুপিছু ঘুরে ঘুরে লোকদের হাতে ইস্তাহার গুঁজে দিচ্ছিল। আমায় দেখে দৌড়ে কাছে এল।

'ওহো, তুইও এসে গেছিস! হেট-হেট, আজ ব্যাপারটা যা জমবে না! এই নে, এই গোছাটা ধর্ দেখি। দে তো সবার মধ্যে বিলি করে।'

ডজনখানেক ইস্তাহার আমার হাতে গছিয়ে দিল ও। তার মধ্যে একখানা খুলে দেখি, 'এস-আর'-রা তাতে যুদ্ধকে জয়যুক্ত করতে আর রণক্ষেত্র ছেড়ে না-পালাতে আবেদন জানাচ্ছে। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহারগুলো ফিরিয়ে দিলুম।

'না, ফেদ্‌কা, এ-ইস্তাহার আমি বিলি করতে পারব না। ইচ্ছে হলে তুই নিজে বিলি কর্।'

ফেদ্‌কা ঘেন্নায় থুথু ফেলল।

বলল, 'তুই একটা গাধা। ওদের সঙ্গে আছিস নাকি রে তুই?' বলে দাঁড়কাক আর বাস্‌কাকভের দিকে মাথার ভঙ্গি করে দেখাল। 'বাঃ, তোর বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি। আর আমি কিনা তোর ওপর নির্ভর করেছিলুম!'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফেদ্‌কা ভিড়ে মিশে গেল।

'ওহ্, উনি আমার ওপর নির্ভর করেছিলেন,' বাঁকা হেসে আমি নিজের মনে বললুম, 'যেন আমি নিজেই মাথা খাটাতে পারি না!'

'অ্যাঃ, জয়যুক্ত করাতি হবে...' পাশেই কাকে যেন চাপা গলায় বলতে শুনলুম।

ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, খালি পায়ে আর খালি মাথায় একজন কৃষক দাঁড়িয়ে। মুখে বসন্তের দাগ। কৃষকটির একহাতে একটা ইস্তাহার, অন্য হাতে একটা ছেঁড়াখোঁড়া ঘোড়ার লাগাম। লাগামটা বোধহয় মেরামত করছিলেন উনি, জমায়েতে লোকে কী বলছে শোনার জন্যে এখন ঘর থেকে বাইরে এসেছেন।

'জয়যুক্ত করাতি হবে — আহা মরি রে!' কথাগুলো আবার বললেন কৃষকটি। আর সভার ভিড়ের দিকে থতমত খেয়ে অবাক হবার ভঙ্গিতে এক নজর তাকালেন।

অবশেষে মাথা নেড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে পড়লেন। তারপর ইস্তাহারের দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে পাশে-বসা এক কালা বুড়োর কানের কাছে চিৎকার করে বললেন:

'আবার সেই জয়যুক্ত করাতি হবে, বুইলে? কদ্দিন থেকে কথাগুলো শুনচি, প্রোখর-ঠাকুদ্দা? সেই উনিশ শো চোদ্দ থেকে, লয়? কী মনে লিচ্চে কও দেখি ঠাকুদ্দা?'

মাঠের মাঝখানটাতে একটা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। সভার সভাপতিকে কে যে নির্বাচিত করল তা জানি না। তবে দেখলুম ছটফটে ছোটখাট চেহারার একটা লোক সেই গাড়িটার ওপর লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল:

'নাগরিকমণ্ডলী! আমি ঘোষণা করছি, সভার কাজ আরম্ভ হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি কমরেড ক্রুগ্লিকভকে আমি কিছু বলতে অনুরোধ করছি। কমরেড ক্রুগ্লিকভ অস্থায়ী সরকার, যুদ্ধ আর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের কাছে কিছু বলবেন।'

সভাপতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। এরপর মিনিটখানেকের জন্যে 'মঞ্চ' ফাঁকা রইল। তারপর হঠাৎ ক্রুগ্লিকভ লাফ দিয়ে উঠল মঞ্চে, আর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলল। গোলমাল থেমে গেল।

'মহান, মুক্ত রাশিয়ার নাগরিকমণ্ডলী! সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের পার্টির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

ক্রুগ্লিকভ বলতে শুরু করল। একটা কথাও যাতে ফসকে না যায় সেজন্যে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি শুনতে লাগলুম।

অস্থায়ী সরকার যে কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তার কথা বলল ও। বলল, জার্মানরা সমস্ত ফ্রণ্টে চাপ দিচ্ছে, ওদিকে অশুভ শক্তিগুলো — জার্মান গুপ্তচর আর বলশেভিকরা — ভিল্হেল্মের সপক্ষে প্রচার করে চলেছে।

'আগে আমাদের দেশে ছিল জার নিকোলাস, এখন আসতে চাইছে ভিল্হেল্ম। আপনারা কি আবার একজন জার চান?' ও প্রশ্ন করল।

'না-না, যথেষ্ট হয়েচে!' ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েক-শো গলা জবাব দিল।

ক্রুগ্লিকভ বলে চলল, 'যুদ্ধ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বলুন, আমরা কি হয়রান হয়ে পড়ি নি? যুদ্ধ শেষ করে দেয়ার কি সময় হয় নি এখনও?'

'হয়েচে, হয়েচে!' জনতা এবার আগের চেয়েও একমত হয়ে সায় দিল।

চটে উঠে আমি দাঁড়কাকের কানে ফিস্ফিস করে বললুম, 'ব্যাপারখানা কী, অন্যের কর্মসূচি নিজেদের বলে চালিয়ে দিচ্ছে যে? ওরা তো যুদ্ধ থামাতে চায় না, চায় কি?'

দাঁড়কাক আমার পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বললেন, 'আহা, চুপ করে শোনই না।'

‘এস-আর’-এর লোকটি তখনও বলে চলেছে, ‘যুদ্ধ শেষ করার সময় হয়েছে, নয় কি? তাহলে, দেখছেন, আপনারা সকলে একবাক্যে এ-কথাই বলছেন তো। অথচ, দেখুন, বলশেভিকরা আমাদের এই রণক্লান্ত দেশটাকে জয়গৌরব নিয়ে যুদ্ধ শেষ করার সুযোগ দিতে চায় না। ওরা সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিচ্ছে, তাই সেনাবাহিনী লড়াইয়ের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের যদি লড়াইয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন সেনাদল থাকত তাহলে শত্রুকে চরম আঘাত হেনে জয়লক্ষ্মীকে আমরা ছিনিয়ে আনতুম আর সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতুম। কিন্তু এখন আমরা শান্তিস্থাপন করতে পারছি না। এ কার দোষ? কার দোষে আমাদের ছেলে, ভাই, স্বামী, বাপ সব বাড়িঘরে ফিরে এসে শান্তিতে কাজকর্ম না করে রণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চে পচে মরছেন? আপনারাই বলুন, কে, কারা জয়কে সুদূরপরাহত করে তুলে লড়াইকে বছরের পর বছর জীইয়ে রাখছে? আমরা, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা, গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করছি: শত্রুর ওপর শেষ, চরম আঘাত দীর্ঘজীবী হোক, জার্মান শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর বিজয় দীর্ঘজীবী হোক, আর তার পরেই — যুদ্ধ নিপাত যাক, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!’

মাখোরকা তামাকের ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্যে জনতা জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। এখান-ওখান থেকে সমর্থনসূচক চিৎকার কানে এল।

এবার ক্রুগ্লিকভ বলতে শুরু করল সংবিধান-সভা সম্বন্ধে। বলল, ওই সভাই হবে দেশের সর্বময় কর্তা। তারপর ও বললে জমিদারী-সম্পত্তি খেয়ালখুশিমাফিক কেড়ে নেয়া সম্বন্ধে, শান্তি-শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখা সম্পর্কে আর অস্থায়ী সরকারের নির্দেশ আর হুকুমনামাগুলো প্রতিপালন করার বিষয়ে। শ্রোতাদের মনগুলোকে ও সূক্ষ্ম জালে চমৎকার জড়িয়ে ফেলল। প্রথমে ক্রুগ্লিকভ বক্তৃতা দিল চাষীদের সপক্ষে, তাঁদের প্রয়োজনের কথাও তাঁদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল। আর জনতা যখন ‘শুনুন, শুনুন!’ ‘ঠিক বলেচেন মশায়!’ ‘অবস্তা এর চে’ আর কী খারাপ হতি পারে!’ এই সব বলে চিৎকার করে তাদের সমর্থন জানাচ্ছিল — ক্রুগ্লিকভ তখন অতি সন্তর্পণে, প্রায়-ধরা-যায়-না এমন সূক্ষ্মভাবে, উল্টো কথা বলতে শুরু করল। তারপর একসময় হঠাৎ দেখা গেল, যে-জনতা একটু আগে ক্রুগ্লিকভের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হয়েছিল যে জমি ছাড়া চাষীদের সত্যিকার স্বাধীনতা আসতে পারে না, তাদেরই আবার এই সিদ্ধান্তেও

পৌঁছতে হচ্ছে যে একটা স্বাধীন দেশে জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া চলতে পারে না।

অবশেষে ওর নব্বুই মিনিটের বক্তৃতা শেষ হল। প্রশংসাসূচক জোর গুঞ্জন উঠল চারদিকে। গুপ্তচর আর বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হল আরেক দফা গালিগালাজ।

'কুগুলিকভটার সঙ্গে আমাদের বাস্‌কাকভের কোনো তুলনাই হয় না,' আমি ভাবলুম। 'লোকটা কীভাবেই-না সবাইকে খেপিয়ে তুলেছে!'

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল বাস্‌কাকভ। অবাক হয়ে দেখলুম, ও দিব্যি পাইপ টেনে চলেছে, মঞ্চে ওঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছের লক্ষণ ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ানো 'এস-আর'-রাও বলশেভিকদের হাবভাব দেখে কিছুটা যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। ওরা ভাবল, বলশেভিকরা বোধহয় কারো এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় আছে। কাজেই ওরা আরেকজন বক্তাকে ঝুলি থেকে বের করল। এই দ্বিতীয় বক্তাটি কিন্তু দেখা গেল কুগুলিকভের চেয়ে ঢের দুর্বল। মিন্‌মিনে গলায় সে তোত্‌লাতে লাগল আর আগে যা বলা হয়েছে তার অনেকখানিই তোতাপাখির মতো ফিরেফিরতি বলে গেল। লোকটি নেমে যাওয়ার সময় হাততালিও পড়ল অনেক কম।

তখনও বাস্‌কাকভ পাইপ টেনে চলেছে। টানা-টানা সরু-সরু চোখদুটো কুঁচকে মুখখানাকে এমন নিপট ভালোমানুষের মতো করে রেখেছে ও, যেন বলতে চাইছে: 'আরে বকুক না, যত বকতে চায়। তাতে আমার কী এল-গেল? আমি বাপু কারো সাতে-পাঁচে নেই। দিব্যি পাইপ টেনে চলেছি'।

ওদের তৃতীয় বক্তার অবস্থা ঘটল দ্বিতীয় বক্তার মতোই। আর সে যখন মঞ্চ থেকে নেমে গেল বেশির ভাগ শ্রোতাই তখন শিস্‌ দেয়া, হুপ্‌হুপ আওয়াজ করা আর চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে।

'হেই, সভাপতি-মশাই!'

'আরে ও মোড়ল, অন্য বক্তার দাও-না বাবা!'

'আরে, বলশেভিকদের কইতি দাও না গো! ওদের কইতি দিচ্চ না কেন?'

এ-অভিযোগের প্রতিবাদ করে সভাপতি জানালেন, যে বলতে চাইছে তিনি তাকেই বলতে দিচ্ছেন। কিন্তু বলশেভিকদের কেউ এখনও পর্যন্ত বলতে চায় নি।

কারণ কে জানে, হয়তো ওরা ভয় পেয়েছে। ওদের দিয়ে তো জোর করে তিনি কিছু বলাতে পারেন না।

'আপনি যদি না পারেন তো আমরা চেষ্টা করে দেখি!'

'নোংরা কাজ যা করবার শেষ করে ওরা এখন গা-ঢাকা দিতে চেষ্টা পাচ্চে হে!'

'ঘাড় ধরে ওগুলারে গাড়ির কাচে এনে ফ্যালো দেখি! পাঁচজনের সামনে বলুক যা ওদের বলার আচে...'

লোকের তর্জনগর্জন শুনে ভয় ধরে গেল আমার। দাঁড়কাকের দিকে তাকালুম। দেখলুম তিনি হাসছেন বটে, তবে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

অবশেষে দাঁড়কাক বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, বাস্‌কাকভ। এর পর কিন্তু অবস্থা খারাপ দাঁড়াবে।'

এবার সজোরে গলা ঝাড়ল বাস্‌কাকভ। তারপর পাইপটা পকেটে গুঁজে ক্রুদ্ধ জনতার মাঝখান দিয়ে হেলেদুলে গাড়ির দিকে এগোতে লাগল। লোক পথ ছেড়ে দিল ওকে।

গোড়ায়, শুরু করার আগে, ও সময় নিতে লাগল। প্রথমে একবার নির্বিকারভাবে গাড়ির চতুর্দিকে জটলা-পাকিয়ে-দাঁড়ানো 'এস-আর'-দের দিকে তাকাল, তারপর হাতের তেলো দিয়ে কপালটা মুছল। একবার চোখ বুলিয়ে নিল জনতার ওপর, শেষে ওর প্রকাণ্ড হাতের মুঠি জড় করে বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে ধরল আর সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যে হাতটা ধরল তুলে। তারপর সজোরে, ঠাণ্ডা গলায়, বিদ্রূপের সুরে বলল:

'দেখলে তো?'

এরকম একটা অদ্ভুত ধরনের সূচনায় চমকে গেলুম আমি। চাষীরাও অবাক হয়েছে মনে হল।

সঙ্গে সঙ্গে চটে-ওঠা-গলায় চিৎকার শোনা গেল:

'এর মানে কী?'

'বলি, মানুষজনরে কাঁচকলা দেখানোর মতলবখানা কী?'

'আ মোলো যা, কবি কথায় ক, কাঁচকলা দেখাস কেন? নাকি ঘাড়ধাক্কা খাবার ইচ্ছে হয়েচে?'

'বলি, দেখলে তো?' বাস্‌কাকভ আবার শুরু করল। 'যদি না দেখে থাক, এনারাই তোমাদিগে দেখিয়ে দেবেন'খন,' বলে 'এস-আর'-দের দিকে ঘাড় ঝাঁকাল। 'স্বাধীন রুশদেশের নাগরিক হলি কী হবে, তোমাদিগে যা বোঝানো হয় তাই বোঝ। আচ্ছা, নাগরিক ভাইসব কও দেখি, বিপ্লব কোন্‌ ভালোটা করেচে তোমাদের? তোমাদের বরাতে যুদ্ধ জুটেছিল, তা যুদ্ধ এখনও চলচে। তোমাদের জমিজমা ছিল না, তা এখনও নেই। জমিদারবাবুরা আশেপাশেই থাকতেন, তা এখনও আছেন তাঁরা, দিব্যি জলজ্যান্ত, হেসে-খেলে বেড়াচ্চেন। তা, তাঁদের চিন্তারই বা আচে কী? মুখে ফেনা তুলি যত ইচ্ছে তোমরা হৈ-চৈ, হুপ্‌হুপ কর। এই সরকারও কিন্তু জমিদারদের পক্ষে দাঁড়াবে। ভোঁদোভাতোভোর গ্রামবাসীদের একবার শুধোও দেখি — তারা যখন গাঁয়ের জমিদারবাবুর জমি দখল করতি চেষ্টা করেছিল তখন কী হল? তারা দেখল, গাঁয়ে মিলিটারি বসে গেচে। জমিদারবাবুর জমি অবিশ্যি খুবই সরেস ছিল, কিন্তু তাতে কী, কিছুতে কিছু হবার লয়। তোমরা তো কয়ে থাক যে তিনশো বছর ধরে তোমরা এ-সব সহ্যি করচ, কও না? তা কী করবে, সহ্যি করে যাও যতদিন পার। শাস্তরে বলে, যাদের ধৈর্য অসীম, ভগবান তাদের ভালোবাসেন। তা বুক বেধে ধৈর্য ধরে থাক, কবে জমিদার লিজে থেকে আসবেন, তোমাদের কাছে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে কবেন: 'ভালো জমি চাও বাপু? তা লাও না, লাও, লিয়ে আমায় উদ্ধার কর'। ওপিক্ষে কর সে-পয্যন্ত। আর ওপিক্ষে? সে-কথা যদি কও তো বলি, একেবারে রোজ-কেয়ামত পয্যন্ত ওপিক্ষে করি যেতি হবে। আচ্ছা, তোমরা কি শুনেচ যে সংবিধান সভা যখন বসবে তখন সেখানে এই কথা লিয়ে আলোচনা হবে — 'চাষীদের হাতে যে-জমি দেয়া হবে তা কি দায়মুক্ত হওয়া বাবদ অর্থ তাদের কাছ থেকে লিয়ে দেয়া হবে, না না-লিয়ে দেয়া হবে?' ভালো কথা। এখন তোমরা বাড়ি যেয়ে লিজের লিজের পুঁজিপাটা গুনে দ্যাখো, জমি কেনার মতো যথেষ্ট সম্বল আছে কিনা হিসেব করি দ্যাখো। তাইলে, তোমাদের মতে বিপ্লব এইজন্যেই হয়েছিল — জমিদারবাবুদের কাচ থেকে যাতে তোমরা লিজেদের জমি কিনে লিতে পার, তাই তো? আ মোলো যা, জিজ্ঞেসা করি, এইজন্যেই আমরা বিপ্লব চেয়েছিলাম নাকি? বিপ্লব না হলি কি পয়সা খরচা করে লিজে জমি কেনা যেত না?'

জনতার মধ্যে থেকে ক্রুদ্ধ আর চিন্তিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তা, তোমার ওই 'দায়মুক্ত-হওয়া-বাবদ অর্থ'-এর ব্যাপারটা কী কও দেখি?'

'ব্যাপারটা হল গিয়ে আর কিছুই লয় এ-ই...' পকেট থেকে একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্তাহার বের করে বাস্‌কাকভ এবার পড়তে শুরু করে দিলে: 'জমিদারদের অধীনস্থ যে-জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেয়া হবে তার জন্যে জমিদারদের ক্ষতিপূরণপ্রদান অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি'। একেই বলা হচ্চে, দায়মুক্ত হওয়া বাবদ অর্থ। এ কথা বলচে কাদেতদের পার্টি, আর এই পার্টিও সংবিধান সভায় বসতে যাচ্চে। ওরাও ওদের লিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে লেয়ার জন্যি লড়বে। কিন্তু আমরা, বলশেভিকরা, রাখঢাক না করে খোলাখুলি কচ্চি: সংবিধান সভা বসার জন্যি ওপিক্ষে করি লাভ নেই, এখুনি, কোনোরকম আলোচনার কচকচির মধ্যি না গিয়ে, বায়নাক্কা না তুলে, দায়মুক্ত হওয়া বাবদ অর্থ ছাড়াই, এখুনি জমি দিয়ে দাও আমাদের! জমিদারদের যথেষ্ট দিয়েচি আমরা, আর লয়।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট দিয়েচি!' জনতার মধ্যে থেকে কয়েক শো গলার সাড়া মিলল।

'চুলোয় যাক আলোচনার কচকচি! মনে লাগচে কিছুই জুটবে না আমাদের কপালে।'

'আঃ, চুপ কর না কেন! বলশেভিকরে কইতে দাও! মনে নাগছে আরও নতুন কথা কিছু শোনায় বুঝি আমাদের।'

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি হাঁ হয়ে গেছি তখন। আমাদের বাস্‌কাকভের জন্যে আনন্দে আর গর্বে বুকটা ভরে উঠেছে আমার।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দাঁড়কাক। তাঁর জামার হাতাটায় টান দিয়ে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, 'সেমিওন ইভানোভিচ! ওকে কী-না-কী ভেবেছিলুম আমি। কী আশ্চর্য, ও তো বক্তৃতা পর্যন্ত করছে না, স্রেফ কথা বলছে ওদের সঙ্গে।'

'আহা, কী চমৎকার লোক, কী চালাক লোক বাস্‌কাকভ!' ধীরস্থির ভাবে ওর ছুড়ে-ছুড়ে-দেয়া ভারি-ভারি কথাগুলো উত্তেজিত জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে ভাবলুম আমি।

বাস্‌কাকভ তখন বলে চলেছে, 'যুদ্ধজয়ের পর শান্তি? তা, কথাটা শুনতে মন্দ লয় কিন্তু। আমরা কনস্টানতিনোপ্‌ল্‌ জিতে লিব। ওই কনস্টানতিনোপ্‌ল্‌টা আমাদের বড়ই দরকার! তারপর লড়াই করতি করতি একসময় বার্লিনও জিতে লিব আমরা। তা তো হল, কিন্তু আমি শুধোই,' লাগাম-হাতে দাওয়ায়-বসা সেই কৃষক ইতিমধ্যে ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দিকে একটা আঙুল

উঁচিয়ে এবার বাস্‌কাকভ বলল, 'তোমারেই শুধোই, কও দেখি, জার্মানরা কিংবা তুর্করা কি তোমার কাচ থেকে ধার নিয়ে শুধতে চাইচে না? কও দেখি ভালোমানুষের পো, কনস্টানতিনোপ্‌ল্‌ যাওয়ায় তোমার কামটা কী? তুমি কি ওখেনকার বাজারে আলু চালান দিতে চাও? কথা কও না কেন? কয়ে ফ্যালো।'

কৃষকটি লাল হয়ে উঠে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। তারপর সামনের দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে রাগত সুরে জবাব দিলেন:

'কনস্টানতিনোপ্‌ল্‌ চাই কীসের জন্যি?.. মোটেই চাই নে, একদম চাই নে!'

'তাইলে? তুমি চাও না, আমি চাই না, এখানে কেউই চায় না তা। চায় খালি মহাজন-ব্যাপারীরা। ওরা লাভের ব্যবসা চালাতি চায়। তা, ওরা যদি চায় তো নিজেরাই লড়াই করুক না কেন। চাষীদের এ-নিয়ে লড়াই করার কী আচে? তাইলে তোমাদের গাঁয়ের আদ্ধেক নোকরে ফ্রণ্টে চালান করি দিয়েচে কেন, শুনি? মহাজনরে লাভের মণ্ডা হাতিয়ে নিতে সাহায্য করতি? আচ্ছা হাবাগবা লোক তো তোমরা। ইয়া-ইয়া পালোয়ান, লম্বা-লম্বা দাড়ি সব, অথচ যে-কেউ কড়ে আঙুলে তুলি ন্যাচাতি পারে।'

'ঠিক! ঠিক কয়েচ!' উরুতে চাপড় মেরে সেই কৃষকটি বললেন। 'চোখের মাথা খেয়ে বসেচি। নোকটা খাঁটি কথা কয়েচে!' বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট করে রইলেন কৃষকটি। ·

'তাইলে শোন আমাদের বক্তব্য,' শেষ করার আগে বাস্‌কাকভ বললে, 'আমরা বলি, যুদ্ধ জয়ফয় শেষ করে শান্তি চাই না আমরা, বাড়ির মরদরা সব মরে ভূত হোক, আরও হাজার হাজার মজুর চাষী কানা-খোঁড়া-পঙ্গু হোক এ আমরা চাই না — এখুনি শান্তি চাই আমরা, তা সে যুদ্ধজয় হোক আর নাই হোক। আমাদের নিজেদের দেশেই তো আমরা জমিদারবাবুদের যুদ্ধে হারাতে পারি নি এখনও। কেমন, কথাটা খাঁটি কিনা, ভাইসব? যদি এতে কারো অমত থাকে তো সে আসুক সামনে, কয়ে যাক আমি মিথ্যেবাদী, কয়ে যাক আমি খাঁটি কথা কচ্চি না। আর আমার কিছু কওয়ার নেই!'

এখনও মনে পড়ে, জনতার মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার ফেটে পড়ল। 'এস-আর' ক্লুগ্‌লিকভ রক্তশূন্য মুখে মঞ্চে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে-নেড়ে সবাইকে চুপ করিয়ে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু ওকে ধাক্কা দিয়ে লোকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে।

বাস্‌কাকভ পাইপ ধরাতে মুখে-বসন্তের-দাগওয়ালা কৃষকটি — সেই যাঁকে বাস্‌কাকভ জিজ্ঞেস করেছিল সে কনস্টানতিনোপ্‌ল্‌ চায় কী জন্যে, তিনি — এসে বাস্‌কাকভের জামা ধরে টানলেন। ওঁর কুঁড়েয় চা খাওয়ার নেমন্তন্ন জানালেন উনি।

প্রায় অনুনয়ের সুরে বললেন, 'মধু দে', বুইলে? এখনও এক-আধটুক আছে। তা তোমার স্যাঙাতদেরও ডাক না কেন।'

শুকনো র‍্যাস্‌প্‌বেরি ফলের নির্যাস-মেশানো ফুটন্ত জল খেলুম আমরা। কুঁড়ের ভেতরটা মৌচাকের মিষ্টি গন্ধে ম-ম করছিল।

'এস-আর'দের নিয়ে দ্রোশ্‌কিটা ধুলোয়-ভরা রাস্তা বেয়ে আমাদের জানলার পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখতে-দেখতে শুকনো, গুমোট সন্ধে নেমে এল। দূরে শহরে তখন গির্জেগুলোর ঘণ্টা বাজছে। তিরিশটা গির্জের সন্ন্যাসী আর পাদ্রিরা বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী মাতৃভূমিকে তুষ্ট করার জন্যে জানাচ্ছে আকুল প্রার্থনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিম্‌কা শ্‌তুকিনকে বিদায় জানাতে ওদের কবরখানার বাসায় গেলুম। বাবার সঙ্গে ও চলে যাচ্ছিল ওর কাকার কাছে ইউক্রেনে। জিতোমিরের কাছাকাছি কোনো জায়গায় ওর কাকার একটা ছোট্ট খামার ছিল।

গিয়ে দেখি ওদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। তিম্‌কার বাবা গেছেন ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করতে। তিম্‌কাকে বেশ খুশিই মনে হল। ও স্থির হয়ে এক জায়গায় বসতে পারছিল না, খালি এঘর-ওঘর দৌড়োদৌড়ি করছিল, যেন যে-বাসায় ও জন্ম থেকে এত বড়টি হয়ে উঠেছিল সেখানকার চারি দিক একবার শেষ দেখা দেখে নিতে চাইছিল।

কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হল, তিম্‌কা সত্যিসত্যিই খুশি নয়, বরং ও প্রাণপণে চোখের জল লুকোতে চেষ্টা করছে। ওর পাখিদের ও ছেড়ে দিয়েছে দেখলুম।

'ওরা সব... উড়ে পালিয়েছে,' তিম্‌কা বলল। 'রবিনপাখিটা, মন্দা টিট্‌গুলো, গোল্ডফিঞ্চগুলো, সিস্‌কিনটা। সব পালিয়েছে। বুঝলি বরিস, সিস্‌কিন পাখিটাকে আমি সবচে' ভালোবাসতুম। খু-উ-ব পোষ মেনে গিয়েছিল। খাঁচার দরজা খুলে

দিতে ও কিছুতে বাইরে আসতে চাইছিল না। তখন ছোট একটা কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে দিলুম। শেষপরে পাখিটা উড়ে গিয়ে একটা পপ্‌লারের ডালে বসে গান গাইতে লাগল — আহ্‌, সে গান যদি শুনতিস-না! আরেকটা ডালে খাঁচাটা ঝুলিয়ে রেখে আমি গাছটার নিচে গিয়ে বসলুম। বসে-বসে এখানে আমাদের দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। ভাবছিলুম এই সব পাখি, ওই কবরখানা আর আমাদের ইশকুলের কথা। আর এখন সব শেষ হয়ে গেল, আমাদের চলে যেতে হচ্ছে, এইসব। অনেকক্ষণ এইভাবে বসে-বসে ভাবার পর উঠে খাঁচাটা ডাল থেকে পাড়তে গেলুম। আর তুই বললে বিশ্বাস করবি না, বরিস, দেখি কী, সিস্‌কিনটা ফের খাঁচাটার উপর চুপচাপ বসে আছে। কখন এসে আবার নেমেছে কে জানে, কিছুতে পালাতে চাইছে না। আর হঠাৎ সবকিছুর জন্যে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল। আমার... আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল, জানিস রে।'

অসম্ভব বিচলিত হয়ে পড়ে বললুম, 'যাঃ, বাজে কথা বলছিস তিম্‌কা। তুই নিশ্চয়ই কেঁদেছিলি।'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা,' কথাটা স্বীকার করতে গিয়ে তিম্‌কার গলা ধরে গেল। 'এই সবকিছুতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম, বরিস। এখানে আমাদের জায়গা হল না বলে মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে, কী বলি। জানিস, আমি-না বাবাকে লুকিয়ে গির্জের তত্ত্বাবধায়ক সিনিউগিনের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিলুম, যদি তিনি আমাদের থাকতে দেন। কিন্তু তিনি দিলেন না।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে তিম্‌কা ফের বললে, 'ওঁর কী আসে যায়? দিব্যি চমৎকার নিজের বাড়ি আছে ওঁর...'

গলা নামিয়ে একেবারে ফিসফিস করে শেষের কথাগুলো বলল তিম্‌কা। তারপর চট করে চলে গেল পাশের ঘরে। মিনিটখানেক পরে আমি যখন সে ঘরে গেলুম, দেখলুম তিম্‌কা ওদের বিছানার সঙ্গে বাঁধা একটা বড় পোঁটলায় মুখ গুঁজে কাঁদছে।

রেলস্টেশনে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে কামরায় ওঠার জন্যে এক বিশাল জনসমুদ্রের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে তিম্‌কা আর ওর বাবা কোথায় হারিয়ে গেলেন।

চিন্তিত হয়ে পড়লুম আমি, 'ইস্‌, ও তো পিষে যাবে এই ভিড়ে। এত লোক যাচ্ছেই বা কোথায়?'

প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সৈনিক, সামরিক অফিসার আর নাবিকের ভিড়। অবাক হয়ে ভাবলুম, 'আচ্ছা, এরা না হয় এতে অভ্যস্ত, মিলিটারির লোক। কিন্তু ওরা সব যাচ্ছে কোথায়?' স্তূপাকার বাক্স, টুকরি আর স্যুটকেসের চারপাশে ভিড় করে ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ওরা', অর্থাৎ বেসামরিক সাধারণ নাগরিকরা। গোটা পরিবার নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল ওরা। অনবরত ছোটাছুটি আর উত্তেজনার ফলে কপালে ঘাম জমে উঠেছিল, পরিষ্কার কামানো-মুখ, ক্রুদ্ধ, উত্যক্ত সব পুরুষ মানুষ। ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, সুন্দর কাটা-কাটা মুখচোখওয়ালা মেয়েরা। এত হট্টগোল দেখে ঘাবড়ে-যাওয়া, একগুঁয়ে, রগচটা, আজগবি-ধরনের-টুপি-মাথায় সেকেলে সব মা-মাসিরা।

আমার বাঁ-দিকে মস্ত একটা স্যুটকেসের ওপর চেপে বসেছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। সিনেমায় যেমন অভিজাত-বংশীয়া বৃদ্ধা কাউন্টেসদের ছবি দেখা যায় তেমনই দেখতে। তাঁর এক হাতে ছিল একগাদা বিছানার চাদর বাণ্ডিল-বাঁধা, অন্য হাতে তোতাপাখির খাঁচা একটা।

নৌবাহিনীর এক ছোকরা অফিসারকে গলা চড়িয়ে তিনি কী-যেন বলছিলেন। অফিসারটি প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা ভারি লোহার ট্রাঙ্ক টানার চেষ্টা করছিল।

'আঃ, ছেড়ে দাও তো,' ছোকরাটি জবাব দিল, 'এখানে কুলি পাবে কোথায়, শুনি! আঃ, চুলোয় যাক সব! এ্যাই, শোন!' হঠাৎ ট্রাঙ্কটা নামিয়ে রেখে কাকে যেন ডাকল ও। দেখা গেল, পাশ দিয়ে চলে-যাওয়ার সময় একজন সৈনিককে ও ডেকে বলছে, 'এই-যে, তুমি, তুমি! আমার এই মালপত্রগুলো ট্রেনে তুলতে একটু সাহায্য কর দেখি।'

খানিকটা অবাক হয়ে আর এই কর্তৃত্বপূর্ণ হুকুম শুনে যান্ত্রিকভাবেই সৈনিকটি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল আর হাত দুটো ঝুলে পড়ল দু-পাশে। তারপর হঠাৎ-কিছু-না-ভেবেই এরকম হুকুম মানায় আর ওর সঙ্গীদের বিদ্রূপভরা চোখের দৃষ্টি দেখে যেন কিছুটা লজ্জিতভাবে সহজ হবার চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে হাতদুটো কোমরের বেল্টের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এতক্ষণে ও অফিসারের দিকে চোখ সরু করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকাল।

অফিসারটি আবার বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমাকেই বলছি। কী হল, কালা হয়ে গেলে নাকি?'

'না, স্যার, কালা হব কেন? তবে কিনা, আপনার জিনিসপত্তর আপনার হয়ে টানাটানি করা আমার কাজ নয়।'

কথাটা বলে পেছন ফিরে ধীরে-সুস্থে ট্রেনের ধার-বরাবর এগিয়ে গেল।

অফিসারটির দিকে ঝাপসা চোখে কটমট করে তাকিয়ে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গ্রেগরি! শিগ্‌গির, শিগ্‌গির একজন মিলিটারি পুলিশ ডাক, গ্রেগরি, অসভ্য লোকটাকে গ্রেপ্তার করুক এসে!'

কিন্তু অফিসারটি অসহায়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে থামিয়ে দিল মহিলাকে। তারপর হঠাৎ খেপে উঠে ধমক দিয়ে বললে:

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো। সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই! কী বোঝো তুমি? কোথায় মিলিটারি পুলিশ? কার কথা বলছ তুমি — পরপার থেকে ডেকে আনব কাউকে? চুপটি করে মুখ বন্ধ করে বোসো দেখি।'

হঠাৎ ট্রেনের একটা কামরার জানলা দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তিম্‌কাকে মুখ বের করতে দেখা গেল।

'এই! বরিস! এই যে, আমরা এখানে!'

'কী রে, কেমন? জায়গাটায়গা পেয়েছিস?'

'মন্দ-না। বাবা বসেছে আমাদের মালপত্রের ওপর, তার ওপরের বাঙ্কে একজন মাল্লা তার পাশে একটু জায়গা দিয়েছে আমায়। বলেছে, 'বেশি নড়াচড়া করবি না, তাহলে তাড়িয়ে দেব'।'

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ার পর হৈচৈ আরও বেড়ে গিয়ে রীতিমতো হল্লায় পরিণত হল। প্রাণ খুলে দিব্যি গালার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা, সেন্টের সুগন্ধের সঙ্গে ঘামের গন্ধ, অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনার সঙ্গে কান্নার শব্দ মিলেমিশে সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। হঠাৎ সবকিছু ডুবিয়ে ট্রেনের বিকট বাঁশি শোনা গেল।

'বিদায়, তিম্‌কা!'

'বিদায়, বরিস!' জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে গোছা গোছা চুল উড়িয়ে ও হাত নাড়তে লাগল।

নানা ধরনের, রকমারি কয়েক শো লোক নিয়ে ট্রেন চলে গেল। তবু স্টেশনে লোকের ভিড় কিছু কমেছে বলে মনে হল না।

'উহ্, দেখলে কাণ্ডটা!' পাশে একজনের গলা শুনলুম। 'সকলেই চলেছে দক্ষিণে।

রোস্তভে, দোনে। উত্তর দিকে যত ট্রেন যাচ্ছে তাতে থাকছে সৈন্য আর চাকুরেরা, আর দক্ষিণের ট্রেন বোঝাই হয়ে যাচ্ছে যতসব ভদ্দরলোক, বাবুমশায়রা।'

'কোথায় যাচ্ছে সব কও দেখি — স্বাস্থ্যনিবাসে, নাকি?'

বিদ্রূপের সুরে জবাব শোনা গেল, 'তা বলেচ বটে কথা একখান। জবুথবুরোগ সারানোর জন্যি, বলতি পার। ভয়ে ওরা আজকাল এক্কেবারে আধমরা হয়ে আচে, ওই যে তোমাদের বাবুমশায়রা গো।'

স্টেশনের বাইরের গেটের দিকে এগিয়ে চললুম আমি, গাদা-গাদা বাক্স, ট্রাঙ্ক আর বস্তার পাশ কাটিয়ে। দেখতে-দেখতে চললুম, কেউ বা চা খাচ্ছে, বিচি চিবুচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের কেউ, নয়তো কেউ ঘুমোচ্ছে, হাসছে কিংবা ঝগড়া করছে।

হঠাৎ দেখি কোত্থেকে উদয় হয়েছে খোঁড়া খবরকাগজওয়ালা সেমিওনের। প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে কাঠের পা চালিয়ে আশ্চর্য তাড়াতাড়ি হাঁটছে আর তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় হাঁকছে:

'সন্ধের সংখ্যা! সন্ধের সংখ্যা! 'রুস্‌কোয়ে স্লোভো'! পড়ুন, বলশেভিক শোভাযাত্রার চমকপ্রদ বিবরণ! সরকারের হাতে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ! বহু লোক হতাহত। বলশেভিক চাঁই লেনিনকে ধরার বৃথা চেষ্টা!'

কাগজগুলো, বলতে গেলে, লোকে প্রায় ছিনিয়ে নিল। ভাঙানির পয়সা ফেরত চাইল না কেউ।

বাড়ি ফেরার পথে বড় রাস্তা ছেড়ে অল্প একটু ডানদিকে বেঁকে পাকা রাই-খেতের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ ধরলুম। নালায় নামতেই দেখি কে একজন উলটো দিকের উৎরাই বেয়ে নেমে আমার দিকেই আসছে। লোকটির পিঠে একটা বড় বোঝা, বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে দেহটা। কাছে আসতে লোকটিকে আমাদের দাঁড়কাক বলে চিনতে অসুবিধে হল না।

উনি ডেকে বললেন, 'বরিস? এখানে কী করছ? স্টেশন থেকে আসছ নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ট্রেন ধরতে নিশ্চয়ই? ট্রেন ধরার থাকলে আপনি কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন, সেমিওন ইভানোভিচ। ট্রেন এইমাত্র চলে গেল।'

দাঁড়কাক থামলেন। তারপর পিঠের ভারি বোঝাটা মাটিতে ফেলে ঘাসের ওপর বসলেন।

'ধুত্তোরি,' মহা বিরক্তির সঙ্গে পা দিয়ে বোঁচকাটার গায়ে একটা খোঁচা মেরে বললেন, 'এখন এটাকে নিয়ে কী করি?'

বললুম, 'কী ওটা?'

'বেশির ভাগই সাহিত্য, কাগজপত্র। তাছাড়া আরও কিছু আছে...'

'তাহলে আসুন আমরা দু-জনে মিলে ওটা বয়ে নিয়ে যাই। আজ রাত্রে ওটা তো ক্লাবে থাক, কাল সকালে বরং দেখা যাবে'খন।'

মাখোরকা তামাকের সেই চিরাচরিত টুকরো-জড়ানো কালো দাড়ি বারকয়েক নাড়লেন দাঁড়কাক।

'সেইখানেই মুশকিল হয়েছে, ইয়ার। ক্লাবে তো এটা রাখা যাচ্ছে না কিনা। আমাদের ক্লাবের দফা রফা। ক্লাব আর নেই।'

'সে কি?' আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলুম। 'কেউ আগুন লাগিয়ে দিল, নাকি? স্টেশনে আসার পথে আজ সকালেও তো ক্লাব ঠিক আছে দেখলুম।'

'না, কেউ আগুন দেয় নি, খালি বন্ধ করে দিয়েছে, ইয়ার। ভাগ্যিস, কিছু কিছু লোক সময় থাকতে আমাদের সাবধান করেছিল। ক্লাবে এখন খানাতল্লাসি চলছে।'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম, 'কিন্তু, সেমিওন ইভানোভিচ, ক্লাবটা বন্ধ করে দেয় কী করে? এখন তো আর পুরনো রাজত্ব নেই। আমরা এখন স্বাধীন। 'এস-আর'দের ক্লাব চলছে, মেনশেভিকদের, কাদেতদেরও ক্লাব চালু, আর নৈরাজ্যবাদীরা তো সব সময়ে মাতাল হয়েই আছে, এমন কি ওদের জানলাগুলো পর্যন্ত বোর্ড লাগিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। তবু কেউ তো ওদের গায়ে হাত দেয় না। আর আমরা তো চুপচাপ থাকি, তবু যত দোষ কি আমাদের? হঠাৎ ওরা এইভাবে আমাদের ক্লাব বন্ধ করে দিল যে!'

'স্বাধীন! স্বাধীনতা! হুঃ!' দাঁড়কাক হাসলেন। 'কারো জন্যে স্বাধীনতা, আর কারো জন্যে ঘোড়ার ডিম। কিন্তু আমি এখন এই বোঝাটা নিয়ে করি কী, বল তো? কাল পর্যন্ত এটা কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। আমি এটা এখন শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না, তাহলে পুলিশ এটা হাতিয়ে নেবে।'

'তাহলে ওটা কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক, সেমিওন ইভানোভিচ! কাছেই একটা জায়গা আমার জানা আছে। এই নালা ধরে আরেকটু এগিয়ে গেলে একটা পুকুর পড়বে, তার এক পাশে একটা খোলা গর্তের মতো জায়গা আছে। একসময় ইট

তৈরির জন্যে ওখান থেকে মাটি কাটা হত। ওই গড়খাইয়ের দেয়ালে অনেক ছোট বড় গর্ত আছে। তার মধ্যে ঘোড়াসুদ্ধু আস্ত একটা গাড়ি পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায়, বোঁচকা-বুঁচকি তো কোন ছার। তবে শুনেছি ওখানে নাকি সাপ আছে। আমার তো খালি পা, কিন্তু আপনার পায়ে বুটজুতো আছে। কাজেই ঠিক আছে। আর তাছাড়া আপনাকে কামড়ালেই বা কী — আপনি তো আর মরবেন না, একটু নেশা হবে এই যা।'

শেষের কথাগুলো দাঁড়কাকের তেমন পছন্দ হল না। উনি জানতে চাইলেন, সাপ নেই এমন আর কোনো লুকনোর জায়গা কাছাকাছি আমার জানা আছে কিনা।

জানালুম, কাছাকাছি তেমন কোনো সুবিধেমত জায়গা নেই। সর্বত্র সব সময়ে লোকে চলাফেরা করছে — হয় ভেড়া চরাচ্ছে, নয় আলুর খেতে নিড়েন দিচ্ছে, আর নয়তো পরের সব্জি-বাগানগুলোর কাছে ছেলেপিলেরা ঘুরঘুর করছে।

কাজেই, কী আর করা। দাঁড়কাক বোঝাটা কাঁধে ফেলে উঠলেন। নদীর পাড় ধরে আমরা এগোতে লাগলুম।

নিরাপদ একটা জায়গা বেছে নিয়ে বোঁচকাটা লুকিয়ে রাখলুম।

'আচ্ছা, শহরে ফিরে যাও তাহলে,' দাঁড়কাক বললেন। 'কাল এসে আমি বোঁচকাটা নিয়ে যাব। আর আমাদের কমিটির কোনো লোককে যদি দেখতে পাও তো বোলো যে আমি এখনও এখানে আছি। আচ্ছা, দাঁড়াও এক মিনিট...' আমাকে দাঁড় করিয়ে মুখের দিকে নির্বিষ্ট ভাবে তাকালেন উনি। 'কথাটা কাউকে বলবে না, আশা করি? কী বল, ইয়ার? বেফাঁস কথা কিন্তু মোটে নয়।'

'না-না, কখনই না!' অপমানকর এই সন্দেহ প্রকাশ করায় সংকুচিত হয়ে বিড়বিড় করে বললুম, 'কারো সম্বন্ধে একটা কথাও কি কখনও আমি বলেছি? এমন কি ইশকুলেও কখনও কারো সম্পর্কে আড়ালে অন্যায়ভাবে কথা লাগাই নি, খেলাচ্ছলেও না। আর এ তো খেলা নয়, এ গুরুতর ব্যাপার। কী করে আপনি ভাবতে পারলেন যে...'

দাঁড়কাক কথাটা শেষ করতে দিলেন না আমায়। হাড়-জিরজিরে হাত দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। হেসে বললেন:

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও, বাড়ি যাও দেখি। একেবারে পাক্কা ষড়যন্ত্রী দেখছি!'

ওই একটা গ্রীষ্মের মধ্যে ফেদ্‌কা যেমন লম্বা হল তেমনি পাকাপোক্ত, ঝান্‌ হয়ে উঠল একেবারে। লম্বা-লম্বা চুল রাখল, গায়ে চড়াল কালোরঙের রুশী ঢোলা কামিজ। আর হাতে ওর সব সময়েই থাকত একটা ব্রিফকেস। খবরের কাগজে বোঝাই এই ব্রিফকেস হাতে ও একটা ইশকুলের সভা থেকে আরেকটা ইশকুলের সভায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। ফেদ্‌কাকে দেখা যেতে লাগল সর্বত্র। ক্লাস কমিটির সভাপতি ফেদ্‌কা। বালিকা বিদ্যালয়ে কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিও ফেদ্‌কা। মা-বাপদের সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি সেই ফেদ্‌কা। বক্তিমে দেয়ায় ও হয়ে উঠল চৌকস, যেন একেবারে দ্বিতীয় ক্রুগলিকভ। 'ছাত্ররা শিক্ষকদের কথার জবাব দেবে কি বসে, না দাঁড়িয়ে উঠে?' কিংবা 'স্বাধীন দেশে বাইবেল-ক্লাসে বসে তাস খেলা চলতে পারে কী?' এই ধরনের বিষয় নিয়ে বিতর্কসভায় ফেদ্‌কাকে প্রায়ই দেখা যেত লাফিয়ে ডেস্কের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর দেখতে-দেখতে একটা পা এগিয়ে দিয়ে, একটা হাত কোমরের বেলটে গুঁজে বলতে শুরু করেছে: 'নাগরিকবৃন্দ, আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি... পরিস্থিতি আজ এমন... বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ফলাফলের দায়িত্ব আমাদেরই কাঁধে...' অর্থাৎ, কথায়-বার্তায় একেবারে, যাকে বলে, আঠারো আনা পোক্ত।

আমার সঙ্গে কিন্তু ফেদ্‌কার তেমন বনছিল না। তখনও পুরো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় নি বটে, তবে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছিল।

আমি আবার সকলের থেকে আলাদা হয়ে পড়ছিলুম।

আমার বাবার ব্যাপারটা সকলে প্রায় ভুলতে বসেছিল আর আমার ও বন্ধুদের মধ্যে ওই ব্যাপার নিয়ে যে-সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা আবার জোড়া লাগার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল, এমন সময় রাজধানী থেকে এই নতুন পরিবর্তনের হাওয়া এসে লাগল গাঁয়ে। আমাদের শহরের বাসিন্দারা বলশেভিকদের ওপর হঠাৎ সাংঘাতিক খেপে উঠল। ক্লাবটাকে তারা দিলে বন্ধ করে। মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ স্থানীয় সামরিক বাহিনী বাস্‌কাকভকে গ্রেপ্তার করল। আর ইশকুলে এজন্যে যত দোষ সব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। কেন আমি বলশেভিকদের সঙ্গে অত মেশামেশি করেছি, মে-দিবসে কেন আমি ওদের ক্লাবঘরের ছাদের ওপর পতাকা টাঙিয়েছি,

কেন আমি কামেন্‌কার সেই সভায় যুদ্ধকে জয়যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে ফেদ্‌কার-দেয়া ইস্তাহারগুলো বিলি করতে অস্বীকার করেছি, এই সব অভিযোগ।

আমাদের ইশকুলের সব ছেলেই তখন ইস্তাহার বিলি করত। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার যে কারো ইস্তাহার পেলেই মহা খুশি হয়ে গোছা গোছা তাই নিয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করে এর-ওর-তার হাতে গুঁজে দিতে থাকত। তা সে ইস্তাহার কাদেত, নৈরাজ্যবাদী, খ্রীস্টিয়ান সোশ্যালিস্ট কিংবা বলশেভিক — যারই হোক না কেন। অথচ এটা যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এমন ভাব করে ওই ছেলেগুলোকে কেউ কিছু বলল না। কেবল আমারই হল যত দোষ! যাঃ বাবা!

কিন্তু কামেন্‌কার ওই সভায় আমি ফেদ্‌কার দেয়া 'এস-আর'দের ইস্তাহার বিলি করতুমই বা কী করে? বাস্‌কাকভ যে তার আগেই তার একগাদা ইস্তাহার দিয়ে আমায় বিলি করতে বলেছিল। একই সঙ্গে দুই পার্টির ইস্তাহার কি বিলি করা সম্ভব? তবু যদি ইস্তাহার দুটোর বক্তব্য এক ধরনের হত তাহলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু ওর একটায় যেখানে বলা হচ্ছিল 'জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের গৌরব দীর্ঘজীবী হোক', সেখানে অপরটা বলছিল, 'লুঠেরা যুদ্ধ ধ্বংস হোক'। একটা বলছিল, 'অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন কর', আর অন্যটা ডাক দিচ্ছিল সরকারের 'দশজন পুঁজিবাদী মন্ত্রী ধ্বংস হোক' বলে। কাজেই, কী করে তখন দুটো ইস্তাহার একসঙ্গে বিলি করা সম্ভব হত, বিশেষ করে যখন একটা ইস্তাহার অপরটাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিচ্ছিল?

ওই সময়ে ইশকুলে পড়াশুনো হচ্ছিল সামান্যই। শিক্ষকরা সব সময়েই ক্লাবের সভা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন কট্টর রাজতন্ত্রী, তাঁরা আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। তা ছাড়া রেড ক্রশ সমিতি ইশকুলের অর্ধেকটা দখল করেছিল।

মাঝেমাঝেই মা-কে শোনাতুম তখন, 'মা, আমি কিন্তু ইশকুল ছেড়ে দেব। এখন তো আর ইশকুলে পড়াশুনো হচ্ছে না, তাছাড়া সকলের সঙ্গেই এখন আমার শত্রুতা। এই তো গত কালই কোরেনেভ যুদ্ধে আহতদের সাহায্যের জন্যে একটা কাপে চাঁদা তুলছিল। আমার কাছে বিশ কোপেক ছিল, আমি কাপে ফেলতেই ও একেবারে ভুরু-টুরু কুঁচকে বললে: 'হঠকারীদের কাছ থেকে আমার দেশ ভিক্ষা চায় না'।

মনে হল, নিজের ঠোঁটটা কামড়ে রক্ত বের করে ফেলি। সকলের সামনে কিনা এমন কথা বললে! বললুম, 'আমি না হয় যুদ্ধ-পলাতকের ছেলে। কিন্তু তুই কী? তুই তো চোরের ব্যাটা। তোর বাবা তো ঠিকেদারি করে মিলিটারি ঠকিয়ে খায়। আহতদের জন্যে চাঁদা তুলে তুইও না জানি কত সরাবি এ থেকে'। ব্যস, আমাদের মধ্যে মারামারি বেধে যায় আর কী। কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি কমরেডদের একটা আদালত বসবে এ নিয়ে। বসুক গে, কে পরোয়া করে! হুঃ, ওঁরা নাকি সব আবার বিচারক! মর ব্যাটারা, উনুনের ছাই খা গে' যা!'

বাবার দেয়া পিস্তলটা সব সময়ে সঙ্গে-সঙ্গে রাখতুম আমি। জিনিসটা ছিল ছোট্ট আর ওটাকে সঙ্গে বয়ে-বেড়ানো ছিল ভারি সুবিধের। নরম শ্যামোয়া-চামড়ার একটা খাপে ভরে রাখতুম ওটাকে। আত্মরক্ষার জন্যে যে আমি ওটা বয়ে বেড়াতুম তা নয়। কারণ, তখনও পর্যন্ত কেউ আমার ওপর হামলা করে নি, কিংবা তা করার চেষ্টাও করে নি। কিন্তু পিস্তলটা বাবার স্মৃতিচিহ্ন, বাবার দেয়া উপহার বলে আমার বড় প্রিয় ছিল। আমার একমাত্র মূল্যবান সম্পত্তি বলতে ছিল ওটাই। মাওজারটাকে আমার পছন্দ হওয়ার আরেকটা কারণ ছিল এই যে ওটা সঙ্গে থাকলে আমি কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ, একটা গর্ব অনুভব করতুম। তাছাড়া তখন আমার বয়েস ছিল মাত্র পনেরো বছর, আর ওই বয়েসের একটা ছেলে একটা আস্ত আসল রিভলবার হাতে পেলে ছেড়ে দেবে, এমন কথা তো কখনও শুনি নি। আর একটি লোক যে আমার মাওজারটার কথা জানত সে হল ফেদ্‌কা। যখন আমরা দু-জন বন্ধু ছিলুম তখন একদিন ওকে আমার জিনিসটা দেখিয়েছিলুম। বাবার দেয়া উপহারটা সযত্নে পরীক্ষা করতে-করতে আমার ওপর ওর হিংসে যে কতদূর বেড়ে উঠেছিল তা সেদিনই বুঝেছিলুম।

কোরেনেভের সঙ্গে আমার ঝগড়ার পরদিন আমি যথারীতি কাউকে শুভেচ্ছা না-জানিয়ে বা কারো দিকে না-তাকিয়ে ক্লাসে ঢুকলুম।

সেদিন প্রথম পিরিয়ডে ছিল ভূগোলের ক্লাস। মাস্টারমশাই অল্পক্ষণ চীনের পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে কিছু বলে তারপর খবরের কাগজের সেদিনকার টাটকা খবর নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এই আলোচনা যখন চলছিল তখন আমি লক্ষ্য করলুম ফেদ্‌কা ছোট-ছোট চিরকুট লিখে ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে বিলি করছে। আমার সামনের বেঞ্চিতে বসা একটা ছেলে যখন ওরই মধ্যে একটা চিরকুট পড়ছিল

তখন তার কাঁধের ওপর দিয়ে আমিও লেখাটা পড়তে শুরু করে দেখলুম ওতে আমার নাম আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সাবধান হয়ে গেলুম।

পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ার পর আমি উঠে চারিদিকে নজর রাখতে-রাখতে দরজার দিকে এগোলুম। কিন্তু দেখলুম ক্লাসের পালোয়ানগোছের একদল ছেলে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে-দেখতে অর্ধবৃত্তের আকারে গোল হয়ে ওরা আমায় ঘিরে ফেললে। তারপর ওদের মধ্যে থেকে ফেদ্‌কা বেরিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

বললুম, 'কী চাই?'

ও উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, 'রিভলবারটা দিয়ে দে। ক্লাস-কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোকে রিভলবারটা মিউনিসিপ্যালিটির রক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে জমা দিতে হবে। যাই হোক, এখুনি ক্লাস-কমিটির হাতে ওটা দিয়ে দে, আসচে কাল এর জন্যে স্থানীয় রক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে রসিদ পাবি।'

'কিন্তু, কোন রিভলবারের কথা বলছিস?' আমি বললুম। আস্তে-আস্তে তখন একপা-একপা করে জানলার দিকে পেছুতে শুরু করেছি আর প্রাণপণে শান্ত থাকার চেষ্টা করছি।

'বাজে কথা বকিস না! তুই যে একটা মাওজার সব সময়ে সঙ্গে রাখিস, আমি তা জানি না ভেবেছিস? ওই তো তোর ডান পকেটে ওটা রয়েছে। ভালোয়-ভালোয় নিজে থেকে ওটা দিয়ে দে, নয়তো আমরা রক্ষী-বাহিনীকে ডাকতে বাধ্য হব। দে দেখি, বের কর!' নেবার জন্যে ও হাত বাড়িয়ে দিল।

'মাওজার?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম আমি, 'নিবি? এই নে! তোরা কি আমায় দিয়েছিলি ওটা? বল্, দিয়েছিলি? তবে? যা, ভাগ। নইলে ঘুসি মেরে মুখ পালটে দেব!'

চট করে মাথা ঘুরিয়ে দেখলুম জনা চারেক ছেলে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। তখন বাধা ঠেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ফেদ্‌কা আমার কাঁধ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুসি কষালুম ওকে। তখন অনেকে মিলে আমার কাঁধ চেপে ধরল,

অনেকে জাপটে ধরল আমায়। কে একজন পকেট থেকে আমার হাতটা টেনে বের করে দেবার চেষ্টা করল। তখন আরও জোরে পকেটের মধ্যে পিস্তলটাকে চেপে ধরে রইলুম।

'ওরা পিস্তলটা কেড়ে নেবে... মিনিটখানেকের মধ্যে পিস্তলটা কেড়ে নেবে আমার...'

তারপর ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো বিকট চিৎকার করে উঠে সেই ফাঁকে ঝট করে মাওজারটা বের করে আনলুম। আর বুড়ো আঙুলটা দিয়ে সেফটি ক্যাচ ঠেলে তুলে ট্রিগার দিলুম টেনে।

সঙ্গে সঙ্গে যে চারজোড়া হাত আমায় চেপে ধরে ছিল তারা খসে পড়ল। আর আমি ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে জানলার ওপর উঠলুম। ওখান থেকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল ছাত্রদের ফ্যাকাশে-হয়ে-যাওয়া মুখগুলো, গুলি লেগে চূর্ণবিচূর্ণ মেঝের হলদে টালিটা আর দরজার গোড়ায় বাইবেলের কাহিনীতে বর্ণিত লটের স্ত্রীর লবণস্তম্ভে রূপান্তরিত হওয়ার মতো স্তম্ভিত-হয়ে-থাকা ফাদার গেন্নাদির চেহারাটা। বিনা দ্বিধায় দোতলা সমান উঁচু থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। নামলুম এসে ঝলমলে লাল ডালিয়াফুলের একটা কেয়ারির মধ্যে।

ওই দিন সন্ধের অনেক পরে আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানের দিক থেকে বৃষ্টির জল নামার পাইপ বেয়ে দোতলার জানলায় উঠলুম। বাড়ির কেউ যাতে ভয় না পায় সেজন্যে নিঃশব্দে উঠতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু মা বোধ হয় আওয়াজ শুনে জানলায় এসে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন:

'কে? বরিস?'

'হ্যাঁ, মা, আমি।'

'পাইপ বেয়ে উঠছ কেন? পড়ে যাবে যে। নিচে নামো, দোর খুলে দিচ্ছি।'

'না, মা, থাক। ঠিক উঠে যাব।'

জানলা থেকে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে নেমে মা-র বকুনি আর কান্নাকাটি শোনার জন্যে তৈরি হলুম।

কিন্তু আগের মতোই নিচু গলায় মা বললেন, 'কিছু খাবে? আচ্ছা, বোসো, সুপটা এখনও গরম আছে, তা-ই আনি।'

ভাবলুম, মা বোধ হয় কিছু জানেন না। ওঁকে চুমো দিয়ে টেবিলে বসলুম। কীভাবে ওঁর কাছে খবরটা ভাঙব তাই ভাবতে লাগলুম। বুঝতে পারছিলুম মা-র

চোখ দুটো আমার দিকে আটকে ছিল। ক্রমে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। এক সময় প্লেটের কানায় চামচটা নামিয়ে রাখলুম।

তখন মা কথাটা পাড়লেন, 'ইশকুলের ইন্‌স্পেক্টর এসেছিলেন বাড়িতে। উনি জানালেন তোমাকে ইশকুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আরও বললেন তুই যদি তোর রিভলবারটা কাল বেলা বারোটার মধ্যে স্থানীয় রক্ষী বাহিনীর কাছে জমা না দিস তাহলে ওঁরাই বাহিনীকে ব্যাপারটা জানাবেন আর তারা জোর করে ওটা কেড়ে নিয়ে যাবে... রিভলবারটা দিয়ে দে না, বাবা।'

'না, দেব না,' মা-র চোখের দিকে না তাকিয়ে একগুঁয়ের মতো বললুম, 'ওটা বাবার জিনিস।'

'তো হয়েছেটা কী? তুই ওটা নিয়ে কী করবি? পরে নিজেই আরেকটা কিনে নিতে পারবি'খন। গত কয়েক মাস ধরে তোর যে কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারি না। যেন পাগল হয়ে গেছিস একেবারে। শেষে কোনদিন তোর ওই মাওজার দিয়ে কাকে গুলি করে মারবি! যা বাবা, কাল রক্ষী-বাহিনীকে গিয়ে পিস্তলটা দিয়ে আয়, কেমন?'

'না,' প্লেটটা একপাশে ঠেলে দিয়ে হুড়হুড় করে একগাদা কথা বলে ফেললুম। 'আমি অন্য আরেকটা পিস্তল চাই না, ঠিক এটাই চাই! এটা আর কারো নয়, এটা বাবার। আমি মোটেই পাগল হই নি, মা। আমি তো কারো গায়ে হাত দিচ্ছি না। ওরা সবসময়ে আমার পেছনে লাগে কেন? ইশকুল থেকে আমায় তাড়িয়ে দিল তো ভারি বয়েই গেল। আমিই ছেড়ে দিতুম ইশকুল। পিস্তলটা আমি লুকিয়ে রাখব।'

'পোড়া কপাল আমার!' মা খেপে উঠে বললেন। 'ওরা তোকে গারদে পুরে রাখবে'খন আর পিস্তল না দেয়া পর্যন্ত ছাড়বে না যখন, তখন টের পাবি!'

আমিও চটে উঠলুম, 'তাতে আমার ঘেঁচু হবে। ওরা তো বাস্‌কাকভকেও জেলে পুরে রেখেছে, তাতে হয়েছে কী? রাখুক গে ওরা আমায় যত ইচ্ছে জেলে ভরে, কিছুতেই আমি পিস্তলটা ওদের দেব না, প্রাণ থাকতে না!' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষের কথাগুলো এত জোরে চেঁচিয়ে বললুম যে মা থমকে গেলেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা, দিস্‌ না,' এবার আগের চেয়ে শান্তভাবে বললেন মা। 'আমার কাছে ও সবই সমান।' তারপর কী যেন একটা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে উঠে দরজার দিকে চললেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে খুব তিক্তভাবে বললেন, 'মরার

আগে আরও যে কীভাবে আমার জীবন তোমরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে, কে জানে!'

আমার কথা মা এভাবে মেনে নেয়ায় অবাক হলুম। এটা মোটেই মা-র স্বভাবে ছিল না। এমনিতে আমার ব্যাপারে তিনি বড়-একটা নাক গলাতেন না, কিন্তু একবার যদি তাঁর মাথায় কোনো-কিছু ঢুকত তাহলে তাঁকে ঠেকানো সম্ভব ছিল না।

সে রাত্রে গভীর ঘুমে তলিয়ে রইলুম আমি। স্বপ্নে দেখলুম, তিম্‌কা এসেছে। আমার জন্যে সঙ্গে করে একটা কোকিল উপহার এনেছে। 'কোকিল নিয়ে আমি কী করব, তিম্‌কা?' তিম্‌কা জবাব দিল না। 'কোকিল, কোকিল, বল তো আমার বয়েস?' প্রশ্ন শুনে গুনে-গুনে ঠিক সতেরো বার কুউ-কুউ করে ডাকল ও। আমি বললুম, 'উঁহুঁ, হল না। আমার বয়েস পনেরো।' 'না,' তিম্‌কাটা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'তোর মা তোকে ঠকিয়েছে'। 'দূর, মা আমার ঠকাতে যাবে কেন?' হঠাৎ দেখি, ও মা, তিম্‌কা মোটেই তিম্‌কা নয়, ও তো ফেদ্‌কা। দাঁত বের করে হাসছে ফেদ্‌কাটা।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। মা বাড়ি নেই। এই সুযোগ, কাছে-পিঠে কেউ কোথাও নেই। মাওজারটা তাড়াতাড়ি বাগানে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হয়।

চট করে জামাটা মাথায় গলিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে ট্রাউজার্সটা টানলুম। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। সন্দেহজনকরকম হালকা ঠেকল ট্রাউজার্সটা। খুব সাবধানে, যেন আঙুলে ছ্যাঁকা লেগে যাবে এইভাবে, হাতটা পকেটে গলিয়ে দিলুম। যা ভেবেছি তাই, পকেট খালি। যখন আমি ঘুমোচ্ছিলুম মা তখন নিশ্চয়ই মাওজারটা সরিয়ে ফেলেছেন। 'ওঃ, তাই বল... মা-ও আমার বিরুদ্ধে! আর গতকাল আমি কিনা মাকে বিশ্বাস করেছিলুম। এখন বুঝতে পারছি কেন তিনি গতকাল অত সহজে আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন। মা নিশ্চয় পিস্তলটা স্থানীয় রক্ষী-বাহিনীকে দিতে গেছেন।'

মা-র পেছনে ধাওয়া করব, ঠিক করলুম।

'থাম্! থাম্! থাম্!' ঠিক এই সময়ে বেজে উঠল দেয়াল-ঘড়িটা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘড়ির ডায়ালের দিকে তাকালুম। সত্যি, কে-জানে? তখন সবে সকাল

সাতটা। অত সকালে মা-র পক্ষে কোথায় যাওয়া সম্ভব ছিল? ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, বড় বেতের টুকরিটা ঘরে নেই। তার মানে, মা তখন গিয়েছিলেন বাজারে।

কিন্তু যদি বাজারে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই মাওজারটা সঙ্গে করে নিয়ে যান নি মা। তাহলে? তাহলে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্যে ওটা বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তা কোথায় হতে পারত? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কাবার্ডের ওপর দিকের টানাটায় নিশ্চয়। কারণ ওই একটা টানাই ছিল চাবিবন্ধ।

আমার মনে পড়ল, অনেক দিন আগে একবার মা ওষুধের দোকান থেকে 'করোসিভ সাব্লিমেট'-এর ছোট-ছোট গোলাপী বড়ি কিনে এনে সেগুলো ওই টানায় চাবিবন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। যাতে আমরা ওতে হাত না-দিতে পারি সেজন্যে। আমাদের ছোট্ট কুকুরের একটা থাবা সিমাকভরা ভেঙে দেয়ায় ফেদ্‌কা আর আমি তাদের লালচে বেড়ালটাকে মেরে ফেলার মতলব এঁটেছিলুম। আর কতগুলো ভাঙাচোরা লোহার আবর্জনার মধ্যে হাতড়াতে-হাতড়াতে আমরা তখন একটা চাবি পেয়ে গিয়েছিলুম, যেটা দিয়ে সেবার টানাটা খোলা গিয়েছিল। সে-সময়ে মাত্র একটা বড়ি চুরি করে আমরা চাবিটা ফের যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলুম।

ভাঙাচোরা জিনিসপত্র রাখার ঘরটায় গিয়ে একটা ভারি ড্রয়ার টেনে বের করলুম। টুকরো-টুকরো পুরনো লোহা, নাটবল্টু, স্ক্রু এই সব হাতড়াতে-হাতড়াতে এক-টুকরো টিনে ঘ্যাঁচ করে হাতটা গেল কেটে। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না। হঠাৎ গোটা তিনেক জং ধরা চাবি পেয়ে গেলুম। ভাবলুম, এর মধ্যে একটাতে নিশ্চয়ই টানাটা খুলবে... খুব সম্ভব এই চাবিতেই খুলবে।

কাবার্ডের কাছে ফিরে গিয়ে জোর করে তালার মধ্যে চাবিটা ঢোকালুম। কিছুক্ষণ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করতে করতে হঠাৎ খুট করে তালা গেল খুলে। টানাটা খুললুম। হ্যাঁ, ওই তো আমার মাওজার। আর ওই তো খাপটা আলাদা পড়ে আছে। দুটো জিনিসই উঠিয়ে নিয়ে টানাটা ফের চাবিবন্ধ করে চাবিটা জানলা গলিয়ে বাগানে ফেলে দিলুম। তারপর এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি মা বাজার থেকে ফিরছেন। চট করে মোড় নিয়ে অন্য রাস্তায় চলে এলুম, তারপর কবরখানার দিকে লাগালুম ছুট।

একেবারে বনের ধারে এসে তবে দম নেবার জন্যে দাঁড়ালুম। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে এক জায়গায় জড়-করা শুকনো পাতার ওপর শুয়ে পড়লুম।

মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলুম, কেউ আমার পিছু নিয়েছে কিনা তাই দেখতে। একটা ছোট্ট স্রোত আমার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। জলটা ছিল পরিষ্কার, তবে একটু উষ্ণ আর জলে ছিল শ্যাওলার গন্ধ। না উঠেই হাতের কোষে করে একটু একটু জল নিয়ে খেয়ে ফেললুম। তারপর হাতে মাথা রেখে শুয়ে ভাবতে শুরু করলুম।

এখন কী করা? আবার বাড়ি ফেরা, কিংবা ইশকুলে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। আবার ভাবলুম, কিন্তু বাড়ি ফিরলেই বা ক্ষতি কী... মাওজারটা বাইরে কোথাও লুকিয়ে রেখে তো অনায়াসে বাড়ি ফেরা চলে। মা অবিশ্যি কয়েক দিন একটু রাগারাগি করবেন, তারপর সবকিছু ভুলে যাবেন। আসলে মা-রই তো দোষ, উনি ওভাবে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে মাওজারটা নিতে গেলেন কেন? কিন্তু... কিন্তু যদি রক্ষী-বাহিনীর লোকেরা আসে? যদি বলি পিস্তলটা হারিয়ে গেছে — ওরা বিশ্বাস করবে না। যদি বলি ওটা আমার নয়, তাহলে ওরা জানতে চাইবে, ওটা কার। যদি আমি কোনো কথা না-বলি, ওরা সত্যিই আমায় জেলে ভরে রাখতে পারে! আচ্ছা, ফেদ্‌কাটা কী শয়তান! ধেড়ে ইঁদুর কোথাকার!

বনপ্রান্তের অল্প অল্প গাছপালার ফাঁক দিয়ে তখন রেলস্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল।

'কু-উ-উ-উ!' দূর থেকে রেল-এঞ্জিনের বাঁশির আওয়াজ ভেসে এল। কাঁপা-কাঁপা শাদা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল গাছের মাথা-বরাবর। আর অত দূর থেকে ঠিক যেন গুবরে-পোকার মতো একটা কালোরঙের এঞ্জিন দূরের একটা মোড় ঘুরে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল।

'কু-উ-উ-উ!' ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের বাড়িয়ে দেয়া হাতটাকে বন্ধুর মতো যেন ধরতে আসছে, এমনিভাবে আনন্দে আবার বাঁশি বাজিয়ে দিল এঞ্জিনটা।

'আচ্ছা, আমি যদি...'

আস্তে-আস্তে উঠে বসে আবার ভাবতে শুরু করলুম আমি।

আর যতই ভাবতে লাগলুম রেলস্টেশনটা ততই সজোরে টানতে লাগল আমাকে। এঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়ে, সিগন্যাল গুমটিঘরের টুংটাং আওয়াজ তুলে, প্রায়-ধরা-ছোঁয়া-যায় এমন জ্বলন্ত পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে আর অচেনা দিকসীমায় হারিয়ে-যাওয়া চকচকে লাইনগুলোর লোভানি দিয়ে কেবলই হাতছানি দিতে লাগল।

ভাবলুম, 'নিজনি নভগরোদে যাই। ওখানে দাঁড়কাককে পাওয়া যাবে। উনি তো সরমোভোয় আছেন। আমায় দেখে উনি খুশিই হবেন। নিশ্চয় আমায় ওঁর কাছে থাকতে দেবেন কিছুদিন। তারপর এদিকে সব ঠান্ডা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসব। কিংবা, কে জানে...' মনে হল কে যেন আমার ভেতর থেকে কথা বলে উঠল, 'কে জানে হয়তো আর ফিরবই না।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো,' হঠাৎ শক্ত হয়ে মনস্থির করে ফেললুম। আর নিজের এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ক্রমশ একটু-একটু করে বুঝতে পেরে যখন আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম তখন নিজেকে বেশ বড়সড়, শক্তসমর্থ আর দৃঢ়চিত্ত মনে হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিজনি নভগরোদে ট্রেন এসে পৌঁছল রাত্রে। রেলস্টেশন থেকে বেরিয়েই প্রকান্ড একটা চৌকো চত্বরে এসে পড়লুম। রাস্তার আলো পড়ে একেবারে আনকোরা নতুন রাইফেলের বেয়োনেটগুলো ঝকমক করছে দেখলুম।

চত্বরটায় একজন বেশ লালচে দাড়িওয়ালা লোক সৈন্যদের কাছে বক্তৃতা করছিল। বলছিল, স্বদেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের কথা। 'ঘৃণ্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা' যে অবশ্যই অচিরে পরাস্ত হবে তারও নিশ্চয়তা দিচ্ছিল লোকটি।

বক্তৃতা দিতে-দিতে লোকটি বারবার তার পাশে দাঁড়ানো এক বুড়ো কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছিল। আর কর্নেলটিও তাঁর গোল-মতো টাক-মাথাটা বারবার নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেন ওই লালচে দাড়িওয়ালা বক্তার কথাগুলো যে কত সঠিক তারই সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন।

বক্তাকে মনে হচ্ছিল খুবই পরিশ্রান্ত। কখনও হাতের তেলো দিয়ে বুক থাপড়াচ্ছিল সে, আবার কখনও একটা হাত, কখনও বা দুটো হাতই ওপর দিকে তুলছিল। বারবার আবেদন জানাচ্ছিল সৈনিকদের বিবেকের কাছে। শেষের দিকে ওর বোধহয় ধারণা হল, ওর বক্তৃতা সেই পাঁশুটে রঙের জমাট বাঁধা জনতার মর্মভেদ করতে পেরেছে। তাই হঠাৎ একটা হাত পাশের দিকে ছুড়ে তারপর একটা চক্কর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে একেবারে গলা ছেড়ে 'মার্সাই' জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে শুরু করে দিলে। হাতটা ঘোরানোর সময় বেশ একটা মজা হল। পাশে দাঁড়ানো কর্নেল বক্তার হঠাৎ এই উচ্ছ্বাস দেখে চমকে উঠে চট করে সরে যাওয়ায় তাঁর কানটা বক্তার

চপেটাঘাত থেকে অতি অল্পের জন্যে বেঁচে গেল। যাই হোক, গান শুনে এদিকে ওদিকে জনা কুড়ি কি জনা চল্লিশ লোক তার সঙ্গে গলা মেলাল। বাকি সবাই বেবাক চুপ করে রইল।

এরপর লালচে দাড়িওয়ালা বক্তাটি হঠাৎ গান থামিয়ে মাথার টুপিটা সোজা মাটিতে ছুড়ে দিল। তারপর মঞ্চ থেকে পড়ল নেমে।

বুড়ো কর্নেল আর কী করেন! অসহায়ের ভঙ্গিতে হাত দুটো দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটি নিচু করে তিনিও মঞ্চের সিঁড়ির রেলিঙ ধরে ধরে নেমে পড়লেন।

শুনলুম, এই সৈন্যদল হচ্ছে নতুন রঙরুট। শক্তিবৃদ্ধির জন্যে জার্মান ফ্রণ্টে নাকি ব্যাটালিয়নটাকে পাঠানো হচ্ছে।

সৈন্যরা এরপর কুচকাওয়াজ করে গান গাইতে-গাইতে স্টেশনে ঢুকল। আর দু-পাশ থেকে ওদের দিকে ফুলের তোড়া আর নানান উপহার ছোড়া হতে লাগল। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে ওরা পৌঁছনো পর্যন্ত সবই চলল ভালোভাবে। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল কোথাও কারো একটা ভুলের জন্যে সকলের চা খাওয়ার উপযুক্ত গরম জল তৈরি নেই আর কয়েকটা মালগাড়ির কামরায় বিছানা পাতার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে তক্তার বন্দোবস্ত হয়ে ওঠে নি। ফলে অসন্তুষ্ট সৈন্যরা ওইখানেই একটা জমায়েত ডেকে ফেললে।

জমায়েতে কর্তৃপক্ষের অননুমোদিত সব বক্তাকে দেখা গেল। চায়ের অসুবিধের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করে শেষপর্যন্ত সারা ব্যাটালিয়নটা হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল: 'আর না, যথেষ্ট হয়েছে। দেশগাঁয়ে খেতখামার সব নষ্ট হয়ে গেল গিয়ে, জমিদারদের জমি এখনও ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হল নি, খালি যুদ্ধ-যুদ্ধ করে আমরা জ্বালাতন হয়ে গেলাম!'

বেরিয়ে দেখি আগুন পোহানোর জন্যে এখানে ওখানে কুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। বাতাস ম-ম করছে চেরা কাঠের আঠার গন্ধে, মাখোরকা তামাক, কাছের স্টিমারঘাটায় জড়ো-করে-রাখা শুঁটকি মাছের গন্ধে আর ভলগা নদীর স্বচ্ছ সুবাতাসের সুবাসে।

দেখে শুনে উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত হয়ে ওই সব অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়ে, রাইফেল আর উত্তেজিত সৈন্যদের পেরিয়ে, চিৎকার-করা সব বক্তা আর আতঙ্কিত, ক্রোধোন্মত্ত সামরিক অফিসারদের পেছনে ফেলে রেলস্টেশনের সংলগ্ন অপরিচিত সব রাস্তার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললুম আমি।

৮*

প্রথম যে রাস্তার লোকটিকে সরমোভো যাওয়ার পথ জিজ্ঞেস করলুম সে একটু অবাক হয়েই বললে:

'আরে ইয়ার, এখেন থেকে হে'টে সরমোভো যাওয়া যায় না। নোকে ইস্টিমারে চেপে যায়। পঞ্চাশ কোপেক দাম নাগে ইস্টিমারে চাপতে, বুয়েছ? তবে এখন তো যেতি পারবে না, সকাল পর্যন্ত ওপিক্ষে করতি হবে।'

আরও কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে এক জায়গায় একটা পাঁচিলের গায়ে জমা-করা বড় বড় খালি প্যাকিং বাক্স দেখে তারই একটাতে ঢুকে পড়লুম। ভাবলুম, সকাল পর্যন্ত ওইখানে বসেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু বসে বসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে।

হঠাৎ গান শুনে আমার ঘুম ভাঙল। মনে হল, মজুররা ভারি কিছু একটা তুলতে তুলতে গান জুড়েছে।

সাবাস, জোয়ান, হে'ই-ও।

ভাঙা, কিন্তু বেশ মিষ্টি চড়া গলায় কে একজন আগে আগে গাইছে। আর অন্য সবাই দোহার ধরছে কর্কশ গলায়:

হাত লাগাও, জোর হাত লাগাও।

প্রচণ্ড আওয়াজ করে এবার কী যেন নড়ে উঠল।

হেই... মারো ঠেলা,
সব ঠিক হ্যয়,
কুত্তি তব ভি বৈঠা হ্যয়।

বাক্স থেকে এবার মাথা বের করলুম। দেখলুম, যবের রুটির টুকরোর চারপাশে পিঁপড়েরা যে ভাবে ঘিরে দাঁড়ায় সেইভাবে মজুররাও প্রকাণ্ড একটা মরচে-ধরা কপিকলকে ঘিরে ধরে গড়ানো লোহার পাতের ওপর দিয়ে একটা মস্ত খোলা মালগাড়ির ওপর সেটাকে টেনে তুলছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা মূল গায়েন এই সময়ে ফের শুরু করল:

হেই... মাথসে ভাগ রহা নিকোলাই,
হেই... উসিসে ফায়দা কা উঠা ভাই।

আবার একটা ঝনঝন আওয়াজ উঠল।

আ যা, ভেইয়া, বান্ধ লে কোমর,
দরিয়ামে ডাল দে আলেকস্কো লে কর্।

এরপর আবার একটা ঝন আর তারপর ধুপ করে একটা জোর আওয়াজ। দেখি, দুম্বো কপিকলটা এবার মালগাড়ির ওপর চেপে বসেছে। গান থেমে গিয়ে এবার একটা হল্লা উঠল, অনেকে একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে, কথা বলছে, দিব্যি গালছে।

'হ্যাঁ, গান বটে একখানা!' মনে মনে ভাবলুম। 'কিন্তু ওই আলেক্টা কে আবার? কে আর হবে, নিশ্চয়ই কেরেন্স্কি! আর্জামাসে অবিশ্যি অমন গান গাইলে আর দেখতে হত না, সঙ্গে সঙ্গেই পুলিপোলাও চালান হয়ে যেত। এখানে কিন্তু স্থানীয় রক্ষী-বাহিনীর লোক দিব্যি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কিছুটি কানে যাচ্ছে না।'

নোংরা পুঁচকে স্টিমারটা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল স্টিমার-ঘাটায়। স্টিমার ভাড়া পঞ্চাশ কোপেক আমার সঙ্গে ছিল না, এদিকে স্টিমারে ওঠার সরু পথটার মুখে পাহারা দিচ্ছে একজন টিকিট কালেক্টর আর রাইফেল কাঁধে এক মাল্লা।

অসহায় ক্ষোভে আঙুল কামড়ে একান্ত দুঃখে দাঁড়িয়ে রইলুম স্টিমারঘাটার একপাশে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্টিমারঘাটা আর স্টিমারের মধ্যে কলকলিয়ে বয়ে-যাওয়া তেলভাসা জলটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলুম। তরমুজের খোসা, কাঠের কুচি, খবরের কাগজের টুকরো আর আরও সব জঞ্জাল জলে ভেসে যাচ্ছিল, তাই দেখছিলুম।

'আচ্ছা, টিকিট কালেক্টরের কাছে একবার বলে দেখলে হয় না?' মনে মনে ভাবছিলুম। 'যদি গপ্পো বানিয়ে বলি, আমি বাপ-মা মরা অনাথ ছেলে, বা ওই রকম কিছু? যদি বলি, অসুস্থ দিদিমাকে দেখতে যাচ্ছি? মশাই, দয়া করে যদি বুড়ো ভদ্রমহিলাকে একটু দেখতে যেতে দেন! তাহলে, কী হয়?'

তেলভাসা ঘোলা জলে আমার রোদে-পোড়া মুখখানার ছায়া পড়েছে, দেখতে পাচ্ছিলুম। ছোট-করে-ছাঁটা চুলসুদ্ধ বড়সড় একটা মাথা আর ইশকুলের টিউনিকের চকচকে পেতলের বোতামগুলোর ছায়া দুলছিল জলে।

নিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, নাঃ বাপ-মা-মরা ছেলের ও-সব গপ্পো চলবে না। অনাথ ছেলের এমন গোলগাল মুখ দেখে মোটেই কেউ বিশ্বাস করবে না।

বইয়ে পড়েছি, কত ছেলে কপর্দকশূন্য অবস্থায় জাহাজে খালাসির কাজ করেও দেশবিদেশ পাড়ি দেয়। কিন্তু এখানে ওই কায়দা খাটবে না, আমাকে শুধু নদী পার হতে হবে।

'বলি, এখেনে কী কাজ তোমার? সরো, সরো!' পেছনে কার কাপ্তেনি গলা শুনে ফিরে দেখি মুখে-বসন্তের-দাগওয়ালা ছোট্ট একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা বাক্সের ওপর একগোছা ইস্তাহার ছুড়ে ফেলে ছেলেটা আমার পায়ের তলা থেকে চট করে মোটা, নোংরা একটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিল।

'এঃ, আচ্ছা জবুথবু তো!' বলে উঠল ছেলেটা। 'এমন সিগারেটের টুকরোটা পেলে না তো?'

জানালুম, সিগারেটের টুকরোর জন্যে আমার প্রাণটা এমন কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে না, কারণ আমি সিগারেটই খাই না। পরে পালটা প্রশ্ন করলুম, ওখানে ওর কী কাজ।

'কার? আমার?' বলেই ছেলেটা জলে-ভেসে যাওয়া একটা চেলাকাঠের ঠিক মধ্যিখানে নিখুঁতভাবে থুথু ফেললে। 'আমাদের কমিটির ইস্তেহার বিলি করচি আমি।'

'কোন কমিটির?'

'কোন কমিটি আবার? শ্রমিকদের কমিটি। তুমিও বিলি করবে?'

'করতুম, কিন্তু এখন যে আমায় সরমোভো যেতে হবে। এদিকে আমার টিকিট নেই।'

'সরমোভোয় তোমার দরকারটা?'

'মামার কাছে যাব। মামা ওখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে।'

'খুব খারাপ,' ছেলেটা ধমকের সুরে বললে, 'পকেটে এট্টা পয়সা নেই আর উনি এসেছেন মামার সঙ্গে মোলাকাত করতি!'

'পয়সা নিতে সময় পাই নি, ভাই! ব্যাপারটা হঠাৎই হল কিনা — বাড়ি থেকে আমি পালিয়ে এসেছি।' কথাগুলো হুড়মুড় করে পেট থেকে বেরিয়ে গেল।

'সত্যি? সত্যি বলচ?' খানিকটা অবিশ্বাস আর খানিকটা কৌতূহল নিয়ে ছেলেটা আমার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শোঁ করে একটা

নিশ্বাস টেনে সহানুভূতির সঙ্গে বললে: 'বাড়ি ফিরলি বাবার হাতে যা একচোট খাবে না।'

'বাড়ি আমি আর ফিরছি না। তাছাড়া, আমার বাবাই নেই। জারের আমলে তাঁকে ওরা খুন করেছে। আমার বাবা বলশেভিক ছিলেন কিনা।'

'আরে, আমার বাবাও তো বলশেভিক,' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছেলেটা বললে, 'তবে আমার বাবা বেঁচে আছে। জানো, আমার বাবা না মস্ত নোক, সরমোভোয় আমার বাবার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। ওখেনে গিয়ে যারে খুশি শুধোও — 'পাভেল কোরচাগিন কোথায় থাকেন?' আর অমনি সে কবে: 'ও, কমিটির কথা কচ্চ? তা, ভারিখায় তের-আকোপভের কারখানায় চলি যাও'। বুঝলে মশায়, আমার বাবা ওইরকম নোক!'

কথাটা শেষ করেই সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনবরত-পিছলে-নেমে-আসা ট্রাউজার্সটা ও টেনে তুলল, তারপর এক দৌড়ে মিশে গেল ভিড়ে। এদিকে ইস্তাহারগুলো পড়ে রইল আমার পাশে।

একটা ইস্তাহার কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখলুম। তাতে লেখা রয়েছে, কেরেন্স্কি বিশ্বাসঘাতক। প্রতিবিপ্লবী জেনারেল কর্নিলভের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চলেছে সে। ইস্তাহারটায় খোলাখুলি অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করার আর সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করার ডাক দেয়া হয়েছিল।

সকালবেলায় শোনা মজুরদের দুঃসাহসিক গানের চেয়েও ইস্তাহারের এই চড়া সুর আমায় অবাক করে দিল। হঠাৎ সেই ছেলেটা আবার কোত্থেকে এসে উদয় হল। মজুত করা হেরিং মাছের পিপেগুলোর আড়াল থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললে, 'নাঃ, সুবিধে হল না, ইয়ার!'

'কিসের?' অন্যমনস্কভাবে আমি বললুম।

'পঞ্চাশ কোপেক যোগাড়ের অনেক চেষ্টা করলাম। সিমন কোত্লিকিন — ওই-যে আমাদেরই দলের নোক — ওর কাছে চাইলাম। তা ও কইল ওর কাছে অত কোপেক হবে না।'

'পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে কী হবে?'

'বা-রে, তুমি চাইলে না তখন?' আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ও। 'পঞ্চাশ কোপেক পেলি তুমি টিকিট কেটে সরমোভো যেতি পারবে। তারপর ওখেনে গিয়ে

মামার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আমারে ফেরত দিও'খন। আরে, আমিও তো সরমোভোরই নোক।'

আবার একবার উধাও হয়ে গিয়ে এবার তাড়াতাড়ি ফিরল ও।

'টিকিট ছাড়াই চলবে, বুইলে ইয়ার। আমার ওই ইস্তাহারগুলো নিয়ে সোজা ইস্টিমারে উঠে যাও দিকি। রাইফেল-কাঁধে মাল্লারে দেখছ তো, উই যে দাঁড়িয়ে আছে? ওর নাম, পাশকা সুরকভ। ইস্টিমারে ওঠার পথে ওর দিকে তাকিয়ে কইবে, এই ইস্তেহারগুলো কমিটির কাছে নিয়ে যাচ্ছি। টিকিটবাবুর সঙ্গে কিন্তু একদম কথা কোয়ো না, কেমন? যাও, সিধে চলে যাও। মাল্লাটি আমাদেরই নোক। কিছু হলে ও-ই তোমারে সাহায্য করবে।'

'আর তুমি?'

'আমি যে করি হোক চলে যাব'খনি, ইয়ার। আমি তো এখেনকারই নোক, নাকি?'

আদ্যিকালের ইস্টিমারটা নোংরায় থিকথিক করছিল। ফলের খোসায়, তুষ-ভুসিতে আর আপেলের চোষা ছিবড়েয় চারিদিক একেবারে থইথই করছিল। অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছিল স্টিমারটা, কিন্তু তখনও আমার সঙ্গীর দেখা নেই।

এক জায়গায় স্তূপ-করে-রাখা নোঙরের মরচে-ধরা শেকলের ওপর বসার জায়গা করে নিলুম। আপেল, পেট্রোল আর মাছের গন্ধে-ভরা ঠাণ্ডা বাতাসে নিশ্বাস নিতে-নিতে স্টিমারের যাত্রীদের ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলুম। আমার পাশেই বসে ছিলেন একজন পাদ্রি — তিনি ডীকন না সন্ন্যাসী ঠিক ধরা যাচ্ছিল না — খুব শান্তভাবে, যেন নিজেকে অদৃশ্য রাখতে পারলেই বাঁচেন এমনি ভাবে তিনি বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে চোরা-চাউনিতে চারদিক ঠাহর করছিলেন আর তরমুজের ফালিতে কামড় বসিয়ে খেতে-খেতে বিচিগুলো সাবধানে নিজের হাতে রাখছিলেন।

সন্ন্যাসী ছাড়া কাছাকাছি কয়েকজন চাষী মেয়েও বসে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল দুধের খালি পাত্র কয়েকটা। আর ছিল দু-জন সামরিক অফিসার আর জনাচারেক রক্ষী-বাহিনীর লোক। ওদের ওপাশে-বসা হাতে লাল কাপড়ের পট্টি-বাঁধা একজন বেসামরিক নাগরিকের থেকে ওরা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে বসেছিল।

স্টিমারের যাত্রীদের বাকি সবাই ছিলেন শ্রমিক। দলে দলে ভাগ হয়ে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে জোরে-জোরে আলাপ করছিলেন। তর্ক, দিব্যিগালা, হাসিঠাট্টা আর খবরের কাগজ থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শুনিয়ে

আসর মাত করে রেখেছিলেন তাঁরা। মনে হচ্ছিল, ওঁরা সকলেই সকলের পরিচিত। যেভাবে অন্যের তর্কের মধ্যে মাথা গলিয়ে একেক জন মতামত দিচ্ছিলেন, তাতে এইরকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। স্টিমারের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত ওঁদের মধ্যে টিপ্পনী আর রসিকতা নিয়ে লোফালুফি চলছিল।

সামনে সরমোভো দেখা দিল। বাতাস-চলাচল-বন্ধ গুমোট ওই সকালবেলাটায় সরমোভোর কলকারখানার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্টিমার থেকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চিমনির পাথরের গাছের গুঁড়ির মাথায় কালো ধোঁয়ার ডালপালা ছড়ানো।

'এই!' পেছন থেকে আমার নতুন বন্ধুর চেনা গলা শোনা গেল।

ওকে দেখে খুশি হলুম। কারণ, সরমোভোতে নেমে ইস্তাহারগুলো নিয়ে যে কী করব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

আমার পাশে শেকলগুলোর ওপর বসে ও পকেট থেকে একটা আপেল বের করে আমায় দিল।

'আরে, ধরো, ইয়ার! মজুররা আমারে এক টুপি-ভরতি করে দিয়েছিল। যখনই কোনো নতুন ইস্তেহার কি খবরকাগজ বেরোয় আমি ওদের কাছেই পেরথম যাই কিনা, তাই। গতকাল তো ওরা আমায় পুরা এক থোলো ভোবলা* দিয়েছিল। আরে, ওদের আবার পয়সা লাগে ন্যাকি? সোজা বস্তায় হাত পুরি তুলে আনলেই হল। তা, তিনটে মাছ তো আমি লিজেই খেয়ে লিলাম আর বাকি দুটো বাড়ি লিয়ে গেলাম আন্‌কা-মান্‌কার জন্যি।' পরে মাতব্বরির ঢঙে বুঝিয়ে বলল: 'আমার দুটো বোন। আন্‌কা-মান্‌কা। বোকা, পুঁচকে দুটো ব্যাঙ। সব সময়ে খালি খাইখাই করে।'

ওর একনাগাড়ে কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দেখলুম, লাল পট্টিধারী বেসামরিক লোকটি রক্ষী-বাহিনীর লোকজন সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। শ্রমিকরা নিঃশব্দে নিজের-নিজের দোমড়ানো কোঁচকানো তেলচিটে কাগজগুলো বের করে দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিরুদ্ধ মন্তব্যও করতে লাগলেন।

'কারে খুঁজচে, দোস্ত?'

---

* ভোবলা — নুনে জারানো একরকম শুঁটকি মাছ। — সম্পাঃ

'শয়তান জানে কারে!'

'আহা, সরমোভোয় এসে একবার তল্লাসি করে! দেখার বড্ড সাধ।'

রক্ষী-বাহিনীর লোকেদের এ ব্যাপারে অনিচ্ছুক মনে হল। বিশ-পঁচিশ জোড়া সন্দেহ-ভরা, সতর্ক চোখের তীক্ষ্ন চাউনির সামনে তারা স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছিল।

সকলের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব দেখেও না দেখার ভান করে বেসামরিক লোকটা উদ্ধত ভঙ্গিতে ভুরু তুলে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ন্যাসীঠাকুর এতে আরও যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলেন। তিনি দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর গলায় চেইন-দিয়ে-ঝোলানো একটা ছোট ঘটি দেখিয়ে দিলেন। ওই ঘটিতে লেখা ছিল: 'ধর্মভীরু খ্রিস্টিয়ানগণ, জার্মানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভজনালয়গুলি পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে দান করুন'।

বেসামরিক লোকটা একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরে এল। তারপর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য না করেই আমার সঙ্গীকে কাঁধ ধরে টেনে তুলল।

'পরিচয়-পত্র?'

'সে তো বড় হলি, তখন!' ছেলেটা সংক্ষেপে জবাব দিল।

বেসামরিক লোকটার হাত থেকে নিজের কাঁধ দুটো ছাড়ানোর চেষ্টায় ছেলেটা দেহটাকে দুমড়ে-মুচড়ে তুলল। কিন্তু ওই করতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে জামার ভেতর থেকে একগোছা ইস্তাহার ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

একটা ইস্তাহার কুড়িয়ে নিয়ে বেসামরিক তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল। তারপর চাপা, ক্রুদ্ধ গলায় বললে:

'পরিচয়-পত্র দেখাবার বেলা বাচ্চা ছেলে, কিন্তু প্রচার-ইস্তাহার বিলোবার বেলা বড়ই লায়েক, না? গ্রেপ্তার কর!'

কিন্তু বেসামরিক একাই যে প্রচারপত্র কুড়িয়ে নিয়ে পড়েছিল তা নয়। ছড়িয়ে-পড়া গোছাটা থেকে হাওয়ায় ডজনখানেক কি তারও বেশি ইস্তাহার ভিড়ে-ভরতি ডেকের এদিক-ওদিক ছিটিয়ে গিয়েছিল। নিস্পৃহ, হতভম্ব রক্ষী-বাহিনীর লোকজন আমার সঙ্গীর গায়ে হাত দেয়ার আগেই সারা ডেকটা যেন মৌচাকের গুনগুনানিতে ভরে উঠল।

'আচ্ছা, নোকটা কর্নিলভের খোঁজ করছে না কেন কও দেখি?'

'সন্ন্যাসীর পরিচয়-পত্তর লিয়ে তো মাথা ঘামাও নি বাপু? বাচ্চাটারে ছেড়ে দাও না কেন?'

'ভেবেচ কি বাপু, এটা শহর লয়, এ সরমোভো।'

'এ্যাই, চোপ, ফ্যাচফ্যাচ বন্ধ করো!' বেসামরিক খিঁচিয়ে উঠল। আর একটু বিব্রত হয়ে রক্ষী-বাহিনীর লোকেদের দিকে তাকাতে লাগল।

'আরে, যা-যা, নিজেই চুপ থাক দেখি! চোরা-গোয়েন্দা কোথাকার! নোকটা ইস্তেহারগুলোর ওপর কীভাবে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল দেখলে?'

এক টুকরো কাটা শশা এইসময়ে বেসামরিকের কান ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে গেল।

চারিদিক থেকে যাত্রীরা ভিড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় রক্ষী-বাহিনীর লোকেরা ভয় পেয়ে চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে বুঝিয়ে বলতে লাগল:

'অ্যাই, হটো, হটো, পিছু হটো! অ্যাই, চুপ, চুপ, নাগরিকবৃন্দ, চুপ কর!'

হঠাৎ একটা কান-ফাটানো সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। ক্যাপ্টেনের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কে একজন পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল:

'বাঁদিক থেকে সরে দাঁড়ান! বাঁদিক থেকে সরে দাঁড়ান! নইলে স্টিমার উলটে যাবে!'

অল্প কাত-হয়ে-যাওয়া বাঁ দিক থেকে স্টিমারের উলটো দিকে ছুটল জনতা। এই সাময়িক হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে বেসামরিক লোকটা রক্ষী-বাহিনীর লোকজনকে বাপান্ত করতে করতে ওপরের ব্রিজে ওঠবার মইয়ের মুখটায় সরে গেল। সেখানে তখন ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখে উত্তেজিত অবস্থায় সেই দুই অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল।

অবশেষে স্টিমার সরমোভোয় নোঙর করল। শ্রমিকরা আগেভাগে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। পাড়ে নামবার পর দেখলুম, বন্ধুটি কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ দুটো চকচক করছে, দোমড়ানো ইস্তাহারগুলো দুহাতে বুকে চেপে ধরে আছে ও।

যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেল, 'এসি আমার সঙ্গে দেখা করবি কিন্তু! সোজা ভারিখায় চলি যাস, গিয়ে ভাস্‌কা কোরচাগিনের বাসা জিজ্ঞেসা করবি। সব্বাই কয়ে দেবে।'

ধোঁয়ায় আর ঝুল-কালিতে কালো-হয়ে-থাকা ছোট্ট-ছোট্ট বাড়িগুলোর দিকে অবাক হয়ে আর কিছুটা কৌতূহল নিয়েও তাকাতে-তাকাতে পথ হাঁটছিলুম। দেখছিলুম কারখানাগুলোর পাথরের দেয়াল, আর তার মধ্যে বসানো অন্ধকার জানলাগুলোর ভেতর দিয়ে নজরে আসছিল লাফিয়ে-লাফিয়ে-ওঠা আগুনের উজ্জ্বল শিখা আর বন্দী যন্ত্রদানবের চাপা গর্জন।

কারখানাগুলোয় ঠিক তখনই দুপুরের খাওয়ার ছুটি হচ্ছে। পাহাড়-প্রমাণ গাড়ির চাকায় ভরতি কয়েকটা খোলা মালগাড়িকে টেনে একটা এঞ্জিন আমার পাশ দিয়ে আড়াআড়িভাবে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। যাবার সময় এঞ্জিনটার পাশ থেকে হঠাৎ ফোঁস-করে ধোঁয়া বেরুনোয় রাস্তার কুকুরগুলো ভয় পেয়ে গেল। কারখানাগুলোয় ভোঁ বাজতে লাগল নানান সুরে। কারখানার গেটগুলো দিয়ে ঘাম-চপচপে ক্লান্ত শরীর নিয়ে হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে লাগলেন শ্রমিকরা।

আর দলে দলে বাচ্চারা খালি পায়ে, হাতে খাবার আর বাসনকোসনের ছোট-ছোট পুঁটলি ঝুলিয়ে ওঁদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। পুঁটলিগুলো থেকে পেঁয়াজ, টক, বাঁধাকপি আর ভাপের গন্ধ উঠছিল।

অনেকগুলো আঁকাবাঁকা সরু-সরু রাস্তা পার হয়ে অবশেষে দাঁড়কাক যে-রাস্তায় থাকতেন সেখানে এসে পেঁছিলুম।

নম্বর মিলিয়ে একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ির জানলায় টোকা দিলুম। হাড্ডিসার পাকাচুলো এক বুড়ি কাপড় কাচতে-কাচতে গামলাটার কাছ থেকে উঠে এসে, জানলা দিয়ে টকটকে লাল মুখ বাড়িয়ে খরখরে গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাই।

বললুম।

'ও তো আর এখেনে থাকে না। অনেক দিন চলি গেচে।' বলেই আমার মুখের ওপর দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

বাড়িটা ছাড়িয়ে এসে মোড় ফিরেই খোয়াপাথরের একটা স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লুম। খবরটা শুনে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, অসম্ভব ক্লান্ত আর অসম্ভব ক্ষুধার্ত আমি। দাঁড়াতে পারছি না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

সরমোভোয় আর একটি লোককেই আমি জানতুম। তিনি হলেন নিকোলাই-মামা, আমার মা-র ভাই। কিন্তু তিনি যে কোথায় থাকেন, কোথায় কাজ করেন, কিংবা আমাকেই-বা কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন তিনি, তার কিছুই জানতুম না।

এরপরও কয়েক ঘণ্টা সরমোভোর রাস্তায়-রাস্তায় প্রতিটি পথচারীর মুখের দিকে ভালো করে ঠাহর করে নিকোলাই-মামাকে খুঁজে বেড়ালুম। কিন্তু কোথায় নিকোলাই-মামা? তাঁর টিকিটিরও সন্ধান পেলুম না।

অসম্ভবরকম একা, পরিত্যক্ত আর অসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে। অবশেষে মাছের আঁশ-ছড়ানো আর বৃষ্টিতে হলদে-হয়ে-যাওয়া চুনে-ঢাকা এক টুকরো ঘাসের জমিতে বসে পড়লুম। তারপর ওখানেই শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে আমার ওই অবস্থা আর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলুম।

আর যতই ভাবতে লাগলুম দুঃখে ততই মনটা ভরে উঠতে লাগল, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসাটাও তত অর্থহীন ঠেকতে লাগল।

তবু, তা সত্ত্বেও, আর্‌জামাসে আবার ফিরে যাওয়ার চিন্তাটা মনে স্থান দিলুম না। মনে হল, ফিরে গেলে সেখানে আমি আরও একা হয়ে যাব। তাহলে তুপিকভকে যেমন সকলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল আমাকেও তেমনই করবে। মা মুখে কিছু বলবেন না বটে, কিন্তু মনে-মনে ভারি কষ্ট পাবেন। আর আমি যতদূর তাঁকে চিনি, তিনি নির্ঘাত ইশকুলে গিয়ে আমাকে আবার ভর্‌তি করে নেবার জন্যে হেডমাস্টারমশাইকে সাধাসাধি করবেন।

না, তা কিছুতেই হবে না। এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব। আর্‌জামাসে থাকতে সত্যিকার সবল প্রবল জীবনকে আমাদের শহরের পাশ ঘেঁষে ট্রেন ছুটিয়ে, চারিদিকে আগুনের ফুল্‌কি আর ধ্বকধ্বকে আলোর ফোয়ারা ছাড়িয়ে যেতে দেখেছি। তখন আমার মনে হয়েছে, আমাকে শুধু একটু কষ্ট করে যে-কোনো একটা ছুটন্ত কামরার সিঁড়িতে লাফিয়ে উঠতে হবে। কোনো-রকমে একটু পা রাখার জায়গা হলেও চলবে আমার। আর হাতলটা চেপে ধরতে পারলেই কেউ আমায় ঠেলে আবার ফেলে দিতে পারবে না।

একজন বুড়ো লোক একসময় জমিটার ধারে বিজ্ঞাপনের বোর্ডটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর হাতে ছিল একটা বাল্‌তি, একটা বুরুশ আর কতগুলো গোটানো প্রাচীরপত্র। বিলবোর্ডের গায়ে ঘন করে আঠা মাখিয়ে উনি একখানা প্রাচীরপত্র তার

ওপর সেঁটে দিলেন, তারপর হাত বুলিয়ে কাগজের ভাঁজগুলো দিলেন সমান করে। তারপর বাল্‌তিটা মাটিতে নামিয়ে আমায় ডাকলেন।

'বাচ্চা, আমার পকেট থেকে মাচিস্‌টা বের কর দিকি — হাত এক্কেবারে আঠায় মাখামাখি। বহুত্‌ আচ্ছা।' দেশালাই বের করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে ওঁর পাইপের মুখে ধরাতে বললেন উনি।

পাইপ ধরে ওঠার পর নিচু হয়ে বাল্‌তিটা তুলতে গিয়ে ঘোঁত্‌ করে করে মুখে একটা আওয়াজ করলেন উনি। হেসে বললেন:

'আহ্‌, বুঝেছ কিনা, এই বুড়ো বয়েসটা বড় আরামের নয়! এককালে সব-সেরা মজুরদের সঙ্গে কামারশালের মস্ত ভারি হাতুড়ি পিটতাম। আর এখন কিনা এট্টুখানি বাল্‌তি বইলেই হাত ভারি হয়ে ওঠে।'

বললুম, 'বাল্‌তিটা আমি বয়ে দেব, ঠাকুদ্দা? আমার হাতে ভারি হবে না। গায়ে খুব জোর আমার।'

আর পাছে বুড়ো মানুষটি রাজী না হন সেই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি বাল্‌তিটা টেনে নিলুম।

বুড়ো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, ইচ্ছে হলি বইতে পার। কাজটা তাইলে তাড়াতাড়ি হয়।'

বেড়ার ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে বহু রাস্তা পার হলুম আমরা।

আর যখনই আমরা থামতে লাগলুম, আমাদের পেছনে পথচারীদের ভিড় জমে যেতে লাগল। সকলেই উদ্‌গ্রীব আমরা কী পোস্টার লাগাচ্ছি তাই দেখবার জন্যে। কাজটায় বেশ মন বসে যেতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা দিব্যি ভুলে গেলুম। যে-পোস্টারগুলো লাগাচ্ছিলুম আমরা, তাতে নানা রকমের স্লোগান লেখা ছিল। যেমন, একটাতে লেখা ছিল: 'আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা ঘুম, আট ঘণ্টা বিশ্রাম'। সত্যি কথা বলতে কী, এই ধরনের স্লোগান আমার কাছে কিছুটা গদ্যময় আর নীরস মনে হয়েছিল। বরং টকটকে লাল অক্ষরে মোটা মোটা করে নীল কাগজে লেখা পোস্টারটার আবেদন ছিল আমার কাছে ঢের বেশি। সেটাতে লেখা ছিল: 'অস্ত্র-হাতে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই পারে সমাজতন্ত্রের সমুজ্জ্বল রাজত্ব ছিনিয়ে আনতে'।

সুদূর অচিন্‌ দেশের যে-মোহিনী মায়া মেইন্‌ রীডের গ্রন্থাবলীর তরুণ পাঠকপাঠিকার মন ভোলাত তার চেয়ে পাগল-করা সৌন্দর্যের বিচারে প্রলেতারিয়েতের

ছিনিয়ে নেয়ার অপেক্ষায় ছিল যে-'সমুজ্জ্বল রাজত্ব' তার আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেশি দুর্বার ঠেকল। মেইন্ রীডের অচিন্ দেশ যত সুদূরই হোক, মানুষ ওরিমধ্যেই তাদের আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আর ইশকুলের নীরস ম্যাপে তাদের ভাগ-ভাগ করে ছকে দেখানো ছিল। কিন্তু পোস্টারে সেই-যে 'সমুজ্জ্বল রাজত্ব'-এর কথা বলা হয়েছিল, তা তখনও পর্যন্ত কেউ জয় করতে পারে নি। সেই রহস্যময় দেশে কোনো মানুষের পা পড়ে নি তখনও পর্যন্ত।

হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে বুড়ো মানুষটি বললেন:

'তোর বোধহয় ক্লান্তি লাগছে, না ব্যাটা? যা, তুই বাড়ি যা। আমি একাই পারব'খন।'

ভাবলুম, এখুনি তো আবার সেই একা পড়ে যাব। বললুম, 'না-না, আমার একটুও ক্লান্তি লাগছে না।'

'তবে, ঠিক আছে,' বুড়ো বললেন, 'দেখিস ব্যাটা, বাড়ি গেলে কেউ তোরে বকবে না তো?'

হঠাৎ কেমন সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে হল। বললুম, 'আমার তো বাড়ি নেই। মানে, বাড়ি আছে তবে সে অনেক দূরে।'

আর, একবার বলতে শুরু করলে মনের কথা চেপে রাখা মুশ্‌কিল। বুড়োকে একে একে সব কথাই বলে ফেললুম।

বুড়ো মন দিয়ে সব কিছু শুনলেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে, একটু যেন কৌতুক নিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারও পরে শান্তভাবে বললেন, 'তাইলে তো খুঁজে দেখতি হয়। সরমোভো মস্ত জায়গা তো। তা, জলজ্যান্ত একটা মানুষও কিছু খড়ের গাদায় ছুঁচ লয়। খুঁজে বের করাই যায়। কী কইলে, তোমার মামা ফিটার, তাই না?'

শুনে একটু আশা হল। খুশি হয়ে বললুম, 'তাই তো শুনেছি। ওর নাম নিকোলাই। নিকোলাই দুব্রিয়াকভ। বাপির মতো ও-ও নিশ্চয়ই পার্টির লোক। কমিটির লোক নিশ্চয়ই ওকে চেনে?'

'উঁহু, চিনি বলে তো মনে লিচে না। যা হোক, পোস্টার মারা শেষ হলি তুই আমার সঙ্গে আসিস, কেমন? দেখি, একবার আমাদের মানুষজনেরে জিজ্ঞেসাবাদ করে।'

বুড়োর মুখটা কোনো কারণে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। নিঃশব্দে পাইপ টানতে-টানতে হাঁটতে লাগলেন উনি।

ফের হঠাৎ বললেন, 'তোর বাবারে খুন করেছিল, কইলি না?'

'হ্যাঁ।'

তালি-মারা, তেলকালিমাখা ট্রাউজার্সে হাতটা মুছে নিয়ে বুড়ো এবার আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন:

'চল্, আমার বাসায় চল্। আলু আর পিঁয়াজ-সিদ্ধ খেতে দেব, জলগরম করে চা-ও করব'খন। নিশ্চয় তোর খুব খিদে পেয়েছে, না রে?'

বাল্‌তিটা এবার খুবই হাল্‌কা ঠেকল আমার। আবারও মনে হল, আর্‌জামাস থেকে পালিয়ে চলে আসাটা খুবই দরকার ছিল। কাজটা বেশ বুদ্ধিমানের মতোই করেছি।

আমার মামাকে ওঁরা সবাই মিলে খুঁজে বের করলেন। দেখা গেল, তিনি ফিটার নন, বয়লার-শপের ফোর্‌ম্যান।

দেখা হতেই চাঁচাছোলা ভাষায় মামা আমায় জানিয়ে দিলেন আমি একটি গণ্ডমূর্খ আর আমায় বাড়ি ফিরে যেতেই হবে।

প্রথম দিনই খাওয়ার সময় চর্বি-মাখা, ইট-রঙের গোঁফজোড়া বাসন-মোছা ঝাড়ন দিয়ে মুছতে-মুছতে খিট্‌খিটে মেজাজ দেখিয়ে মামা বললেন, 'এখেনে তোর কী করার আছে? যার যেখানে জায়গা সেখানেই সে নিজের আখের গোছাতে পারে। আমার জায়গা আমি বেছে নিয়েছিলুম। তাই শিক্ষানবিস থেকে হলুম ফিটার, তারপর উন্নতি করতে-করতে এখন হয়েছি ফোরম্যান। তাহলে? আমিই-বা উন্নতি করতে পারলুম কেন, আর আরেক জনই-বা পারল না কেন? কারণ, অন্যেরা মুখফোড়গিরি করে উঠতে চায়। কাজ করতে চায় না, বুঝলি না? এঞ্জিনিয়ারের ওপর বড় হিংসে ওদের। এক লাফে একেবারে সগ্গে উঠতে চায়। তোর নিজের কথাই ধর না, ইশকুলে টিকে থাকলি না কেন? তাহলে আস্তে-ধীরে একদিন ডাক্তারি কিংবা যে-কোনো কারিগরি-বিদ্যে শিখতে পারতিস। কিন্তু তা হবে কেন? তুই অতি-চালাক হতে গেলি কিনা! কুঁড়েমি, আল্‌সেমি, তাছাড়া আবার কী? আমার কথা

হল, একবার একটা কাজে লেগে পড়লে, ওই কাজে লেগে থেকেই উন্নতির রাস্তা খ্‌ঁজতে হবে। ধীরেস্‌স্থে, কাজে মন লাগিয়ে উঠতে হবে। জীবনে চলার ওই একটিই রাস্তা।'

কথাগ্‌লো শ্‌নে বড় কষ্ট হল আমার। তব্‌ যথাসম্ভব শান্তভাবে বলল্‌ম, 'কিন্তু নিকোলাই-মামা, আমার বাবার কথাই ধর। উনি তো সৈনিক ছিলেন। তোমার কথামতো ওঁর নিম্নপদস্থ অফিসারদের প্রশিক্ষণ-স্কুলে ঢোকা উচিত ছিল। তাহলে উনি অফিসার হতে পারতেন। হয়তো একদিন ক্যাপ্টেনের পদও পেতেন। তুমি বলতে চাও, বাবা ওসব কিছ্‌ না-করে যা করেছিলেন, ক্যাপ্টেন না হয়ে উনি যে পার্টির গোপন কাজের কর্মী হয়েছিলেন, তার দরকার ছিল না?'

শ্‌নে মামা ভুর্‌ কোঁচকালেন।

'তোর বাবা সম্বন্ধে আমি মন্দ কথা বলতে চাই নে। তবে ও যা করেছিল, কী জানি বাবা, আমি তো তার কোনো অর্থ ব্‌ঝি নে। যদি জিজ্ঞেসা করিস তো বলি, তোর বাবার ব্‌দ্ধিস্‌দ্ধি বড় কম ছিল, খালি গোলমাল পাকাতেই জানত। আমাকেও সাত ঝামেলায় প্রায় জড়িয়ে ফেলেছিল আর কী। অফিস থেকে তখন সবে আমায় ফোরম্যানের পদটা দেবে বলে ঠিক করেছে, এমন সময় হঠাৎ কোথাও কিছ্‌ নেই, অফিস থেকে একদিন বলে কিনা: 'ও, তোমার বাসায় যে আত্মীয়টি আসত সে ব্‌ঝি ওইরকম?' কোনোক্রমে ব্যাপারটা চাপা দিতে পথ পাই না তখন।'

বাটি থেকে মাংসস্‌দ্ধ এক-টুকরো হাড় তুলে নিয়ে তার ওপর ঘন করে মাস্টার্ড আর ন্‌ন ছড়িয়ে তাতে বড়-বড় হলদে দাঁতগ্‌লো বসিয়ে দিলেন। তারপর ব্যাজার হয়ে মাথা নাড়লেন মামাবাব্‌।

তাঁর স্ত্রী, আমার মামীমা, দেখতে লম্বা, স্‌ন্দর গড়নপেটন, খাওয়ার পর উনি মামাকে একটা রঙ্-করা মাটির পাত্রে বাড়িতে-তৈরি ক্‌ভাস এনে দিলেন। মামা ওঁকে বললেন:

'এখন একটু ঘ্‌ম্‌ব। ঘণ্টাখানেক পরে ডেকে দিও আমায়। ভার্‌ভারা-বোনটাকে দ্‌-ছত্তর চিঠি লিখতে হবে। বাড়ি যাওয়ার সময় বরিসের হাতে চিঠিটা দিয়ে দেব।'

'ও কখন যাবে?'

'কেন, আসচে কাল।'

এমন সময় জানলায় কে যেন টোকা দিল।

'নিকোলাই-কাকা, জমায়েতে আসচেন তো?' বাইরের রাস্তা থেকে কে যেন বলল।

'কোথায় আসছি?'

'জমায়েতে। চৌকো ময়দানে এখনই মেলা নোক।'

'ইস, ভারি, ওদের জমায়েতে যেতে বয়ে গেছে আমার!' নিজের মনে বললেন মামা।

মামা বিছানায় শুয়ে ঘুমনো পর্যন্ত অপেক্ষা করলুম। তারপর চুপিচুপি এক সময়ে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়।

মনে মনে ভাবলুম, 'মামাটি আমার দেখছি ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যেতে ওস্তাদ। নিজেকে একটা মস্ত কেউকেটা মনে করে। তাই বল, মামা ফোরম্যান! আর আমি ভেবেছিলুম, মামা বুঝি পার্টির লোক। কী বলতে চায় মামা, আমায় আবার আর্‌জামাসে ফিরে যেতে হবে নাকি?'

চত্বরে গিয়ে দেখি হাজার দুই-তিন লোক একটা কাঠের মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তাদের কথা শুনছে। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ অতি-উৎসাহী ভাস্‌কা কোর্‌চাগিনের বসন্তের-দাগওয়ালা মুখটা নজরে পড়ল। ডাকলুম, কিন্তু ও শুনতে পেল না।

ওর কাছে পেঁছিতে চেষ্টা করলুম। একবার-দুবার ভাস্‌কার কোঁকড়ানো চুলে-ভরা মাথাটা ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল, কিন্তু তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেল আর দেখতে পেলুম না। মঞ্চের দিকে আর এগোনো যাচ্ছিল না। কাজেই এগোনো বন্ধ করে বক্তৃতা শুনতে লাগলুম। একের-পর-এক বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা এখনও মনে আছে। অত্যন্ত সাধারণ চেহারার আর ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়-পরা সাধারণ মজুরের মতো দেখতে সেই বক্তাটি। সরমোভোর রাস্তায় অমন কত শয়ে শয়ে লোক ঘুরে বেড়াত তখন। এমনিতে ও-রকম লোকের দিকে নজর পড়ার কথা নয়। আনাড়ির মতো ভঙ্গিতে মাথার থ্যাবড়ানো চাটুর মতো টুপিটা একটানে খুলে ফেলে খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন উনি, তারপর আবেগভরে গলা চড়িয়ে আর, আমার মনে হল, বেশ তিক্ততা নিয়ে উনি শুরু করলেন:

'এঞ্জিন-তৈরির কারখানার, রেল-কামরা তৈরির কারখানার ও আর-আর কারখানার কমরেডরা, আপনারা সকলে জানেন যে রাজনৈতিক কর্মী বলে দণ্ডিত অপরাধীদের ফাটকে আমায় আট-আটটা বছর কাটাতে হয়েছে। তারপর যেইমাত্তর ছাড়া পেলাম, বুক ভরে খোলা হাওয়া ভালো করে টানবার আগেই, ফের দু-মাস জেল! এবার

হল দু-মাসের মেয়াদ! কে এবার আমায় ফাটক দিইছিল জানেন? পুরনো রাজত্বির পুলিশরা নয়, এই নতুন রাজত্বির মোসাহেবরা। জারের আমলে জেল খাটায় কেউ কিছু মনে করতাম না। জারের কাছে অমনধারা বিচার তো আমাদের দেশের নোক হামেশাই পেয়ে এসেছে, ও আমাদের গা-সহা হয়ে গিইছিল। কিন্তু এই মোসাহেবদের কাছে অমনধারা ব্যাভার কোন্ শালা আশা করেছিল, কও দেখি। জেনারেল আর অফিসারবাবুরা লাল ফিতে পরি প্যাখম মেলে বেড়াচ্ছে, দেখলি মনে হবে বাবুরা বুঝি বিপ্লবের পেয়ারের দোস্ত। এদিকে আমরা শালা একটু কিছু করলেই সটান একদম গারদবাস। সব্বদা আমাদের পেছনে তাড়া করা হচ্ছে, আমাদের হয়রান করা হচ্ছে। এ আমার একার নালিশ লয়। আমি আমার সকল কমরেডের কথা বলছি, বাড়তি দু-মাস আমি জেল খেটেছি সে কথা লয়। আমি যা বলছি, তা আপনাদের নালিশ, শ্রমিকভাইদের সকলের নালিশ।'

হঠাৎ কাশির দমক শুরু হয়ে গেল বক্তার। কিছুক্ষণ পর কাশি থামলে তিনি ফের শুরু করতে যাবেন, কিন্তু মুখ খোলামাত্র ফের সেই কাশি শুরু হল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ওইভাবে, মঞ্চের সিঁড়ির রেলিঙ চেপে ধরে কাশির দমকে কাঁপতে থাকলেন। তারপর মাথা নেড়ে নিচে নেমে পড়লেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন চিৎকার করে রাগত গলায় বললে, 'ওর জান বিলকুল খতম করে দিয়েচে শালারা!'

পাঁশুটে, মেঘেঢাকা আকাশ থেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো তুষার ঝরতে শুরু করল। বছরের সেই প্রথম তুষারপাত। শুকনো, ঠান্ডা বাতাস গাছের শেষ পচা পাতাগুলো খসিয়ে নিল। আমার পাদুটো জমে যাচ্ছিল ঠান্ডায়। ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে জোরে-জোরে হেঁটে গা-টা গরম করতে ইচ্ছে হল। দুই কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পথ করে বাইরে আসার সময় পেছনের বক্তাদের আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন সময় হঠাৎ আমার পরিচিত একটা উঁচু গলার আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে মঞ্চের দিকে তাকালুম। তুষারের গুঁড়োয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। লোকে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। কে একজন আমার পা মাড়িয়ে যেন গুঁড়িয়ে দিল। তা সত্ত্বেও পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে যা দেখলুম তাতে আমার বিস্ময়ের আর আনন্দের পরিসীমা রইল না। দেখলুম, মঞ্চের ওপর দাঁড়কাকের সেই পরিচিত দাড়িভর্তি মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে প্রাণপণ কষ্ট করে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলুম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি দাঁড়কাক বক্তৃতা শেষ করে ভিড়ে মিশে যান। তাহলে হাজার চিৎকার করে ডাকলেও উনি শুনতে পাবেন না, আর ওঁকে ধরতেও পারব না। ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আমি মাথার টুপিটা হাতে নিয়ে নাড়তে লাগলুম, কিন্তু তা ওঁর চোখে পড়ল বলে মনে হল না।

দেখলুম, দাঁড়কাক বক্তৃতা শেষ করার মুখে একটা হাত তুলে গলা চড়িয়েছেন। আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম:

'সেমিওন ইভানোভিচ! এই যে, সেমিওন ইভানোভিচ!'

কাছেই কে একজন আমার দিকে 'শ্‌শ্‌শ্‌' করে উঠল। পেছনে খোঁচা লাগাল একটা হাত। কিন্তু আমি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে আরও জোরে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলুম:

'সেমিওন ইভানোভিচ!'

এবার দেখলুম অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়কাক হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর দ্রুত কথা শেষ করে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

জনতার মধ্যে থেকে একজন লোক চটে উঠে হাতটা ধরে আমায় একপাশে টেনে আনলেন।

কিন্তু গালিগালাজ কিংবা ধস্তাধস্তির দিকে আমার এতটুকু নজর ছিল না। আমি তখন আনন্দে পাগলের মতো হাসছি।

যে-মজুরটি আমার হাত ধরেছিলেন তিনি আমায় এক ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ্যাই, মাস্তান, তোর মতলবখানা কী?'

'আমি তো মাস্তান নই,' পরম সুখে একগাল হেসে আর ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া পায়ে তিড়িং-তিড়িং নাচতে-নাচতে জবাব দিলুম। 'আমি দাঁড়কাককে পেয়ে গেছি। সেমিওন ইভানোভিচ...'

আমার মুখে এমন একটা কিছু ছিল যা দেখে লোকটিও না-হেসে পারলেন না।

'দাঁড়কাক কে আবার?' আগের চেয়ে নরম গলায় তিনি বললেন।

'না-না, দাঁড়কাক নয়। সেমিওন ইভানোভিচ। ওই তো তিনি আসছেন...'

ভিড় ঠেলে দাঁড়কাক এসেই আমার কাঁধ চেপে ধরলেন।

'তুমি? এখানে কী করতে?'

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। চত্বরের ওপরের আকাশে একটা জোর গুঞ্জন উঠল। আর আমাদের চারপাশে সকলের মুখগুলোকে কেমন ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত আর বিভ্রান্ত মনে হতে লাগল।

ওঁর প্রশ্নকে উপেক্ষা করেই আমি বললুম, 'এত সোরগোল কেন, সেমিওন ইভানোভিচ?'

উনি চটপট বলে গেলেন, 'এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম এসে পেঁছেছে। কেরেন্স্কি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। জেনারেল কর্নিলভ দোন্-অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে কসাক-বাহিনী সংগঠিত করছে।'

হেমন্তের ছোট-ছোট দিনগুলো দ্রুত কেটে যেতে লাগল আমার। আলোর তুফান তুলে ছুটন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের পাশ দিয়ে পথের ধারের ছোট স্টেশনগুলো যেমন দ্রুত পেছনে ছুটে যায়, তেমনিভাবে। একটা কাজও তাড়াতাড়ি জোগাড় হয়ে গেল আমার। আমিও একজন দরকারী লোক হয়ে উঠলুম। দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাচক্রের আবর্ত গ্রাস করে নিল আমায়।

এই রকম এক প্রচণ্ড আলোড়নের দিনে দাঁড়কাক আমায় ডেকে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন:

'এক-দৌড়ে কমিটির কাছে যাও দেখি, বরিস। ওদের গিয়ে বল যে ভারিখা থেকে একজন প্রচারক চেয়ে পাঠানোয় আমি সেখানে যাচ্ছি। এরশভকে খুঁজে বের করে আমার বদলে ওকেই ছাপাখানায় যেতে বোলো। যদি এরশভকে না পাও, তাহলে... আচ্ছা, একটা পেন্সিল দাও তো। আচ্ছা, এই-চিঠিটাই ছাপাখানায় নিয়ে যাও। ছাপাখানার আপিসে এটা দিও না, মেক-আপ ম্যানের হাতে-হাতে দিও। মেক-আপ ম্যানকে মনে আছে তো? — সেই-যে কোরচাগিনদের বাসায় দেখেছিলে, চোখে-চশমা, ময়লামতো একটি লোক? কাজটা হয়ে গেলে ভারিখায় আমার কাছে চলে এস। আর দ্যাখো, কমিটিতে যদি নতুন কোনো ইস্তাহার থাকে তো কিছু সঙ্গে নিয়ে এস। পাভেলকে বোলো, আমি তোমায় ইস্তাহার নিয়ে যেতে বলেছি। এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাও, বরিস!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন উনি। 'বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। অন্ততপক্ষে আমার পুরনো বর্ষাতিটা তো গায়ে জড়িয়ে যাও।'

কিন্তু আমি তখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছি। ঘোড়সওয়ার সৈনিকের ঘোড়া যেমন জোর কদমে ছোটে, তেমনই কাদামাখা রাস্তা ধরে খানাখন্দ ডিঙিয়ে বেপরোয়াভাবে ছুটে চলেছি।

স্থানীয় পার্টি-অফিস তখন ট্রেন ছাড়ার আগে রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মতোই হৈ-হট্টগোলে সরগরম। অফিসের দোরগোড়াতেই লাগল কোরচাগিনের সঙ্গে জোর ধাক্কা। কোরচাগিন না-হয়ে যদি আরেকটু ছোটখাট আর দুর্বলগোছের কেউ হত, তাহলে সে আমার ওই ধাক্কায় উলটে ধরাশায়ী হত নিশ্চয়। কিন্তু ওঁর গায়ে ধাক্কা দিয়ে উলটে আমারই মনে হল যেন টেলিগ্রাফের পোস্টের গায়ে ধাক্কা খেলুম।

কোরচাগিন ব্যস্তসমস্তভাবে বললেন, 'এত তাড়া কিসের? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে নাকি?'

লজ্জা পেয়ে গিয়ে চোট-খাওয়া মাথাটায় হাত বুলোতে-বুলোতে আর জোরে-জোরে নিশ্বাস টানতে-টানতে বললুম, 'না, তা নয়, এই, মানে, সেমিওন ইভানোভিচ আপনাকে খবর দিতে বললেন যে উনি ভারিখায় যাচ্ছেন...'

'জানি। ওরা ফোন করি কয়েছিল।'

'উনি কিছু ইস্তাহারও চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

'তাও পাঠানো হয়েচে। আর কী?'

'এরশভকে বলতে হবে ছাপাখানায় যেতে। এই-যে একটা চিঠিও আছে।'

'কেন, ছাপাখানায় আবার কী হল? দেখি, চিঠি দেখি,' পুরনো একটা জ্যাকেটের ওপর ফৌজী কোট চড়ানো একজন সশস্ত্র মজুর আমাদের কথার মাঝখানে বাধা দিলেন।

চিঠিটা পড়ে তিনি কোরচাগিনকে বললেন, 'সেমিওনরে কামড়াচ্চে কিসে? ছাপাখানা লিয়ে এত মাথাব্যথার আচে কী? দুপুরের খাওয়ার পরই তো এক দল পাহারাদার পাঠিয়ে দিচ্চি ওখেনে।'

ক্রমেই বেশি-বেশি লোক দরজা দিয়ে ভেতরে আসতে লাগল। বাইরে ঠাণ্ডা সত্ত্বেও দরজাটা ছিল হাট করে খোলা। ভেতরে দেখা যাচ্ছিল, ফৌজী ওভারকোট, কামিজ আর রঙচটা বাদামী চামড়ার জ্যাকেট গাদাগাদি করে আছে। দরজার ভেতরেই চলাচলের পথটায় দু-জন লোক ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে একটা প্যাকিং বাক্স ভেঙে

খুলছিল। খোলা হলে পর দেখলুম ভেতরে খড়ে-জড়ানো, ঘন-করে-তেল-মাখানো আনকোরা নতুন সব রাইফেল সারি-সারি সাজানো। দরজার বাইরে কাদার ওপর ওইরকম আরও কয়েকটা খালি প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে, দেখা গেল।

তিনজন সশস্ত্র মজুরকে সঙ্গে নিয়ে কোরচাগিন আবার ওখানে এলেন।

ওদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলি যাও ভাই। ওখেনে থাকতি হবে। কমিটির কাছ-থেকে-পাওয়া পাশ ছাড়া কাউরে ওখেনে ঢুকতে দেবে না, বুয়েছ? আর কাজকম্ম সব ঠিক-ঠিক হল কিনা কাউরে দিয়ে খবরটা পাঠিও।'

'কারে পাঠাব, কন?'

'আরে, কাছেপিঠে আমাদের নোক যারে পাও তারেই পাঠাবে।'

প্রবল একটা উত্তেজনা আর অন্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকার ইচ্ছে পেয়ে বসল আমাকে। চেঁচিয়ে বললুম, 'আমিই না হয় কাছেপিঠে থাকব'খন!'

'ঠিক আছে, ওরেই লাও। ও খুব দৌড়ুতে পারে।'

হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলুম, কমিটির অফিস থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাঙা প্যাকিং বাক্সটা থেকে একটা করে রাইফেল তুলে নিচ্ছে।

বললুম, 'কমরেড কোরচাগিন, প্রত্যেকেই রাইফেল নিচ্ছে। আমিও একটা নেব?'

সারা-গায়ে-উল্কি-আঁকা একজন নৌ-সেনার সঙ্গে কোরচাগিন তখন কথায় ব্যস্ত ছিলেন। কথা থামিয়ে বিরক্তভাবে বললেন, 'অ্যাঁ, কী?'

'একটা রাইফেল চাই। আমি তো যে-কোনো সাবালকেরই সমান, তাই না?'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে জোর গলায় কে যেন কোরচাগিনকে ডাকলে। তাড়াতাড়ি চলে যেতে-যেতে কোনো কথা না বলে কোরচাগিন শুধু আমার দিকে হাত নাড়লেন।

হয়তো উনি আমার অনুরোধ উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করলেন। আমি কিন্তু হাত-নাড়ার অর্থ করলুম, উনি আমায় অনুমতি দিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্স থেকে একটা রাইফেল উঠিয়ে নিয়ে দেহের সঙ্গে সেটাকে চেপে ধরে সশস্ত্র প্রহরীদের পিছু পিছু ছুটলুম। ওঁরা তখন রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করেছেন।

আর দৌড়ে সামনের উঠোনটা পার হতে হতে তখুনি-পাওয়া সর্বশেষ খবরটা আমার কানে এল: পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েত রাজ ঘোষিত হয়েছে, কেরেন্‌স্কি পালিয়েছে, আর মস্কোয় সামরিক কাদেতদের সঙ্গে লড়াই চলছে।

স্বগতোক্তি

ইতিমধ্যে মাস ছয়েক কেটে গেছে।

এপ্রিল মাসের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে একটা রেলস্টেশন থেকে মা-র নামে একখানা চিঠি ছাড়লুম।

'মা-মণি,

বিদায়, বিদায়! বীর কমরেড সিভের্সের দলে আমরা যোগ দিতে চলেছি এখন। কমরেড সিভের্স কর্নিলভ আর কালেদিনের শ্বেতরক্ষী-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আমরা তিন জন যাচ্ছি। সরমোভোর যোদ্ধ্-স্কোয়াডের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র পেয়েছি আমরা। আমি আর বেল্কা আমরা দু-জন ওই স্কোয়াডেরই লোক। আমাকে ওরা প্রথমে পরিচয়-পত্র দিতে চায় নি। বলছিল, আমার বয়েস নাকি খুবই কম। যাই হোক, দাঁড়কাককে রাজী করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে আমায়। শেষপর্যন্ত উনিই অবিশ্যি আমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। উনি নিজেই লড়াইয়ে যেতেন, কিন্তু শরীরটা দুর্বল আর খুব কাশছেন বলে যেতে পারলেন না। আনন্দে আমার মাথার ঠিক নেই, মা। এর আগে যা কিছু ঘটেছে সে সবই ছিল ছেলেখেলার সামিল। জীবনে আসল ব্যাপার এই প্রথম শুরু হচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে, আজ দুনিয়ায় আমার মতো আর কেউ সুখী নয়।'

যাত্রা শুরু করার পর তৃতীয় দিনে একটা ছোট্ট স্টেশনে ঘণ্টা ছয়েক আটকে থাকার সময় আমরা জানতে পারলুম আমাদের চারপাশের গ্রামাঞ্চলে অশান্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট ডাকাতের দল মাথা চাড়া দিয়েছে, আর কোনো-কোনো জায়গায় কুলাক বা ধনী চাষীদের সঙ্গে খাদ্য-সংগ্রাহক দলের লড়াই হয়ে গেছে। সেদিন অনেক রাত্রে আমাদের ট্রেনে একটা এঞ্জিন এসে লাগল। একটা মালগাড়ির ওপরের বাঙ্কে আমি আর আমার কমরেডরা পাশাপাশি শুয়ে ছিলুম। চাকার নিয়মিত ঝন্ঝনানি, গাড়ির দুলুনি আর ক্যাঁচ্কোঁচ আওয়াজ শুনতে-শুনতে ভারি পশমী ওভারকোটটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে আমি ঘুমের উদ্যোগ করতে লাগলুম।

অন্ধকারের মধ্যে লোকের নাকডাকার আওয়াজ, কাশির শব্দ আর গা-হাত-পা চুলকনোর ঘস্ঘসানি কানে আসছিল। ওপরের বাঙ্কে যারা জায়গা পেয়েছিল, তারা

ঘুমোচ্ছিল। আর গাড়ির মেঝের ওপর গাদাগাদি করে বসে ছিল যারা সেই সব অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবানরা অনবরত গুঁতোগুঁতি করছিল আর নিচে থেকে কেবলই গুনগুননি, বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ আর গালিগালাজের আওয়াজ কানে আসছিল।

'আঃ, ঠেলচ কেন বাপু? বলি, মতলবখানা কী তোমার? আমারে ক্যাঁথা থেকে ঠেলে ফেলি দেবে নাকি? হুঁশিয়ার, নইলে তোমারে ঠেলে এক্কেবারে ফেলে দেব কিন্তু, হাঁ!' একটা হেঁড়ে গলা গজগজ করে উঠল।

এবার শোনা গেল একটা সরু মেয়েলি গলার চিল-চ্যাঁচানি: 'দ্যাখো, দ্যাখো, শয়তানটার কান্ড! আমার মুখের ওপর বুটসুদ্ধু ঠ্যাঙ্‌দুটো সপাটে তুলে দিয়েচে! নাবাও, নাবাও বলচি, চুলোয় যাও তুমি!'

জ্বলন্ত দেশালাই-কাঠির আলোয় জমাট-বাঁধা নড়ন্ত বুটজুতো, কাঁথা, টুক্‌রি, টুপি আর হাত-পায়ের স্তূপ চোখে পড়ল। তারপর আলো নিবে গেলে আরও ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু। এক কোণে কে একজন বিষণ্ণ, বৈচিত্র্যহীন সুরে তার দুঃখের জীবনের একঘেয়ে কাহিনী একটানা বলে চলেছিল। যে লোকটি সহানুভূতি জানাচ্ছিল সে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে গো-মাছিতে কামড়ানো ঘোড়ার মতো গাড়িটা শিউরে-শিউরে উঠছিল আর ঝাঁকি দিতে-দিতে লাইন ধরে এগোচ্ছিল।

সঙ্গীদের মধ্যে কেউ আমার জামার হাতা ধরে টান দেয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকাতেই বুঝতে পারলুম খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা, শরীর-জুড়নো হাওয়া এসে আমার ঘর্মাক্ত মুখে বাতাস করছে। ট্রেনটা আস্তে-আস্তে যাচ্ছিল, বোধহয় চড়াই ভাঙছিল। দেখি, আগুনের আভায় গোটা দিগন্ত আলো হয়ে আছে। আর তার ওপরের আকাশে, যেন ওই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের উত্তাপে ঝলসে গিয়েই, তারাগুলো মিয়োনো জোনাকির মতো মিটমিট করছে, ফ্যাকাশে চাঁদ গলে মিশে গেছে আকাশে।

'সারা তল্লাট জুড়ে বিদ্রোহ দেখা দিয়েচে,' গাড়ির একটা অন্ধকার কোণ থেকে কার যেন শান্ত, খুশিখুশি গলা শোনা গেল।

আরেকটা কোণ থেকে একটা হিংস্র গলায় জবাব এল, 'আর তো কিছু নয়, খুব কষে বেত খেতে চায় আর কি!'

আচমকা একটা ধাক্কায় কথাবার্তা গেল বন্ধ হয়ে। কামরাটা সজোরে দুলে উঠে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। বাঙ্ক থেকে ছিটকে আমি নিচের লোকের মাথায় গিয়ে পড়লুম। ওই অন্ধকারের মধ্যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। 'বাবা রে, গেছি রে' চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মধ্যে সকলেই মালগাড়ির খোলা দরজার দিকে ছুটল।

বোঝা গেল, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

রেললাইনের উঁচু বাঁধের পাশেই একটা খানায় লাফিয়ে পড়েছিলুম। লাফ দেয়াটা ঠিক সময়েই হয়েছিল। আরেকটু দেরি হলেই গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া যাত্রীদের দেহের ভারে চেপ্টে যেতুম। এরপরই দু-বার গুলির শব্দ শোনা গেল। আমার পাশেই একটা লোক কাঁপা-কাঁপা হাত দুটো সামনে মেলে দিয়ে গুনগুন করে বলে চলেছিল:

'আরে, ঠিক আচে... সব ঠিক আচে। খালি দৌড়োদৌড়ি করবেন না, তাইলেই ওরা গুলি চালাবে কিন্তু। ওরা শ্বেতরক্ষী লয়, আশপাশের গাঁয়ের নোক। প্রাণে মারে না, খালি সবকিছু কেড়েকুড়ে লিয়ে ছেড়ে দেয়।'

এই সময়ে রাইফেল-হাতে দু-জন লোক আমাদের কামরাটার কাছে দৌড়ে এসে চিৎকার করে বললে:

'উঠে পড়! গাড়িতে উঠে পড় সব!'

যাত্রীরা আবার মালগাড়িগুলোর দিকে দৌড় লাগাল। ধাক্কাধাক্কিতে হোঁচট খেয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে খানার মধ্যে পড়ে গেলুম আমি। আর মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো চার হাত-পা টেনে-টেনে ট্রেনের পেছন দিকে দ্রুত এগোতে লাগলুম। আমাদের কামরাটা একেবারে শেষ কামরার ঠিক আগে ছিল। তাই মিনিটখানেকের মধ্যে শেষ কামরার আবছা সিগ্ন্যাল লণ্ঠনটার সমান-সমান পেঁৗছে গেলুম। জায়গাটায় রাইফেল-হাতে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে আবার ফেরার চেষ্টা করলুম, কিন্তু দেখলুম ও লাইনের বাঁধের অপর-দিকে কাউকে একটা দেখতে পেয়ে সেই দিকে ছুটে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে আমি নালার নাবালের মুখে পেঁৗছে হড়হড়ে কাদাটে নাবাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লুম। তারপর নাবালের নিচে পেঁৗছে শরীরটা ঘসতে ঘসতে, কাদামাখা পা-দুটো প্রায় টেনে টেনে ঢুকে গেলুম ঝোপের মধ্যে।

সদ্য-সবুজ গাছপালার আবছায়ায়-ঘেরা জঙ্গলটায় তখন প্রাণের সাড়া জেগেছে। দূরে কোথায় যেন মোরগরা পাল্লা দিয়ে দরাজ গলায় ডাকাডাকি শুরু করেছিল। কাছের কোনো একটা ফাঁকা জায়গা থেকে আসছিল জোর গলায় ব্যাঙের ঘ্যাঙরঘ্যাঙ। ওরা বোধহয় জল থেকে উঠে এসে ওখানে শরীর গরম করছিল। এখানে-ওখানে গাছের ছায়ায়ে তখনও রয়ে গিয়েছিল নোংরা জমা তুষারের ছোট ছোট সব দ্বীপ, কিন্তু যে-সব জায়গা রোদ্দুর পায় সেখানে আগের বছরের শক্ত ঘাসগুলো এরই মধ্যে শুকিয়ে এসেছিল।

বিশ্রাম নিতে-নিতে আমি বার্চের একটুকরো বাকল দিয়ে বুটজোড়া থেকে কাদা মুছে সাফ করে ফেললুম। তারপর একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে জলে ডুবিয়ে মুখের কাদাও পরিষ্কার করে নিলুম।

কিন্তু এ-সমস্তই আমার অচেনা জায়গা। আমার সমস্যা হল, ওখান থেকে বেরিয়ে কাছাকাছির মধ্যে কোনো রেলস্টেশনে যাই কী করে? থেকে-থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম, তার মানে কাছেই গ্রাম ছিল। আচ্ছা, ওখানে গিয়ে পথের সন্ধান নিলে কেমন হয়? কিন্তু তাতে আবার কুলাকদের গোপন আস্তানার সামনাসামনি পড়ে যাবার ভয় ছিল। ওরা হয়ত জিজ্ঞেস করবে — কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, এই সব। এদিকে আমার পকেটে পরিচয়-পত্র, আবার একটা মাওজারও আছে। কাগজখানা আমি অবিশ্যি বুটের মধ্যে লুকোতে পারি, কিন্তু পিস্তলটা নিয়ে কী করা যায়? ফেলে দেব ওটা?

পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলুম। না, ওটা ফেলে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চকচকে ইস্পাতের ছটা ছড়িয়ে ছোট্ট মাওজারটা আমার হাতের মধ্যে এমন আরামে শুয়েছিল যে ওটাকে ফেলে দেবার কথা চিন্তা করতে পেরেছি ভেবেই লজ্জা পেলুম। গায়ে হাত বুলিয়ে ওটাকে ফের রেখে দিলুম, তবে এবার আমার জ্যাকেটের ভেতর দিকে আস্তরের মধ্যে সেলাই-করা একটা চোরা-পকেটের মধ্যে।

সকালটা ছিল আলোয় ঝলমলে। আর চারিদিকে কত রকমের যে শব্দ শোনা যাচ্ছিল তার ইয়ত্তা ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে হলদে একটা খোলা জায়গার মাঝখানে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আমার মনেই হচ্ছিল না যে কোথাও বিপদ বলে কোনো বস্তু আছে।

'পিঙ্, পিঙ্... এর্‌র্‌র্!' খুব কাছে একটা পরিচিত পাখির ডাক শোনা গেল। একটা নীলরঙের টিট্‌পাখি ঠিক আমার মাথার ওপর একটা ডালে উড়ে এসে বসে অবাক হয়ে একটা চোখ বের করে আমায় দেখতে লাগল।

'পিঙ্, পিঙ্... এর্‌র্‌র্... কী হে!' অনবরত পা বদলাতে বদলাতে আবার ডেকে উঠল পাখিটা।

হঠাৎ তিম্‌কা শ্‌চুকিনের কথা মনে পড়ায় না-হেসে থাকতে পারলুম না। ও এই টিট্‌পাখির নাম দিয়েছিল 'বোকা-ল্যাজঝোলা'। মনে হল, এই তো সেদিনের কথা — সেই টিট্‌পাখি, কবরখানা, আমাদের খেলাধুলো। আর এখন? ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। যা হোক কিছু একটা উপায় বের করতেই হবে!

কাছেই চাবুকের শব্দ আর গোরুর হাম্বা-ডাক শুনতে পেলুম। ভাবলুম, 'গোরুর পাল যাচ্ছে। যাই, গিয়ে রাখালকে পথের কথা জিজ্ঞেস করি। রাখাল আমার আর কীই-বা ক্ষতি করতে পারে? কথাটা জিজ্ঞেস করেই না হয় তাড়াতাড়ি কেটে পড়ব।'

জঙ্গলের ধার ঘেঁষে অলসভাবে পুরনো ঘাস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ছোট্ট একপাল গোরু আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিল। সঙ্গে মস্ত, ভারি একটা লাঠি হাতে এক বুড়ো রাখাল পথ চলছিল। যেন এমনিই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি এমন একটা ধীরস্থির শান্ত ভাব দেখিয়ে আস্তেধীরে বুড়োর দিকে এগোলুম।

'সুপ্রভাত, ঠাকুদ্দা!'

একটু যেন ইতস্তত করে বুড়ো বললে, 'সুপ্রভাত!' তারপর আমার ভালো করে দেখার জন্যে থামল।

'আচ্ছা, রেলস্টেশনটা এখান থেকে কতদূর হবে?'

'ইস্টিশন? তা কোন্ ইস্টিশন চাইচ বাপু?'

হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। তাই তো, কোন স্টেশন চাই তাতো খেয়াল করি নি। কিন্তু বুড়ো নিজেই আমার হয়ে কথা যুগিয়ে দিল।

'আলেক্সান্দ্রভ্‌কা যেতি চাও বোধ করি?'

'ঠিক-ঠিক। ওখানেই যাচ্ছিলুম তবে মধ্যে পথটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে।'

'বলি, আসা হচ্চে কোত্থেকে?'

আবার ঝামেলায় পড়ে গেলুম।

দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে যতদূর শান্তভাবে জবাব দেয়া সম্ভব ছিল, তাই দিলুম। 'ওখান থেকে।'

'হুম্... ওখেন থেকে বলচ... মানে, দেমেনেভো থেকে?'

'ঠিক-ঠিক, দেমেনেভোই।'

এই সময়ে আমার পেছন দিকে কুকুরের গর্‌গর আওয়াজ আর মানুষের পায়ের শব্দ পেলুম। ফিরে দেখলুম, একটি শক্তসমর্থ চেহারার ছোকরা বুড়োর দিকে হেঁটে আসছে। বুঝলুম, এই-ই হল এই গোরুর পালের জুড়ি রাখাল।

এক-টুকরো যবের রুটি চিবোতে-চিবোতে ছোকরা জিজ্ঞেস করল:

'ব্যাপার কী, আলেক্‌সান্দর-জ্যাঠা?'

'যাচ্ছিল এখেন দে'। তা শুধলো, আলেক্সান্দ্রভ্‌কা ইস্টিশন কোন্ মুখে? বলচে দেমেনেভো থেকে ন্যাকি আসচে।'

রুটি চিবনো বন্ধ করে ছেলেটা এবার আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

'তা কী করি হয়?' বলল ও।

'আমিও তো তাই ভাবচি। দেমেনেভো তো ইস্টিশনের একেবারে গায়েই। আলেক্সান্দ্রভ্‌কা-দেমেনেভো —ও তো একই জায়গা। ছোকরা কিসের খোঁজে ইদিকে এয়েচে কইতে পার?'

'এরে গাঁয়ে পাঠানো দরকার,' ছেলেটা শান্তভাবে পরামর্শ দিল। 'মিলিটারি ছাউনির নোকেরাই খুঁজে বের করুক এখন। এর পেটে অনেক কথা আচে, বুইলে!'

যদিও আমার কোনো ধারণা ছিল না এই মিলিটারি ঘাঁটিটা কী ধরনের আর তারা কীভাবেই বা আমার সবকিছু খুঁজে বের করবে, তবু আমার গ্রামে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। আর তা অন্য কোনো কিছুর জন্যে না হলেও অন্তত এই কারণে যে ওই অঞ্চলের গ্রামগুলোর অবস্থা ছিল সচ্ছল আর গ্রামগুলো ছিল বিক্ষুব্ধও। কাজেই আর সময় নষ্ট না করে আমি পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলুম।

রাখাল ছেলেটা আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে না-পেরে শিগ্‌গিরই পিছিয়ে পড়ল, কিন্তু ওর শয়তান কুকুরটা ইতিমধ্যে বার দুই আমার পায়ে কামড় বসাতে কসুর করল না। কিন্তু কুকুরের কামড়েও কোনো ব্যথা বোধ কবলুম না সে-সময়ে। তাছাড়া

অত জোরে ছোটবার সময়ে গাছের ডালপালা চাবুকের মতো শপাং-শপাং করে গায়ে-মুখে-মাথায় পড়ছিল, মুখে যেন ধারালো নখ বিঁধিয়ে দিচ্ছিল ডালগুলো আর হঠাৎ-হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা মাটির ঢিবি আর কাটা গাছের গুঁড়িগুলো পায়ে পায়ে বাধা দিচ্ছিল। তবু আমার কোনো কিছুতেই খেয়াল ছিল না।

রাত্তির পর্যন্ত জঙ্গলে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালুম আমি। জঙ্গলটা একেবারে বিজন ছিল না। কেননা, সারা জঙ্গলে এখানে-ওখানে গাছের কাটা গুঁড়ি ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

জঙ্গলের যতই গভীরে যাবার চেষ্টা করলুম ততই দেখলুম গাছের সংখ্যা কমে আসছে আর ফাঁকা জায়গার সংখ্যা বাড়ছে। শুধু তাই নয়, ওই ফাঁকা জায়গাগুলোয় ঘোড়ার খুরের দাগ আর ঘোড়ার নাদ পড়ে থাকতে দেখলুম। রাত নেমে এল। আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, ক্ষতবিক্ষত। একটা ঝোপের মধ্যে শুকনোমতন লুকনো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে একখানা কাঠ মাথার নিচে বালিশের মতো রেখে শুয়ে পড়লুম। শোয়ার পর ক্লান্তি যেন আরও চেপে ধরল। গাল দুটো গরম ঠেকতে লাগল আর যে-পায়ে কুকুরে কামড়েছিল সেই পা-টা উঠল টন্‌টনিয়ে।

ঠিক করলুম, 'আমায় ঘুমোতেই হবে। এখন রাত্তির, কেউ আমায় খুঁজে পাবে না এখানে। আমি ক্লান্ত। আমায় ঘুমোতেই হবে। কাল সকালে উঠে যা-হোক কিছু ঠিক করা যাবে।'

ঝিমুনি আসতেই মনে পড়ে গেল আমাদের আর্‌জামাসের কথা। সেই পুকুর, ভেলায় চড়ে আমাদের সেই যুদ্ধ, গরম পুরনো কম্বলের নিচে আমার সেই নরম বিছানা। মনে পড়ল, ফেদ্‌কা আর আমি সেই-যে একবার পায়রা ধরে ফেদ্‌কাদের রান্নার কড়াইতে ভেজেছিলুম সেই কথা। তারপর লুকিয়ে পায়রাগুলো খেয়েছিলুম দু-জনে। পায়রার মাংস খেতে এমন সুস্বাদু ছিল যে কী বলি...

গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে শন্‌শন্ বাতাস বইতে শুরু করল। জঙ্গলটাকে কেমন খালি-খালি আর ভয়ঙ্কর বোধ হতে লাগল। আর আমার মনে ভেসে উঠল আমাদের পুরনো শহর আর্‌জামাস, পরবের সুস্বাদু পিঠের মতো উষ্ণ আর সুগন্ধি। কোটের কলারটা উঁচু করে তুলে নিলুম। আর বুঝতে পারলুম এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গাল বেয়ে নামছে। কিন্তু তবু, তবু আমি কাঁদি নি। কিছুতেই কাঁদি নি।

ওই দিন আরও গভীর রাত্রে ঠাণ্ডায় শরীর অসাড় হয়ে যাওয়ার যোগাড় হলে অনবরত লাফালাফি করতে আর ফাঁকা জায়গাটায় দৌড়োদৌড়ি করতে বাধ্য হলুম। একবার একটা বার্চ-গাছে ওঠারও চেষ্টা করলুম। এমন কি শরীর গরম করার জন্যে নাচতেও লাগলুম। তারপর আবার কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম চুপচাপ। তারপর বন-থেকে-ওঠা কুয়াশায় শরীর আবার ঠাণ্ডা হয়ে যেতে ফের লাফিয়ে উঠলুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সূর্য উঠল, আবার গরম হয়ে উঠল চারিদিক। শুরু হয়ে গেল পাখপাখালির ডাক। একঝাঁক সারস সার বেঁধে আকাশে উড়তে-উড়তে খুশিতে ডাকাডাকি শুরু করল। আমার মুখেও হাসি ফুটল আবার। রাত ভোর হয়ে গেছে, মন-খারাপ করার মতো আর কোনো দুঃখের চিন্তা মাথায় নেই। তখন কেবল একটিমাত্র চিন্তা — অল্প কিছু খাবার পাওয়া যায় কোথায়।'

দুশো পাও এগোই নি, এমন সময় হাঁসের ডাক আর শুয়োরের ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ কানে এল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, একটা বিচ্ছিন্ন খামারবাড়ির সবুজ রঙ-করা ছাদটা দেখা যাচ্ছে।

ঠিক করলুম, 'ওইখানেই যাই। যদি সন্দেহ করার মতো কিছু না পাই, তাহলে পথের সন্ধান নেব আর কিছু খেতে চাইব।'

একটা এল্ড্যার-ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানবের কোনো চিহ্ন ছিল না। বাড়িটার চিমনি দিয়ে হাল্কা ধোঁয়া উঠছিল। ছোট্ট এক পাল হাঁস দুলে-দুলে আমার দিকে আসছিল। হঠাৎ পাশেই মট্ করে একটা ডাল ভাঙার অস্পষ্ট শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটোকে তৈরি রেখে মাথাটা ঘোরালুম। কিন্তু ভয় পাওয়ার জায়গায় এবার আমার অবাক হবার পালা। দেখলুম, আমার কাছ থেকে দশ পায়ের মধ্যে একটা ঝোপের আড়াল থেকে মানুষের একজোড়া চোখ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখজোড়া যার সে ওই খামারবাড়িটার মালিক নয়, কারণ সে-ও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে খামারের উঠোনটা লক্ষ্য করছিল। কিছুক্ষণ সতর্কভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলুম আমরা, যেন একই শিকার ধরতে উদ্যত দুই বুনো জন্তুর মধ্যে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে। তারপর

আমাদের মধ্যে যেন একটা নীরব বোঝাপড়া হয়ে গেল। আমরা আবার ঝোপের মধ্যে ফিরে গিয়ে পরস্পরের কাছে গেলুম।

ছেলেটা ছিল আমারই সমান লম্বা। বয়েস প্রায় সতেরো হবে বলে ধারণা হল। ওর শক্তসমর্থ, পেশীবহুল দেহে চড়ানো ছিল কালো পশমী কাপড়ের ডবল-ব্রেস্ট একটা কোট, কিন্তু কোটে একটিও বোতাম ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল, বোতামগুলো যেন ইচ্ছে করেই সব কেটে নেয়া হয়েছে। ওর ট্রাউজার্সের পা-দুটো ছিল কাদামাখা উঁচু বুটজুতোর কানার মধ্যে গোঁজা আর তাতে কয়েকটা শুকনো চোরকাঁটা লেগে ছিল।

ছেলেটার মুখটা দেখতে লাগছিল ফ্যাকাশে, চোখের নিচে গোল হয়ে কালিপড়া। দেখে মনে হচ্ছিল, আমার মতো ও-ও খুব সম্ভব রাত্তিরটা জঙ্গলে কাটিয়েছে।

'ওখানে যাবার কথা ভাবছিলে বুঝি?' খামারবাড়িটার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে আস্তে-আস্তে ছেলেটা বলল।

বললুম, 'হ্যাঁ। আর তুমি?'

'ওরা দেবে লবডঙ্কা, বুঝলে? তিন-তিনটে হোঁতকা চাষী থাকে ওখানে। আমি দেখে নিয়েছি ওদের। শেষকালে কার পাল্লায় পড়তে হবে, তা কি বলা যায়?'

'তা হলে? কী করা? কিছু খেতে হবে তো!'

'সে তো বটেই,' ও সায় দিল। 'তবে ভিক্ষে করে নয়। তাছাড়া, আজকাল ভিক্ষে দেয়ও না কেউ। কিন্তু তুমি কে?' প্রশ্নটা করেই কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে উঠল: 'আচ্ছা, ওকথা থাক। খাবার আমাদেরই যোগাড় করতে হবে। তবে একার পক্ষে পাওয়া ভারি শক্ত। আমি চেষ্টার কসুর করি নি তো। তা, আমরা দু-জন যখন আছি তখন ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। হাঁসগুলো সব ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে — ইয়া বড়-বড় পুরুষ্টু হাঁস।'

'কিন্তু ও তো আমাদের নয়।'

ছেলেটা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ও আমার বোকার মতো কথা শুনে অবাক হয়েছে।

তারপর সহজভাবে বললে, 'আজকালকার দিনে সবকিছুই সকলের। আচ্ছা ওই খোলা জায়গাটার পেছনে গিয়ে একটা হাঁসকে আস্তে-আস্তে আমার দিকে তাড়িয়ে আনো দেখি। আমি ঝোপের আড়ালে থাকব'খন।'

একটা মোটাসোটা ছাইরঙের হাঁস দলছাড়া হয়ে পড়েছিল। দেখে পছন্দ হওয়ায় ওটার পথ আগলে দাঁড়ালুম। হাঁসটা উলটো মুখে ফিরে আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগল আর মাঝে মাঝে থেমে মাটি থেকে কী সব খেতে লাগল খুঁটে-খুঁটে। এক-পা এক-পা করে আমি ওটাকে ছেলেটার ঝোপের দিকে নিয়ে যেতে লাগলুম। প্রায় ঝোপটার সামনা-সামনি এসে পড়েছে যখন এমন সময় হাঁসটা হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি আগাগোড়া ওর পেছন-পেছন যাচ্ছি দেখেই হয়তো হাঁসটার ধাঁধা লেগেছিল। তারপর যেন মনস্থির করে ফেলে হাঁসটা আবার পিছু ফিরল। কিন্তু বেড়াল যেভাবে চড়ুইপাখির ওপর বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইভাবে ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়ে ছেলেটাও এই সময়ে দু-হাতে হাঁসের গলা চেপে ধরলে। ভালোমতো ডাকবারও সময় পেলে না হাঁসটা। এদিকে হাঁসের দলটা এই ব্যাপার দেখে প্যাঁকপ্যাঁক শুরু করে দিল আর সেই অবসরে ছেলেটা ছটফট-করা হাঁসটাকে দু-হাতে চেপে ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পিছুপিছু আমিও ছুটলুম।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁসটা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে, প্রাণপণে পা ছুড়তে-ছুড়তে চলল। আমরা খাদের মধ্যে একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছনো পর্যন্ত ও লড়াই চালিয়ে গেল। তারপর এক সময় থামল। ছেলেটা হাঁসটাকে মাটিতে ছুড়ে দিয়ে পকেট থেকে খানিকটা তামাক বের করলে। জোরে-জোরে দম নিতে-নিতে বললে:

'এখানেই কাজ চলে যাবে। থামা যাক তাহলে।'

ছোট্ট একটা পকেটছুরি বের করে ও নিঃশব্দে হাঁসটার ছাল ছাড়াতে বসে গেল। আর মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল আমার দিকে।

ভাঙা ডালপালা যোগাড় করে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলুম আমি।

জিজ্ঞেস করলুম, 'দেশালাই আছে?'

'এই-যে,' রক্তমাখা আঙুলে এক বাক্স দেশালাই আমার হাতে তুলে দিয়ে ছেলেটা বললে, 'বুঝেসুঝে খরচ কোরো কিন্তু।'

এতক্ষণে ওর দিকে ভালো করে তাকালুম। পুরু ধুলোর আস্তরণ ওর কাটা-কাটা মুখচোখের মসৃণ শাদা রঙটা চাপা দিতে পারে নি। দেখলুম, কথা বলার সময় ওর দুই ঠোঁটের ডানদিকের জোড়ের কাছটা হঠাৎ অল্প একটু কেঁপে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-চোখটা একটু কুঁচকে যায়। ও ছিল আমার চেয়ে বছরখানেক কি বছর-

দুয়েকের বড়, আর মনে হচ্ছিল গায়ে শক্তিও রাখে বেশি। চুরি-করা হাঁসটাকে যতক্ষণ শিকে গেঁথে ঝলসানো হচ্ছিল, আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। চারিদিক তখন ঝলসানো মাংসর মনোরম গন্ধে ম-ম করছে।

'সিগারেট চলে?' ছেলেটা বলল।

'না।'

'রাত্রে জঙ্গলেই ঘুমিয়েছ নাকি? খুব ঠান্ডা, না?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না-রেখেই আবার বলল, 'এখানে এসে পড়লে কী করে? ওখান থেকে?' বলে রেললাইনের দিকে আঙুল দেখাল।

'হ্যাঁ। আমাদের ট্রেনটা ওখানে থামায় আমি পালিয়েছিলুম।'

'কী? পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করছিল?'

'পরিচয়-পত্র? না তো। ডাকাতরা ট্রেন আক্রমণ করেছিল।'

'অ...,' ফের চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল ছেলেটা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ আবার বলল, 'তা, যাচ্ছিলে কোথায়?'

'দোনের দিকে...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলুম আমি।

'দোনে?' উঠে বসে ও জিজ্ঞেস করল। 'তুমি দোনে যাচ্ছিলে?'

ওর পাতলা ফাটা ঠোঁটে মুহূর্তের জন্যে একটা অবিশ্বাসের হাসি খেলে গেল। চোখ দুটো একবারের জন্যে জ্বলজ্বল করে উঠেই নিবে গেল পরক্ষণে। মুখ থেকে মুহূর্তের উত্তেজনার ছাপটা গেল মুছে।

শুধু সংক্ষেপে বললে, 'ওখানে তোমার কেউ আত্মীয় থাকেন নাকি?'

সাবধানে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ, আত্মীয় থাকেন।' মনে হল, নিজে ও অন্ধকারে থেকে আমার মুখ দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করছে।

ছেলেটা আবার চুপ করে গেল। শিকে-ঝোলানো হাঁসটার গা থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় গরম চর্বি গলে ঝরে পড়ছিল। শিকের গায়ে হাঁসটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে শান্তভাবে ও বলল:

'আমিও ওই পথেই যাচ্ছি। তবে আত্মীয়ের কাছে নয়। সিভের্সের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

কথায়-কথায় জানাল, ও পেন্‌জায় লেখাপড়া করছিল। তারপর ওই জায়গাটার কাছাকাছি এলাকায় ওর এক ইশকুলমাস্টার মামার কাছে বেড়াতে এসেই যত বিপত্তি।

মামার গাঁয়ের কুলাকরা হঠাৎ বিদ্রোহ করায় ও কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে।

ধোঁয়ার গন্ধওয়ালা ঝল্সানো হাঁসটাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে পরম তৃপ্তিতে ভোজ লাগালুম আমরা। আর বন্ধুর মতো দু-জনে গল্পগুজব শুরু করলুম।

সঙ্গী জুটে যাওয়ায় ভারি খুশি হয়েছিলুম সেদিন। আমার মনে ফের নতুন করে সাহস ফিরে এল। ভাবলুম, যে-বিপদে জড়িয়ে পড়েছি দু-জনে মিলে নিশ্চয় আমরা তা থেকে উদ্ধারের একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারব।

'সূর্য আকাশে থাকতে-থাকতে এস খানিক ঘুমিয়ে নিই,' আমার নতুন সঙ্গী পরামর্শ দিল। 'অন্তত এখন ঘুমটা তো ভালো হবে। রাত্রে যা ঠাণ্ডা, ঘুমনো যাবে না।'

একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে শুলুম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে ঢুলুনি এসে গেল। খুব সম্ভব ঘুমিয়েই পড়েছিলুম, কিন্তু একটা হতচ্ছাড়া পিঁপড়ে আমার নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ায় ঘুমটা গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে নাক ঝাড়লুম। আমার সঙ্গীটি দেখলুম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর টিউনিকের গলার বোতামটা খোলা আর কলারের ভেতরদিকে ক্যাম্বিসের আস্তরটা দেখা যাচ্ছে। দেখি, সেই আস্তরের গায়ে কালো কালিতে ছাপমারা কটা অক্ষর 'সি-টি. এ. সি. সি.'।

ভাবলুম, 'ওটা আবার কোন্ ইশকুল? আমার বেল্টের বক্ল্সে তো 'এ. টি. এচ. এস' এই চারটে অক্ষর খোদাই-করা। তার মানে, 'আর্জামাস টেক্নিক্যাল হাই স্কুল'। কিন্তু ওর দেখছি লেখা আছে প্রথমে 'সি-টি.', তারপর 'এ.সি.সি.'।' অক্ষর কটার মানে নানাভাবে বের করার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। ভাবলুম, 'ও জেগে উঠলে পর জানতে চাইব।'

গুরুপাক খাবার খেয়ে তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কোথাও জল ছিল না। তাই ঠিক করলুম খাদের একেবারে তলায় নামব। ধারণা ছিল ওখানে নিশ্চয়ই নদীর সন্ধান পাওয়া যাবে। সত্যিই ছোট নদীর সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু তার পাড়ের কাছটা পাঁকে এত পেছল যে নদীতে নামা সম্ভব হল না। একটা শুকনো জায়গার সন্ধানে তাই আরও খানিকটা এগিয়ে গেলুম। খাদের ভিতরে দেখলুম নদীর পাশে পাশে একটা ঘোড়া গাড়ি চলার সরু রাস্তা চলে গেছে। সেখানে ভিজে মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের দাগ আর ঘোড়ার টাটকা নাদ নজরে পড়ল। দেখে মনে

হল যেন সেই দিন সকালেই একপাল ঘোড়াকে ওই মেঠো পথ ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমার হাতের ছোট লাঠিটা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় সেটা তুলতে নিচু হতেই দেখি ছোট্ট চকচকে কী-একটা জিনিস রাস্তার কাদার মধ্যে গেঁথে আছে। মনে হল, কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে গিয়েছে ওটাকে। জিনিসটা তুলে কাদাটা মুছে নিলুম। দেখলুম, লাল তারার আকারের একটা ছোট্ট টিনের পদক ওটা। উনিশ শো আঠারো সনে লাল ফৌজের সৈনিকদের পশমী টুপীতে কিংবা শ্রমিক ও বলশেভিকদের ঢোলা কামিজের বুকে সাঁটা থাকত যে-ধরনের হাতে-বানানো ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া পদক, ওটাও ছিল সেই রকম।

'এখানে এটা এল কী করে?' রাস্তাটা ভালো করে পরীক্ষা করতে-করতে আমি অবাক হয়ে ভাবলুম। হেঁট হয়ে দেখতে-দেখতে এবার একটা খালি কার্তুজের খোল কুড়িয়ে পেলুম।

তেষ্টা-ফেষ্টা বেমালুম সব ভুলে সঙ্গীর কাছে একদৌড়ে ফিরে গেলুম আমি। সঙ্গীটি তখন আর ঘুমোচ্ছিল না। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। খুব সম্ভব আমাকেই খুঁজছিল ও।

নিচে থেকে ছুটে ওপরে উঠতে-উঠতে দূর থেকেই ওকে দেখে চেঁচিয়ে বললুম, 'লাল ফৌজ! লাল ফৌজ!'

যেন ওর পেছনে কেউ গুলি ছুড়েছে এমনিভাবে হঠাৎ হেঁট হয়ে ছিটকে একপাশে সরে গেল ও। তারপর আমার দিকে যখন ফিরল তখনও দেখি ভয়ে ওর মুখটা সিঁটকে রয়েছে।

আর কেউ নয় শুধুই আমি আছি দেখে ও আবার খাড়া হয়ে উঠল। তারপর যেন নিজের ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে রাগ দেখিয়ে বলল:

'একেবারে কানের কাছে পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছিল দ্যাখো-না...'

গর্বের সুরে আমি আবার বললুম, 'লাল ফৌজ।'

'কোথায়?'

'আজ সকালেই এই পথে গেছে। সারা রাস্তা জুড়ে ঘোড়ার খুরের দাগ, ঘোড়ার নাদও বেশ টাটকা। একটা কার্তুজের খোল পেলুম, আর এইটে...' ওকে তারামার্কা পদকটা দেখালুম।

সঙ্গীটি এবার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

'তা, আগে এ সব কথা বল নি কেন?' ও আবারও যেন কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললে। 'বাব্বাঃ, যা চেঁচিয়েছিলে-না... আমি ভাবলুম না জানি কী আবার হল।'

'চল, চল, তাড়াতাড়ি চল। ওই রাস্তা ধরেই যাই, চল। তাহলে ওদিককার প্রথম গাঁ-টায় পেঁছে যাব অখন। হয়তো ওরা এখনও ওখানেই বিশ্রাম করছে। কই, তাড়াতাড়ি কর। তাড়াতাড়ি মনস্থির করে ফ্যালো।'

'চল যাচ্ছি,' ও সায় দিল। তবে আমার মনে হল একটু যেন ইতস্তত করল। বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চল যাই।'

হঠাৎ একটা হাত তুলে গলায় বুলোতেই ওর কোটের কলারের আস্তরে-লেখা সেই 'সি-টি.এ.সি.সি.' অক্ষরগুলো আবার আমার নজরে পড়ল।

'আচ্ছা, ওই অক্ষরগুলোতে কী বোঝাচ্ছে বল তো?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম।

ও বলল, 'কোন্ অক্ষরগুলোতে আবার?' তারপর যেন বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি টিউনিকের বোতামটা লাগিয়ে নিল।

'ওই-যে, তোমার কলারে লেখা।'

'ভগবান জানে। এ তো আমার পোশাক নয়। অন্যের ব্যবহার-করা জামা কিনেছি আমি।'

'ইস, তাই বই কি... আমি বলতে পারি এটা কখনই অন্যের হাত-ফেরতা জামা নয়,' মজা পেয়ে ওর পাশে-পাশে চলতে-চলতে বললুম। 'চমৎকার মাপে-মাপে তৈরি জামাটা। আমার মা একবার আমার জন্যে অন্যের ব্যবহার-করা একটা ট্রাউজার্স কিনেছিলেন। তা সে পরে কার সাধ্যি! যতবার টেনে তুলি ততবারই সেটা কোমর থেকে হড়কে নেমে যায়।'

যতই আমরা গ্রামটার কাছে এগোতে লাগলুম ততই ঘন ঘন আমার সঙ্গী পথের মধ্যে থেমে পড়তে লাগল।

বলল, 'এত তাড়া কিসের? সন্ধের পর কিংবা গোধূলির আলোয় গ্রামে ঢোকা বেশি সুবিধে। সৈন্যরা যদি না-থাকে তো কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না। আমরা বাড়িগুলোর পেছনের উঠোন দিয়ে বেরিয়ে যাব। ব্যস, আজকালকার দিনে অচেনা জায়গায় নতুন লোকের কোথায় কখন বিপদ ঘটে, কে জানে।'

স্বীকার করতে হল, সন্ধে নাগাদই গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর করাটা বেশি নিরাপদ হবে। কিন্তু আমি আমাদের দলের লোকজনের সঙ্গে মিলতে এত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলুম যে তাড়াতাড়ি পা না-চালিয়ে পারছিলুম না।

গ্রামে ঢোকার খানিকটা আগে ঝোপঝাড়ে-ভরতি একটা খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল আমার সঙ্গী। বলল, রাস্তা থেকে সরে এসে পাশের ঝোপের মধ্যে বসে কী করা যায় আলোচনা করা যাক। সেই অনুযায়ী ঝোপের মধ্যে নেমে আসার পর ও বলল:

'দু-জনে একসঙ্গে গ্রামের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেয়াটা বোকামি হবে। আমি বলি কী, আমাদের মধ্যে একজন এখানে থাকুক, আরেক জন পাড়ার পেছনদিকের বাগান দিয়ে গাঁয়ে ঢুকে সব দেখে-শুনে আসুক। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। গাঁটা বড় বেশি চুপচাপ ঠেকছে, এমন কি একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। এমনও তো হতে পারে যে লাল ফৌজ এখানে আসেই নি, শুধু হতচ্ছাড়া কুলাকরা রাইফেল নিয়ে ওঁত্ পেতে বসে আছে।'

'আমি বলি কী, চল, দু-জনে একসঙ্গে যাওয়া যাক।'

বন্ধুভাবে আমার কাঁধে জোর এক চাপড় দিয়ে ও বলল, 'বোকামি কোরো না। তুমি এখানে থাক, আমি বরং সব দেখে-শুনে আসি। শুধু-শুধু তুমি বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? তুমি বরং আমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা কর, কেমন?'

ও চলে গেল। আমি মনে মনে ভাবলুম, 'ছেলেটা ভালো। একটু অদ্ভুত ধরনের, কিন্তু মনটা ভালো। আর কেউ হলে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি অন্যের ঘাড়ে ঠিক চাপিয়ে দিত, আর নয় তো পয়সা ছুড়ে ভাগ্যপরীক্ষার কথা বলত। ও কিন্তু নিজেই ইচ্ছে করে গেল।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটা ফেরত এল। যা ভেবেছিলুম তার চেয়ে তাড়াতাড়িই এসে গেল যেন। ওর হাতে একটা বেশ মোটা, ভারিগোছের লাঠি। মনে হল, তখুনি ওটা গাছ থেকে কেটে ছাল ছাড়িয়ে এনেছে।

'কী ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?' চেঁচিয়ে বললুম। 'তারপর, খবর কী?'

'ওখানে কেউ নেই,' দূর থেকেই মাথা নেড়ে বললে ও। 'ওদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। লাল ফৌজ নিশ্চয়ই অন্য পথ ধরে চলে গেছে, খুব সম্ভব এখান থেকে অল্প খানিকটা দূরে সুগ্‌লিন্‌কি বলে যে একটা গ্রাম আছে সেই দিকেই গেছে।'

আমার তখন মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তবু ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, 'ঠিক জানো তো? সত্যি বলছ, এ-গাঁয়ে কেউ নেই?'

'একটি প্রাণী নেই। গাঁয়ের ধারের এক কুঁড়েয় এক বুড়ির সঙ্গে দেখা, তাছাড়া পেছনদিকের বাগানে একটা ছেলের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। ওরা দু-জনে তাই তো বললে। মনে হচ্ছে আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে, ইয়ার। কাল সকালে আবার ওদের খোঁজে বেরোতে হবে।'

ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে চিন্তায় ডুবে গেলুম। আমার সঙ্গীর কথা কতটা সত্যি সে-সম্পর্কে সেই প্রথম আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। আরেকটা জিনিস যা আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল তা হল ওর ওই লাঠি। লাঠিটা ছিল ভারি ওক-কাঠের, মাথার দিকটায় আবার গোলমতো একটা গাঁট কেটে তৈরি করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল, ও তখুনি ওটা তৈরি করে এনেছিল। আমরা যেখানে ছিলুম সেখান থেকে গ্রামে পেঁছিতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগার কথা। আর যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে লোককে জিজ্ঞেস করে-করে গ্রামে যেতে হয় তাহলে তো পেঁছিতেই কম করে ঘণ্টা-দুই সময় লাগা উচিত। অথচ ছেলেটা বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যে এতটা পথ ঘুরে আবার ফিরে এল, আর শুধু তাই-ই নয়, মাথায় গাঁটওয়ালা ওক-কাঠের অমন একখানা লাঠিও বানিয়ে আনল ওই সময়ের মধ্যে। পকেটছুরি দিয়ে ওই রকম একখানা লাঠি বানাতে কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগার কথা। আচ্ছা, এও তো হতে পারে যে শেষপর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়ে ও কোনো কিছু খোঁজ করার চেষ্টা না করেই কাছাকাছি কোনো ঝোপে বসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে এসেছে? না, ব্যাপারটা তা নয়। তা যদি হত তাহলে ও নিজে থেকেই গিয়ে খোঁজ করার প্রস্তাব করত না। তাছাড়া, ওকে দেখেও ভিতু বলে মনে হয় না। কাজটার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি ছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু যা হোক, ওকেই উদ্ধারের একটা রাস্তা বের করে নিতে হয়েছে।

একবোঝা শুকনো পাতা জড়ো করে আমরা দু-জন পাশাপাশি শুয়ে পড়লুম। দু-জনে মিলে ভাগাভাগি করে গায়ে দিলুম আমার কোটটা। ওইভাবে আধ ঘণ্টাটাক চুপচাপ শুয়ে রইলুম দু-জনে। তারপর ভিজে মাটির জন্যে আমার একটা পাশে ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগলুম। তখন 'আরও কিছু পাতা যোগাড় করা দরকার,' ভেবে উঠে পড়লুম।

সঙ্গী ঘুম-জড়ানো গলায় বললে, "কী ব্যাপার? ঘুমোচ্ছ না কেন?'

'বড্ড স্যাঁতসেঁতে লাগছে। আরও কয়েক মুঠো পাতা যোগাড় করে আনি।'

আমাদের কাছাকাছি যত শুকনো পাতা ছিল সব আগেই জড়ো করে ফেলায় এখন পাতার সন্ধানে আমাকে সেই রাস্তার ধারের ঝোপগুলোয় যেতে হল। তখন সবে চাঁদ উঠছে, তাই অন্ধকারে ঠিকমতো খোঁজ করতে অসুবিধে হচ্ছিল। তাছাড়া গাছের ডালপালার জন্যেও পদে পদে বাধা ঘটছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ কানে এল। কেউ একজন হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। শুনে হাতের পাতাগুলো ফেলে দিয়ে আর ডালপালা মাড়িয়ে পাছে শব্দ করে ফেলি তাই দেখে-দেখে রাস্তার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেলুম।

একটা ঘোড়ায়-টানা চাষীর গাড়ি নরম, ভিজে, মেঠো রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে, প্রায় শব্দ না-করে যাচ্ছিল। আর গাড়িতে বসে দু-জন লোক নিচু গলায় কথা বলছিল।

একজন বলতে-বলতে যাচ্ছিল, 'সবই নিভ্ভর করে, বুইলে? যদি তুমি আমারে শুধোও তো বলি, আমার মনে হয় উনি খাঁটি কথা কয়েচে।'

অপর জন জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা কইচ তুমি? সেনাপতির? হ্যাঁ, অনুমান করি, ঠিক কথাই কয়েচে সে। তবে মুশ্‌কিল কী জান? ওরা থাকবে না কিনা। আজ এল, তোমার-আমার সঙ্গে কথাবাত্তা কইল, ওমা, কাল ফের আবার চলি গেল। আর ওরা চলে গেলেই কত্তাবাবুরা আসবে আর আমারে বলবে: 'ওহ্‌, তুই অমুক, তুই তমুক, আচ্ছা খেল দেখাচ্চিস বটে — কুলাকদের পেছনে লেগিচিস, কেমন? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা! লাগাও কোড়া!' লাল ফৌজের কী মাথা ব্যথা? এল আর গেল। আজ আবার আমাদের গাড়িগুলো বের করতি কইল সব। এদিকে কুলাকরা তো সব সময়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকচে। কাজেই মাথা চুলকে মশাই-মশাই তো করতি হচ্চেই, নাকি তুমিই বল!'

'কী কইলে? গাড়িগুলো বের করতি কইল?'

'লিচ্চয়। ফিয়োদর — ওই যে ওদের একজন সেপাই গো — আজ অনেক রাতে আমাদের ঠেলে তুলে বলে কিনা রাত বারোটার মধ্যি গাড়িটা তৈরি চাই।'

কথাগুলো দূরে মিলিয়ে গেল। হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি, কী ভাবব তা-ই ভেবে পেলুম না। তা হলে ব্যাপারটা সত্যি — লাল ফৌজ ওই গ্রামেই আছে। আর আমার সঙ্গীটি আমায় ধোঁকা দিয়েছে তাহলে। লাল ফৌজ রাত বারোটায়

গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এরপর আবার চেষ্টা করে ওদের নাগাল পাওয়া যাবে? কাজেই আমাদের তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের ধরতে হবে। কিন্তু, কিন্তু ছেলেটা আমায় ঠকাল কেন?

একবার মনে হল, থাক আর কাউকে দরকার নেই একাই রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে ছুট লাগাই। কিন্তু মনে পড়ল আমার কোটটা-যে আমাদের শোওয়ার জায়গায় রয়ে গেছে। 'নাঃ, ফিরেই যাই। এখনও ঢের সময় আছে। ছেলেটাকেও গিয়ে খবরটা দিই। ছেলেটা ভিতু বটে, তবু আমাদেরই তো একজন।'

একটা খড়মড় আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে দেখলুম। আমার সঙ্গীটি ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। বোঝা গেল, ও আমার পেছন-পেছন অনুসরণ করে এসেছিল। তাহলে ও-ও নিশ্চয় ঝোপে লুকিয়ে থেকে দুই চাষীর মধ্যেকার কথাবার্তা শুনেছিল।

'আচ্ছা, কী করে তুমি...' আমি অনুযোগের সুরে আরম্ভ করলুম।

জবাবে উত্তেজিতভাবে ও বলল, 'এদিকে এস!'

আমি রাস্তার দিকে হাঁটা শুরু করলুম। ও আমার পেছনে-পেছনে এল।

হঠাৎ লাঠির একটা সজোর ঘা খেয়ে লুটিয়ে পড়লুম। মাথায় লোমের টুপির আড়াল থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম ঘা খেয়ে। যখন চোখ খুললুম, দেখলুম উবু হয়ে বসে চাঁদের আলোয় আমার সঙ্গীটি আমার ট্রাউজার্সের পকেট থেকে ইতিমধ্যে টেনে-বের-করে-নেয়া পরিচয়-পত্রটায় চোখ বুলোচ্ছে।

এতক্ষণে জ্ঞানোদয় হল আমার। 'ও, ওর এ-ই মতলব ছিল। তাহলে যা ভেবেছিলুম তা নয়, মোটেই ভয় পেয়ে ও মিথ্যে কথা বলে নি। ও জানত, লাল ফৌজ ওই গ্রামেই আছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই আমায় সেকথা বলে নি, কারণ রাত্রে ও আমার সঙ্গে থেকে আমার পরিচয়-পত্রটি হাতাবে, এই ছিল মতলব। ও ভিতুও নয়, বিদ্রোহীও নয়, কারণ কুলাকদেরও ও ভয় পাচ্ছিল। ও দেখছি তাহলে একেবারে খাঁটি শ্বেতরক্ষী।'

অল্প একটু উঁচু হয়ে ঝোপের মধ্যে গুড়ি মেরে ঢোকার চেষ্টা করলুম। ছেলেটা এটা লক্ষ্য করে পরিচয়-পত্রটা ওর চামড়ার ব্যাগে গুঁজে দিয়ে আমার কাছে এল।

নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'কী, এখনও প্রাণটা বেরোয় নি, না? ভেবেছিলি মস্ত একজন কমরেড পেয়ে গেছিস, তাই না, কুত্তা কাঁহাকা? আমি দোনে যাচ্ছি ঠিকই,

তবে তোদের ওই শুয়োরের বাচ্চা সিভের্সের কাছে নয়। যাচ্ছি কোথায় জানিস? — যাচ্ছি জেনারেল ক্রাস্‌নভের দলে যোগ দিতে।'

আমার দু-পা দূরে দাঁড়িয়ে ও হাতের ভারি লাঠিটা নাচাচ্ছিল।

বুকটা আমার ধকধক করতে লাগল। কোনো একটা দৃঢ়, কঠিন জিনিসের গায়ে বারবার আমার তোলপাড়-করা বুকটা ঠেকছিল। এক পাশ ফিরে শুয়ে ছিলুম আমি, ডান হাতটা ছিল বুকের ওপর। আর খুব সাবধানে, প্রায় বোঝা-যায়-না এমন ভাবে আমার আঙুলগুলো জ্যাকেটের নিচে, যেখানে গুপ্ত পকেটের মধ্যে ছিল আমার মাওজারটা, সেইখানে ঢুকতে লাগল।

ছেলেটা তখন যদি আমার হাতের এই নড়াচড়া লক্ষ্য করত তাহলেও ও সেদিকে নজর দিত না, কারণ আমার মাওজারের কথা ওর জানা ছিল না। এদিকে আঙুল দিয়ে মাওজারের গরম হাতলটা চেপে ধরে আস্তে-আস্তে সেফ্‌টি ক্যাচ্‌টা খুলে নিলুম। ইতিমধ্যে আমার শত্রু আমার কাছ থেকে আরও দু-তিন পা পিছিয়ে গেছে, হয় আমায় ভালোভাবে ঠাহর করে দেখতে, আর নয় তো (আর এই শেষের কারণটার সম্ভাবনাই ছিল বেশি) সপাটে লাঠি চালানোর সুবিধের জন্যে। হঠাৎ, কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট দুটো প্রাণপণে চেপে আর অসাড় হয়ে-যাওয়া হাতটা সোজা করে পিস্তলটা পকেট থেকে টেনে বের করে ঝাঁপিয়ে-আসতে-তৈরি লোকটার দিকে তাক করলুম।

এক মুহূর্তের জন্যে ওর ভয়ে-বিকৃত মুখখানা দেখতে পেলুম। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওর চিৎকার কানে এল একবার। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মতো আমার আঙুল ট্রিগারে টান দিল...

আমার কাছ থেকে মাত্র হাত-দুই দূরে, মুঠো-করা হাতদুটো আমার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ও আছড়ে পড়ল। লাঠিটা গড়িয়ে পড়ল পাশে।

ঘাসের ওপর পাথরের মতো ভারি মাথাটা নামাতে-নামাতে আমার বিহ্বল মনের মধ্যে খালি একটা চিন্তাই তখন চমকে উঠল, 'ওকে খুন করে ফেলেছি আমি।'

অনেকক্ষণ ওই একই ভাবে শুয়ে রইলুম, হতবুদ্ধি আর অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায়। তারপর আস্তে-আস্তে জ্বর কমে এল। মাথা থেকে রক্ত গেল নেমে। আর হঠাৎ অসম্ভব শীত ধরে গেল আমার, দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল। উঠে বসলুম। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল সামনে আমার-দিকে বাড়ানো হাত দুটোর ওপর। সে এক

ভয়াবহ দৃশ্য! তাহলে এই হল, আসল বাস্তব যাকে বলে। এর আগে পর্যন্ত আমার জীবনে আর যা-কিছু ঘটেছিল তা ছিল নেহাতই খেলা মাত্র। এমন কি আমার বাড়ি থেকে পালানো, এমন কি সরমোভোর শ্রমিকদের সেই চমৎকার সৈন্যদলে আমার শিক্ষানবিসি, এমন কি এর আগের দিনের সেই জঙ্গলে রাত কাটানোও এর তুলনায় খেলা ছাড়া কিছু ছিল না। হঠাৎ অসম্ভব এক আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। আমি একটা পনর বছর বয়েসের ছেলে, যাকে আমি সরাসরি খুন করেছি তার দেহটা নিয়ে একা সেই অন্ধকার জঙ্গলে রাত কাটাচ্ছিলুম, সে-ই ভয়। আমার কানের ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, কপালে দেখা দিল হিম ঘাম।

ভয়ই আমাকে চঞ্চল করে তুলল। উঠে পড়ে পা টিপে-টিপে মড়ার কাছে গিয়ে আমার পরিচয়-পত্রসুদ্ধ ওর চামড়ার ব্যাগটা চট করে তুলে নিলুম। তারপর পিছু হেঁটে-হেঁটে সারাক্ষণ মাটিতে-পড়ে-থাকা দেহটার দিকে চোখ রেখে ফাঁকা জায়গাটার ধারের ঝোপের দিকে যেতে লাগলুম। হঠাৎ এক সময় উলটোমুখে ঘুরে ঝোপের দিকে দৌড়লুম আর সোজা ঝোপঝাড় পেরিয়ে, রাস্তায় পড়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলুম। তখন মাথায় একমাত্র চিন্তা, যেখানে মানুষজন আছে সেখানে যেতে হবে আমায়, জঙ্গলে একা থাকার চেয়ে আর যে-কোনো জায়গাই ভালো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাঁয়ে ঢোকার পর প্রথম কুঁড়ে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল:

'এই, এই, কোন্ চুলোয় মরতে ছুটেছিস? হেই, বেঁটে বামন! থাম্ শিগ্গির, হেঁড়ে-মাথা কোথাকার!'

ঘরের ছায়ার ভেতর থেকে রাইফেল-হাতে ছুটে এল একটা লোক। তারপর আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কোথায় ছুটে চলেছিস, শুনি? আসছিসই-বা কোথা থেকে?' আমার মুখটা চাঁদের আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে রক্ষী-সেপাই জিজ্ঞেস করল।

হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম, 'তোমাদের কাছেই। তোমরা তো কমরেড, তাই না?'

'আমরা কমরেড আছি ঠিকই,' ও বাধা দিল, 'কিন্তু তুমি কে?'

'আমিও তাই,' থমকে থমকে শুরু করলুম আমি। কিন্তু তখনও স্বাভাবিকভাবে

দম ফেলতে না-পারায় আর কোনো কথা না-বলে চামড়ার ব্যাগটা ওর হাতে তুলে দিলুম।

'তুমিও তাই, উঁ?' রক্ষী এবার একটু খুশি-খুশিভাবে প্রশ্ন করল। যদিও তখনও পর্যন্ত ওর সন্দেহ একেবারে কাটে নি। বলল, 'ঠিক আচে, তাইলে চল কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করি গিয়ে।'

বেশ রাত হওয়া সত্ত্বেও সারা গ্রাম তখনও জেগে। ঘোড়াগুলো চিঁহি-চিঁহি ডাক ছাড়ছে। চাষীদের গাড়িগুলো বাড়ির উঠোন থেকে বের করার জন্যে ক্যাঁচ্‌কোঁচ আওয়াজ করে গেট খোলার শব্দ হচ্ছে। কাছেই কে একজন চেঁচিয়ে ডাকল:

'দোকুকিন! দো-কু-কিন! কোন চুলোয় মরতি গেল সে?'

'আঃ, এত চ্যাঁচামেচি কিসের, ভাস্‌কা?' যে চিৎকার করছিল তার সামনাসামনি এসে আমার সঙ্গী পাহারাদারটি জিজ্ঞেস করলে।

অপর লোকটি রাগত গলায় জবাব দিল, 'মিশ্‌কারে খুঁজচি। আমাদের দু-জনার মতো চিনি দিয়েচে ওর ঠেঁয়ে, তা সবাই কইচে ওরে নাকি প্যাট্রোল-দলের সঙ্গে আগে আগে পাঠিয়ে দিয়েচে।'

'তাতে হয়েচে কী? কাল ও তোমারে চিনি দেবে'খন।'

'দিলিই হল? মরে যাই আর কী! ও যা মিষ্টিখোর, সকালে চায়ের সঙ্গে সবটুকু সাবাড় করি বসে থাকবে অখন!'

এই সময়ে আমার দিকে নজর পড়ে গেল লোকটির। সঙ্গে সঙ্গে কথার সুর বদলে কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলে:

'ও কারে পাকড়াও করি আনলে, চুবুক? কী, সদর দপ্তরে লিয়ে যাচ্ছ? তা যাও। আচ্ছা করে ওরে শিক্ষে দিয়ে দেবে'খন ওখেনে। হুঃ, শোরের বাচ্চা কোথাকার,' হঠাৎ আমায় গালাগাল দিয়ে উঠল লোকটা। তারপর এমন একটা ভঙ্গি করলে যেন ওর রাইফেলের বাঁট দিয়ে খোঁচা দেবে আমায়।

কিন্তু আমার সঙ্গীটি ওকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় গর্জন করে উঠল:

'যাও, যাও, নিজের কাজে যাও দিকি। সব তাতে মাথা গলানো চাই। এ্যাঃ, দ্যাখো-না, যেন একটা খ্যাপা কুকুর, কে, কী বিত্তান্ত, জানা নেই শোনা নেই মানুষজন দেখলিই কামড়াতে আসে!'

'ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক! ক্লিঙ্ক, ক্লিঙ্ক!' এমন সময় পাশ থেকে ধাতুর তৈরি জিনিসের টুংটুং আওয়াজ কানে এল। চেয়ে দেখলুম একজন লোক। পায়ের গোড়ালিতে তাঁর ঘোড়সওয়ারের নাল লাগানো, মাথায় কালোরঙের পাপাখা, কোমরে মাটি পর্যন্ত লম্বা ঝকঝকে একটা তরোয়াল আর কাঠের খাপের মধ্যে একটা মাওজার আর হাতের ওপর আড়াআড়িভাবে ঝোলানো একটা চাবুক নিয়ে একটা ঘোড়াকে পাশের একটা গেট থেকে বের করে আনছেন লোকটি।

লোকটির পাশে-পাশে একজন বিউগ্‌ল-বাদকও হেঁটে আসছিল।

ঘোড়ার জিন থেকে ঝোলানো রেকাবের ওপর এক-পা রেখে আগের লোকটি হাঁকলেন, 'একজোট হও সব।'

সঙ্গে সঙ্গে আস্তে-আস্তে বিউগ্‌ল বেজে উঠল, 'টা-টা-রা-টা... টাটা... টা-টা-টা-টা-আ-আ...'

'শেবালভ,' আমার সঙ্গী লোকটিকে ডাকল। 'এক মিনিট দাঁড়াও দেখি। তোমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্যি একজনরে এনেচি।'

ঘোড়ার রেকাবের ওপর তখনও একটা পা রেখে লোকটি বললেন, 'একজন লোকেরে? তা, কে সে?'

'ও কইচে, ও আমাদেরই নোক। অনুমান করি, সঙ্গে ওর কাগজপত্তর আচে।'

লাফিয়ে জিনের ওপর চড়ে বসতে-বসতে কম্যান্ডার বললেন, 'আমার এখন সময় নেই। তুমি তো পড়তি পার, তা তুমিই কাগজপত্তর পরীক্ষে কর না কেন, চুবুক? ও যদি বন্ধু হয় তো যেখানে যেতি চায় যেতি দাও না কেন।'

আবার একা পড়ে যাওয়ার ভয় চেপে ধরল আমায়। আমি বলে উঠলুম, 'না-না, আমি আর কোথাও যাব না। গত দু-দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আর-না। এখন আপনাদের সঙ্গে থাকতে এসেছি।'

'আমাদের সঙ্গে?' কালো পাপাখা-মাথায় লোকটি প্রশ্ন করলেন। 'কিন্তু আমাদের তো তোমারে দরকার না-ও থাকতি পারে!'

'হ্যাঁ, দরকার আছে!' জিদ ধরে বললুম আমি। 'একা-একা নিজেকে নিয়ে কী করব তাহলে?'

এবার আমার সঙ্গীও সায় দিলেন, 'ঠিক কথা। ও যদি আমাদের নোক হয়, তবে একা-একা করবে কী ও? আজকাল এ-সব এলেকায় একা-একা ঘুরে বেড়ালি

কত বিপদ-আপদ ঘটতি পারে। শেবালভ, একটু বুদ্ধি করে চলা দরকার। যদি ও মিথ্যে কয়ে থাকে তো ভেন্ন কথা, তবে যদি ও আমাদের নোক হয় তাইলে ওরে অযথা ঝুলিয়ে রাখচ কেন? ঘোড়া থেকে নাবো দেখি, অনেক সময় আচে এখনও।'

'আঃ, চুবুক,' এবার কড়া সুরে বললেন কম্যান্ডার। 'পের্‌ধানের সঙ্গে ওইভাবে কথা বলতি হয়? আমি কি কম্যান্ডার, না, না? বলি, শুধোই তোমারে — আমি কম্যান্ডার কিনা?'

'তা তো বটেই,' নির্বিকারভাবে মেনে নিলেন চুবুক।

'তাই যদি হয় তবে তুমি কইলে কি কইলে না বয়েই গেল আমার। আমি নাবব।'

বলে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়ে লাগামটা ছুড়ে বেড়ার গায়ে আটকে দিলেন ঘোড়সওয়ার। তারপর তরোয়ালের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ করতে-করতে কুঁড়েঘরটার দিকে চললেন।

কুঁড়েঘরটায় না-ঢোকা' পর্যন্ত লোকটিকে ভালো করে দেখতে পাই নি। এবার লম্ফর বাতির আবছা আলোয় ঠাহর করে দেখলুম। লোকটির দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। লম্বা সরু মুখটা এবড়োখেবড়ো। মোটা-মোটা শণের রঙের একজোড়া ভুরু নাকের ওপর এসে মিশে গেছে। আর জোড়া-ভুরুর তলা থেকে তাকিয়ে আছে একজোড়া দয়ালু চোখ। তবে দেখলুম লোকটি মুখখানাকে কঠোর করে তোলার জন্যে ইচ্ছে করে চোখ দুটো কুঁচকে রয়েছেন। আমার কাগজপত্র পড়ে উঠতে তিনি এত বেশি সময় নিতে লাগলেন আর পড়ার সময় কথাগুলো মনে-মনে উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে ওঁর ঠোঁট দুটো এমনভাবে অল্প-অল্প নড়তে লাগল যে বুঝলুম লোকটি তেমন লেখাপড়া-জানা নন। পরিচয়-পত্র পড়া শেষ হলে চুবুককে ওটা ফেরত দিয়ে সন্দেহভরা গলায় বললেন:

'এটা যদি জাল কাগজ না হয় তো বুঝতি হবে খাঁটি দলিল'। তা, তুমি কী কও, চুবুক?'

বাঁকা পাইপে মাখোর্‌কা তামাক ভরতে-ভরতে নির্বিকারভাবে সায় দিলেন অন্যজন, 'হুঁহুঁ!'

'তা, তুমি এখেনে কী করছিলে?' কম্যান্ডার এবার আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তেজিতভাবে আমার কাহিনী বলে গেলুম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল ওঁরা

হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, ওঁরা বিশ্বাস করেছেন। কারণ, আমার গল্প বলা শেষ হলে দেখলুম কম্যান্ডারের চোখ আর কুঁচকে নেই, বরং চুবুকের দিকে ফিরে তিনি এবার সদয়ভাবেই বললেন:

'মনে লিচ্ছে কী, আমাদের এই ছেলেটা যদি মিথ্যে কথা না-কয়ে থাকে তো বুঝতি হবে সত্যি কথাই কইচে! তা তুমি কী কও, চুবুক?'

বুটের তলায় ঠুকে-ঠুকে পাইপের ছাইটা ঝাড়তে-ঝাড়তে চুবুক আবার নির্বিকারভাবে সায় দিলেন, 'হুঁহুঁ!'

'তাইলে, ওরে লিয়ে কী কাম আমাদের?'

'ওরে এক লম্বর কোম্পানিতে ভরতি করে লিই, নাকি বল? পাশ্‌কো মারা পড়ার পরে যে রাইফেলটা রয়ে গ্যাচে সুখারেভ সেটা ওরে দিক?' চুবুক বুদ্ধি যোগালেন।

টেবিলে আস্তে-আস্তে আঙুলের টোকা দিতে-দিতে কম্যান্ডার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। পরে বললেন:

'ঠিক আচে। চুবুক, তুমি ছেলেটিরে লিয়ে এক লম্বর কোম্পানিতে যাও। গিয়ে সুখারেভরে কও পাশ্‌কো মারা পড়ার পরে যে রাইফেলটা পড়ে আচে সেটা ওরে দিতে। কিছু গুলিও দিতে কোয়ো — মাথাপিছু যা বরাদ্দ আচে তাই। আমাদের বিপ্লবী বাহিনীর নামের খাতায় ওর নামটাও তুলে লিতে কোয়ো।'

চিঙ্ক-চিঙ্ক! ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক! — আবার সেই তরোয়াল, গোড়ালির নাল আর মাওজারের মিলিত আওয়াজ উঠল। ঠেলে ঘরের দরজাটা খুলে কম্যান্ডার ধীরেসুস্থে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'চলি এস না কেন,' চুবুক বললেন। তারপর হঠাৎ আমার পিঠটা চাপড়ে দিলেন।

ফের বেজে উঠল বিউগ্‌ল, মিষ্টি নাচের ছন্দে। ঘোড়াগুলো আগের চেয়ে জোরে-জোরে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজ করে উঠল, গাড়িগুলোর ক্যাঁচকোঁচ শব্দও বেড়ে উঠল আগের চেয়ে। আর আমি-যে কী সুখী হলুম তা বলতে পারি না। হাসতে-হাসতে আমার নতুন কমরেডদের সঙ্গে দেখা করতে চললুম। সেদিন সারা রাত হাঁটলুম আমরা। সকালে রাস্তার ধারের একটা ছোট রেলস্টেশনে ট্রেনে চাপলুম। সন্ধেবেলায় একটা রঙ-চটা এঞ্জিন আমাদের সৈন্যবাহী ট্রেনে জোতা হল, আর আমরা ট্রেনে করে চললুম দক্ষিণদেশে দোন্‌বাস-অঞ্চল দখল-করে-রাখা জার্মান, গাইদামাক

আর ক্রাস্নভপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শ্রমিকদের ছোট-বড় নানা সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে।

আমাদের বাহিনীর বেশ একটা লম্বা-চওড়া নাম ছিল। নামটা হল, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিশেষ সেনাবাহিনী। বাহিনীতে অবিশ্যি লোক ছিল না বেশি, মোটে দেড় শোর মতো হবে। আমরা ছিলুম পদাতিক বাহিনী, কেবল ফেদিয়া সির্ত্সভের নেতৃত্বে পনেরো জন অশ্বারোহীর একটি স্কাউট দল আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাদের বাহিনীর কম্যান্ডার ছিলেন ওই পূর্বকথিত শেবালভ। পেশায় ইনি ছিলেন মুচি। সদ্য লড়াইয়ে নাম লিখিয়েছিলেন। মনে হত, সুতোয় লাগানোর জন্যে ব্যবহার করার সময় ধারালো মোমের কানায় লেগে ক্ষতবিক্ষত হাতের ঘা ওঁর তখনও যেন শুকোয় নি, হাতের কালো কালির দাগও যেন ওঠে নি তখনও। আমাদের এই কম্যান্ডারটি ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। দলের ছেলেরা ওঁকে যেমন শ্রদ্ধা করত, তেমনই ওঁর কিছু কিছু দুর্বলতার জন্যে হাসাহাসিও করত। এমনই একটা দুর্বলতা ছিল ওঁর সদাসর্বদা লোক-দেখানো আড়ম্বরের ভাবটা। ওঁর ঘোড়া সাজানো থাকত লাল ফিতে দিয়ে আর ওঁর গোড়ালিতে-বাঁধা ঘোড়সওয়ারের নালটা (ওটা সম্ভবত উনি কোনো যাদুঘর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন!) ছিল অসম্ভব লম্বা আর বাঁকানো, এমন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার যে একমাত্র ছবিতে মধ্যযুগীয় নাইটদের পায়ে ছাড়া আর কোথাও ও-জিনিস চাক্ষুষ করি নি। এছাড়া, ওঁর নিকেলের গিল্টি-করা তরোয়ালখানা পোঁছত মাটি পর্যন্ত, আর মাওজারের কাঠের খাপের গায়ে সাঁটা পেতলের চাকতিতে খোদাই-করা ছিল এই উপদেশবাক্যটি: ‘আমি মরব বটে, তবে, ওরে ঘৃণ্য, তোকেও বিনষ্ট করব!’ শোনা যেত, উনি স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে বাড়িতে রেখে এসেছেন। তার মধ্যে বড় ছেলেটি তখনই চাকরিবাকরি করত। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর উনি ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে এসে জুতো-সেলাইয়ের কাজ শুরু করে দেন। কিন্তু কাদেতরা যখন ক্রেমলিন আক্রমণ করল, উনি তখন ছুটির দিনের সেরা পোশাকটি গায়ে চড়িয়ে কোনো এক খরিদ্দারের ফরমায়েসমাফিক নিজেরই সদ্য-তৈরি উঁচু কানাওয়ালা বুটজোড়ায় পা গলিয়ে আরবাতের শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে একটা রাইফেল সংগ্রহ করে নিলেন। আর তখন থেকেই উনি, ওঁর নিজের ভাষায়, ‘বিপ্লবের সঙ্গে নিজের কপালটাও নিলেন জুড়ে’।

এর তিন দিন পরে শাখ্‌ত্‌নায়া রেলস্টেশনের ঠিক আগে আমাদের বাহিনী তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

কোথা থেকে এক ছোকরা অশ্বারোহী সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে এসে হাজির হল আর শেবালভের হাতে একখানা মুখ-আঁটা খাম ধরিয়ে দিয়ে হেসে, যেন ভারি একটা সুখবর দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে, বলল:

'গতকাল ক্রাইউশ্‌কোভোতে জার্মানরা আমাদের নোকজনেরে এক্কেবারে ছাগলভেড়ার মতো কচুকাটা করি দিল। চু-চু, এক্কেবারে রামধোলাই দিল!'

আমাদের বাহিনীর ওপর ভার পড়ল শত্রুর পেছনদিকে অনুপ্রবেশের। বলা হল, গ্রামে-গ্রামে ছড়ানো শত্রুর ছোট-ছোট দলগুলোকে আমরা যেন এড়িয়ে যাই আর বেগিচেভের নেতৃত্বে পরিচালিত দনেত্‌স্‌ খনি-মজুরদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করি।

'কিন্তু ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করি?' ম্যাপের ওপর আঙুলের খোঁচা দিতে-দিতে শেবালভ বললেন। 'খনি-মজুরদের বাহিনীর খোঁজটা করি কোথায়? ওরা লিখচে: 'ওলেশ্‌কিনো আর সোস্‌নভ্‌কার মাঝামাঝি'। ঠিক-ঠিক জায়গাটা বাতলাও, তা না। বলা তো খুব সোজা 'যোগাযোগ কর'। কোথায়? না, 'অমুক আর অমুকের মধ্যি', বাঃ...'

সেনাবিভাগের দপ্তর-প্রধানদের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন শেবালভ। ওরা না-বোঝে কোনো একটা জিনিস, খালি কথায়-কথায় হুকুমনামা লিখতে ওস্তাদ আর তারপর কোম্পানি-কম্যাণ্ডারদের ডেকে পাঠাতে। তবে 'দপ্তরের নোকজনরে' গালাগাল দিলে কী হবে, স্বাধীনভাবে এই একটা কাজ করার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায়, আরও বেশি সৈন্যের কোন একটা বাহিনীর তাঁবে কাজ করতে না হওয়ায় শেবালভ আসলে খুশিই হলেন।

আমাদের বাহিনীতে ছিলেন তিনজন কোম্পানি-কম্যাণ্ডার। পরিষ্কার কামানো চাঁচাছোলা মুখ, ঠাণ্ডা মেজাজের চেক-দেশীয় গাল্‌দা, গোমড়া মুখো এন-সি-ও সুখারেভ আর তেইশ বছরের হাসিখুশি অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে আর নাচিয়ে ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভ। যুদ্ধে আসার আগে ফেদিয়া ছিল গোরুর রাখাল।

একটা ফাঁকা জায়গায় ম্যাপটাকে ঘিরে ওঁরা বসে ছিলেন সবাই। আর ওঁদেরও ঘিরে বসে ছিল লাল ফৌজের লোকজন।

হুকুমনামার কাগজখানা তুলে ধরে শেবালভ বলছিলেন, 'আচ্ছা, এই যে হুকুমনামা আমি পেয়েচি এ-অনুযায়ী আমাদের শত্রুর পেছনদিক দিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যি ঢুকতি হবে আর কাজ করতি হবে বেগিচেভের বাহিনীর কাছাকাছি। আজ রাতেই রওনা হতি হবে আমাদের। শত্রুর নাগালের মধ্যি না-গিয়ে, একটু দূরে দূরে থেকে এগোতে হবে আমাদের, ছোঁয়াছুঁয়ি হলি চলবে না। কথাটা পরিষ্কার বুয়েচ তো?'

'ও তো একটা মস্ত কথা হল — ছোঁয়াছুঁয়ি হলি চলবে না। বলি, ছোঁয়া বাঁচাব কেমন করি?' ধূর্তামিমাখা ভালোমানুষির ভঙ্গিতে ফেদিয়া সিরত্‌সভ বলল।

ফেদিয়ার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে ওকে হাতের ঘুসি দেখিয়ে শেবালভ বললেন, 'কেমন করি আবার? না-ছুঁয়ে। তোমারে চিনি না? তুমি বড় শয়তান। এ্যাই, দাঁড়া দেখাচ্ছি! খবরদার, বাঁদরামি রাখ! আচ্ছা, তাইলে আজ রাতেই আমরা রওনা দিচ্চি, কেমন?' শেবালভ বলে চললেন, 'গাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না। মেশিনগান আর গুলিবারুদ ঘোড়াগুলোর উপর বস্তাবোঝাই করে নিতে হবে — কোনো চ্যাঁচামেচি কি ঘড়ঘড় আওয়াজ হলি চলবে না। পথে যদি কোনো গাঁ পড়ে তো চুপচুপ করে পাশ কাটিয়ে চলি যাব, মড়ার খোঁজে ভুখা কুত্তার মতো গাঁয়ে ঢোকা চলবে না। এটা বিশেষ করে তোমারে কচ্চি, ফেদিয়া। তোমার ওই-যে সব পিপুফিশুর দল, খামার দেখলি হল, ওদের আর কথা নেই, জায়গাটা ওদের পথে পড়ে কী না সে বাছবিচারের বালাই নেই ওদের, অমনি সোজা ননীছানার খোঁজে খামারে ঢুকি পড়বে।'

'হামার লোগজন ভি ওই কিসিমের আছে,' চেক গাল্‌দাও ত্রুটিস্বীকার করলেন। 'দোসরা বার স্কাউট লোগ তো এক বারকোশ মাখা-ময়দা এনে হাজির করে দিলে। ব্যস রে, ব্যস! তো হামি বললম কি: 'আরে রসুই না-করা ময়দা আনলি কেন?' তো ও-লোগ হামায় বলল: 'হামরা আগুনমে সেঁকে লিব'।'

ওঁর কথা শুনে সকলেই হাসল। এমন কি শেবালভও মুখ টিপে না হেসে পারলেন না।

'দেবাল্‌ত্‌সেভোয় কাণ্ডটা ঘটেছিল,' ভাস্‌কা শ্মোকভ হাসতে-হাসতে বলল। 'আমাদের নামে নালিশ করচেন কত্তা। বাহিনীর আগে-আগে আমরা ঢ্ঁড়ে দেখছিলাম, ঢ্ঁড়তি ঢ্ঁড়তি এক কসাকের খামারবাড়িতে গিয়ে হাজির। ধনী কসাক-চাষী। বাড়ির মধ্যি থেকে কে একজন গ্লি চালাতে নাগল আমাদের তাক করি, তা সত্ত্বেও বাড়িতে সেঁধিয়ে পড়লাম আমরা। ঢুকে দেখি, ভোঁ-ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। উনোনটা সাঁ সাঁ করে জ্বলচে আর টেবিলের ওপর ময়দার বারকোশটা বসানো। তা, বাড়িটায় আগ্ন লাগিয়ে দে' ময়দার বারকোশ লিয়ে কেটে পড়লাম। তারপর সন্ধেবেলা আগ্নে জেবলে সেঁকে লিলাম ময়দার তালটা। আহ্‌, যা হয়েছিল খেতে না, একদম ফাস্‌টো কেলাস, কেকের মতো।'

'খামারবাড়িটায় আগ্ন লাগিয়ে দিলে?' আমি জিজ্ঞেস করল্ম। 'খামারবাড়ি প্ড়িয়ে দিলে এ কেমনধারা কথা?'

'একদম ভস্ম করে দিলাম গো,' নির্বিকারভাবে বলল ভাস্‌কা। 'তা পারব না কেন শ্নি? মালিক যদি তোমারে তাক করে গ্লি ছোড়ে তাইলে তোমায় পারতেই হয়। ভারি বজ্জাত ওরা, ওই কসাকগ্লা। খামারের মালিক নোকটা জব্বর ধনী, ও ফের একটা লতুন বাড়ি বানিয়ে লেবে'খন। গাইদামাক ডাকাতদের দলেও ভিড়বে না তাইলে।'

'কিন্তু এতে লোকটা আরও বেশি খেপে যাবে না? এর জন্যেই লাল ফৌজকে ও আরও বেশি করে ঘেন্না করবে-যে?'

এবার ভাস্‌কা গম্ভীরভাবে বললে, 'নাঃ, আরও বেশি ঘেন্না করে কী করি? চাইলেও ধনী নোকরা আমাদের আর বেশি ঘেন্না করতি পারে না। আমাদের দলেরই একজনা, পেত্‌কা কক্‌শিন, ওদের হাতে পড়েছিল। তা, ওরা তারে খ্নে করার আগে তিন দিন ধরি সমানে বেতিয়েছিল। বাঃ, আর তুমি কিনা ওদের আরও বেশি ঘেন্না করার কথা কচ্ছ!'

সেই রাত্রে যাত্রা শ্র্ করার আগে বাহিনীর সৈনিকরা টিনের পাত্রে শ্য়োরের চর্বি মিশিয়ে পরিজ রান্না করল আর উনোনের গরম ছাইয়ে আল্ প্ড়িয়ে নিল। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে ঘাসে গড়িয়ে নিল একচোট। নিজের নিজের রাইফেল সাফস্তরো করে আর যে-যার মতো বিশ্রাম করতে লাগল। কোম্পানি-কম্যাণ্ডার স্খারেভের ঘোড়াগাড়িতে একটা প্রনো ফৌজী ওভারকোট ছিল লক্ষ্য করল্ম।

কোটটার নিচের কিনারায় কয়েকটা পোড়া গর্ত থাকা সত্ত্বেও তখনও ওটা পরবার মতো ছিল। তাই সুখারেভের কাছে কোটটা চাইলুম।

'ওটা দিয়ে করবে কী?' উনি কর্কশভাবে বললেন। 'তোমার লিজেরই তো ভালো এট্টা পশমী কাপড়ের কোট আচে। এ-কোটটা আমার দরকার। এটা দিয়ে আমার এট্টা ট্রাউজার বানাব।'

আমি বললুম, 'আমারটা দিয়ে বানান না। না-না, সত্যি। আর সবাই ফৌজী খাকি কোট পরেছে, কেবল আমিই পরেছি কালো কোট। ঠিক একেবারে কাকের মতো দেখাচ্ছে।'

'সত্যি কচ্চ?' সুখারেভ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। ওঁর ধ্যাবড়ামতো চাষী-মুখটা অবিশ্বাস্য এক হাসিতে ভরে উঠল। 'সত্যি তুমি বদলাবদলি করতে চাও, অ্যাঁ? কিন্তু,' উনি দ্রুত বলে চললেন, 'কিন্তু ওভারকোট-গায়ে-দেয়া সেপাই কে কবে দেখেচে? দুনিয়ায় এর তুলনা মিলবে না যে। আচ্ছা, ঠিক আচে। ফৌজী ওভারকোটটা কিন্তু এক-আধটুক পোড়া আচে, তা ওতে কিছু যাবে-আসবে না। ওটারে ছোট করে লিলেই চলবে'খন। আর আমি এট্টা ছাইরঙা পাপাখাও দেব'খন — আমার এট্টা বাড়তি আচে কিনা।'

আমরা জামা বদলাবদলি করে নিলুম। দাঁও কষতে পেরে দু-জনেই খুব খুশি। তারপর এতদিনে লাল ফৌজের এক সত্যিকার সিপাইয়ের মতো পোশাক পরে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে আমি যখন চলে আসছি, তখন শুনলুম উনি ভাস্‌কাকে বলছেন:

'সুবিধে পেলেই এটারে দেশে গিন্নির কাচে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, ছোঁড়া ওভারকোটটা লিয়ে করবে কী? গুলিগোলা নাগলে তো পুরো কোটটাই বরবাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, কোটটা পেয়ে গিন্নি ভারি খুশি হবে, তাই না?'

রাত্রে যেতে-যেতে প্রথম যে-খামারবাড়ি আমাদের পথে পড়ল সেখান থেকে ফৌদিয়া পথ দেখানোর জন্যে জনাদুই গাইড সংগ্রহ করে ফেলল। পাছে আমাদের বাহিনীকে ভুল রাস্তায় চালান করে শত্রুর মুখোমুখি ফেলে দেয় এই ভয়ে একজনের জায়গায় দু-জনকে ঠিক করা হল। গাইড দু-জন আলাদা আলাদা ভাবে চলল, আর যখন কোনো একটা চৌমাথায় এসে একজন বলল বাঁদিকে যেতে হবে আমরা তখন আলাদাভাবে আরেক জনের মত নিতে লাগলুম। যেক্ষেত্রে দু-জনে একই

দিক দেখাতে লাগল একমাত্র সেখানেই আমরা দু-জনের দেখানো পথে যেতে লাগলুম।

প্রথম দিকে আমরা দু-জন দু-জন করে সারি বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগলুম আর পদে-পদে ধাক্কা খেতে লাগলুম সামনের লোকের সঙ্গে। ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভ আগেই হুকুম দিয়েছিল ঘোড়াদের খুরগুলো কাপড়ে মুড়ে নিতে।

সকাল হতে আমরা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এলুম। ঠিক করলুম, ওইখানেই সারাদিন বিশ্রাম নেব, কারণ দিনের বেলায় ওভাবে এগোনো নিরাপদ ছিল না। রাস্তার পাশে রাস্‌প্‌বেরি-ঝোপের মধ্যে খবরাখবর শোনার জন্যে লোক মোতায়েন করে এলুম আমরা। দুপুরের দিকে পশ্চিমা বাতাস বইতে আরম্ভ করায় কাছাকাছি কোথা থেকে কামানের লড়াইয়ের ভারি গুমগুম শব্দ কানে এল। আমাদের পাশ দিয়ে শেবালভকে চিন্তিতভাবে যেতে দেখলুম। ও'র পাশে-পাশে হাঁটছিল ফেদিয়া, শক্ত পায়ে একটু লাফিয়ে-লাফিয়ে আর কথা বলে যাচ্ছিল দ্রুতলয়ে। ও'রা দু-জন গিয়ে সুখারেভের কাছে দাঁড়ালেন।

ও'দের কথাবার্তা কিছু কিছু কানে আসছিল আমার:

'এগিয়ে গিয়ে খাদটা এট্টু পরখ করি দেখা দরকার।'

'ঘোড়সওয়ার লিয়ে?'

'না-না, তাইলে নজর কাড়বে বড় বেশি। সুখারেভ-ভাই, তিনজন স্কাউট পাঠিয়ে দাও বরং।'

'কাজটার ভার তোমার ওপর দেলাম কিন্তু, চুবুক,' আধা-প্রশ্নের ঢঙে কম্যান্ডার কথাগুলো বললেন। 'শ্‌মাকভরে সঙ্গে নেও আর নিভ্‌ভর করতে পার এমন আর কাউকে নেও।'

'চুবুক, আমায় নিন,' আমি চুপিচুপি বললুম, 'আমার ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতে পারবেন।'

এদিকে সুখারেভ পরামর্শ দিলেন, 'সিম্‌কা গর্‌শ্‌কেভরে নেও বরং।'

'আমায়, আমায়, চুবুক,' আবার আমি ফিস্‌ফিসিয়ে বললুম। 'আমায় সঙ্গে নিন। আমার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য কেউ হবে না।'

'হুঁহুঁ,' ঘাড় নেড়ে চুবুক বললেন।

লাফিয়ে উঠলুম। প্রায় চেঁচিয়েই ফেলতুম আর একটু হলে। এমন একটা

গুরুতর কাজে ওঁরা আমায় সঙ্গে নেবেন এ আমার ধারণারও বাইরে ছিল। কার্তুজের থলিটা বেঁধে নিয়ে আমি রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে ফেললুম। কিন্তু সুখারেভের সন্দেহ-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আমায় থামতে হল।

চুবুককে উনি বললেন, 'ওরে আবার সঙ্গে লিচ্চ কেন? ওরে দিয়ে কি কাজ চলবে? কাজ পণ্ড করি দেবে অখন। তার চেয়ে সিম্‌কারে নেও।'

অন্যমনস্কভাবে দেশালাই জেবলে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে চুবুক শুধোলেন, 'সিম্‌কারে?'

'ইডিয়ট কোথাকার!' মনে মনে বললুম আমি। অপমানে আর সুখারেভের প্রতি ঘেন্নায় আমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। 'অন্য সকলের সামনে আমার সম্বন্ধে এ-সব কথা বলে কী করে? ঠিক আছে, ওরা যদি আমায় সঙ্গে না নেয় তো আমি একাই একদিকে বেরিয়ে যাব। যাবই তো। ওই গাঁয়ের ভেতরেই চলে যাব, তারপর সবকিছু দেখেশুনে ফিরে আসব আবার। তখন সুখারেভ কী করে, কোন্ চুলোয় গিয়ে মুখ ঢাকে দেখব তো একবার!'

চুবুক ইতিমধ্যে বোল্‌ট্‌টা খুলে ম্যাগাজিনে চারটে কার্তুজ পুরে নিলেন আর পঞ্চম কার্তুজটাকে ছোড়ার জন্যে তৈরি অবস্থায় রাখলেন। তারপর সেফটি ক্যাচটা নিলেন আটকে। আর এ-ব্যাপারে ওঁর মতামত আমার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার হিসেব বুঝি না রেখেই নির্বিকার ভাবে বললেন:

'সিম্‌কারে লিব? আচ্ছা, ঠিক আচে।' কাঁধের ক্রস্‌বেল্‌টটা ঠিকঠাক করে নিতে-নিতে হঠাৎ ওঁর চোখ পড়ে গেল আমার দিকে। আমার ফ্যাকাশে মুখখানা দেখে মুখ টিপে হাসলেন উনি, তারপর একটু যেন কর্কশ ভঙ্গিতে বললেন: 'না, সিম্‌কার ব্যাপার আমি ঠিক জানি না। আমার এরে হলিই চলবে, এ কাজ বোঝে। আচ্ছা, বাচ্চা চলি এস!'

সঙ্গে সঙ্গে বনের প্রান্তের দিকে দৌড় লাগালুম আমি।

'আঃ, রও দিকি বাপু!' এক ধমক লাগালেন চুবুক। 'তিড়িং-তিড়িং বন্ধ কর। আরে, এ বনভোজন লয়, বুইলে? সঙ্গে বোমা-টোমা আচে? নেই? তা আমার থেকে একটা রাখো। হাতলটা নিচের দিকি করে পকেটে রেখো না যেন, টেনে বের করতি গেলে তাইলে আঙ্‌টাটা খুলে আসবে কিন্তু। খোলটারে নিচের দিক করি রাখো। হ্যাঁ, ঠিক আচে। উহু, কী ছটফটে!' গলার স্বরটা ওঁর এবার কেমন কোমল শোনাল।

'তুমি খাদের ডাইনে উৎরাইয়ের মাথায় যাও,' চুবুক আমাকে হুকুম করলেন। 'শ্মাকভ যাক বাঁয়ের উৎরাইয়ের মাথায়। আমি খাদের নিচে লামব, এক্কেবারে মাঝখানে। কিছু দেখতে পেলি অম্নি ইসারা করি জানাবে, কেমন?'

ধীরে ধীরে এগোতে লাগলুম আমরা। আধ ঘণ্টার মধ্যে শ্মাকভকে দেখতে পেলুম আমার পেছনে বাঁয়ের উৎরাইয়ের মাথায়। মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে উবু হয়ে হাঁটছিল ও। সাধারণভাবে ওর মুখখানা দেখতে ছিল ভালোমানুষের মতো, কিন্তু দুষ্টুমিতে-ভরা। সেই মুখ এখন দেখাচ্ছিল গম্ভীর আর কঠিন।

এক জায়গায় খাদটা এসে বাঁক নিয়েছিল। সেখানে এসে শ্মাকভ বা চুবুক কাউকে দেখতে পেলুম না। অবিশ্যি জানতুম, ওঁরা ওইখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমারই মতো আস্তে-আস্তে এগোচ্ছেন ওঁরাও, তবে হয়তো ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছেন এই-যা। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, একই কাজের দায়িত্ব আর একই রকম বিপদের ঝুঁকি যে আমাদের তিনজনকে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এই চেতনা আমার মনে সাহস যোগাল। একটা জায়গায় এসে দেখলুম খাদটা চওড়া হয়ে গেছে। ঝোপ-জঙ্গলও আগের চেয়ে উঠেছে ঘন হয়ে। এরপরই এসে গেল আরেকটা বাঁক। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মাটিতে সটান শুয়ে পড়তে হল।

দেখলুম, ডানদিকের উৎরাইয়ের মাথার সমান্তরাল একটা চওড়া পাথরে-বাঁধানো রাস্তা ধরে বেশ বড় একটা ঘোড়সওয়ার-বাহিনী আমার থেকে শ-খানেক হাত দূর দিয়ে চলেছে।

কালো, মসৃণ, চকচকে ঘোড়াগুলো সওয়ার পিঠে নিয়ে বেশ তেজীভাবেই চলছিল। দলটার আগে-আগে যাচ্ছিল তিনজন কি চারজন অফিসার। ঠিক আমার সামনাসামনি এসে দলটা থামল, দলের সেনাপতি একটা ম্যাপ বের করে দেখতে লাগলেন।

পিছিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা নেমে এলুম আমি। তারপর আমাদের আগের ব্যবস্থামতো ওঁকে ইসারা করে জানানোর জন্যে চারিদিক তাকিয়ে চুবুককে খুঁজতে লাগলুম।

যদিও বুকটা ধড়ফড় করছিল তবু তখনই আমার মনের মধ্যে এই চিন্তাটা চমকে গেল যে আমার এই আগ বাড়িয়ে খোঁজখবর করাটা বৃথা যায় নি আর শত্রুকে আমিই প্রথম দেখতে পেয়েছি।

'কিন্তু চুবুক কোথায় গেলেন?' ভাবনাটা মাথায় আসতেই ভয় ধরে গেল আমার। চট করে পেছনের দিকে তাকালুম আমি। উৎরাই বেয়ে নিচে নেমে চুবুককে খোঁজার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খাদের বাঁদিকের উৎরাইয়ে একটা ঝোপ অল্প-একটু নড়ে উঠতে সেই দিকে চোখ চলে গেল।

উল্টো দিকের উৎরাইয়ের ওই ঝোপটা থেকে ভাস্কা শ্মাকভ সতর্কভাবে মুখ বের করে, হাত নেড়ে ইসারায় আমায় সাবধান করে দিল আর খাদের নিচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

প্রথমে ভাবলুম ও বুঝি আমায় নিচে নামতে বলছে। কিন্তু ও যেদিকে আঙুল দেখাল সেদিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠে মাথাটা ঝোপের ভেতর টেনে নিলুম আমি।

দেখলুম, একজন শ্বেতরক্ষী-সৈন্য একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে খাদের নিচের ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। সৈন্যটা ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যে জলের খোঁজ করছিল, নাকি যে-বাহিনীটা ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই পাশের দিকের অশ্বারোহী পাহারাদারদের ও ছিল একজন, তা ঠিক বুঝলুম না। তবে এটুকু বুঝলুম ও আমাদের শত্রুপক্ষের একজন, আর ও আমাদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কী করা উচিত, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। দেখতে-দেখতে ঘোড়াসুদ্ধ লোকটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন আমি শুধু ভাস্কাকেই দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু, আমার মনে হল, ওপারের উৎরাই থেকে ভাস্কা আরও নতুন কিছু দেখতে পেয়েছে যা তখনও আমার চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছিল।

এক হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভাস্কা। ওর রাইফেলের কুঁদোটা ছিল মাটিতে। একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে ও আমাকে নড়তে বারণ করছিল, অথচ নিজে বারবার নিচের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ আমার ডানদিকে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দে ফিরে তাকাতে বাধ্য হলুম। দেখলুম, আগের সেই অশ্বারোহী বাহিনীটা ঘোড়ার গাড়ি চলাচলের একটা মেঠো রাস্তায় মোড় নিয়ে আগের চেয়ে জোরে ছুট লাগাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে

ভাস্‌কা আমার দিকে একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে সজোরে নাড়ল, তারপর একলাফে ঝোপটা ডিঙিয়ে তীরবেগে উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। ওর দেখাদেখি আমিও প্রাণপণে ছুটে নামতে লাগলুম। খাদের একদম নিচে গড়িয়ে নেমে আমি দেখলুম ঝোপগুলোর পাশেই দুটো লোক পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মারামারি করছে। ওদের মধ্যে একজন দেখলুম চুবুক, অপর জন সেই শত্রুর সেপাইটা। কী করে যে আমি জায়গাটায় পৌঁছেছিলুম তা মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, গিয়ে দেখলুম, চুবুক তলায় পড়ে আছেন আর শ্বেতরক্ষীর হাতটা প্রাণপণে চেপে ধরে আছেন, আর শ্বেতরক্ষীটা তার খাপ থেকে পিস্তল বের করার জন্যে টানাটানি লাগিয়েছে। শত্রুটাকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মাথায় না ঘা মেরে আমি রাইফেলটা ফেলে ওর পা দুটো ধরে টানতে লাগলুম। লোকটা ছিল ষণ্ডা জোয়ান। এক লাথিতে ও আমায় উল্‌টে ফেললে। কিন্তু পড়ে গিয়েও আমি ওর হাতটা চেপে ধরে আঙুলে কামড় বসালুম। শ্বেতরক্ষীটা চিৎকার করে উঠে ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। এমন সময় একেবারে আচমকা দুদ্দাড় করে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ভেঙে কোমর পর্যন্ত জলে-ভেজা পোশাকে উদয় হল ভাস্‌কার। ড্রিলের মাঠে রপ্ত-করা অভ্যস্ত কায়দায় কুঁদো চালিয়ে ও লাফিয়ে পড়ল শ্বেতরক্ষীর ওপর আর তাকে অজ্ঞান করে ফেলে দিল।

এরপর কাশতে-কাশতে আর থুথু ফেলতে-ফেলতে ঘাস ছেড়ে উঠে পড়লেন চুবুক।

ধরা-ধরা গলায় ঝাঁকি দিয়ে 'ভাস্‌কা' বলে ডেকে তিনি ঘাস-চিবুতে-ব্যস্ত ঘোড়াটাকে দেখিয়ে দিলেন।

'আহা,' বলে মাটিতে-গড়িয়ে-পড়া লাগামটা তুলে নিয়ে ভাস্‌কা ঘোড়াটাকে কাছে টানল।

'ওটারেও লিয়ে চল,' হাঁ-করে নিশ্বাস টানতে-টানতে চুবুক এবার অচৈতন্য গাইদামাককে দেখিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভাস্‌কা কাজে লেগে গেল।

'হাত দুটা বেঁধে দ্যাও দেখি!'

আমার রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে চুবুক বেয়োনেটের দুই টানে ওর চামড়ার ক্রস্‌বেল্‌টটা কেটে ফেললেন আর সেই বেল্‌ট দিয়ে অচৈতন্য সৈনিকের কনুই দুটো বেঁধে দিলেন।

তারপর ধমকে উঠলেন আমায়, 'ওর ঠ্যাঙ্ দুটো ধরতি পার না?' তবু আমার ন-যযৌ-ন-তস্থৌ ভাব দেখে ফের গালাগাল দিলেন, 'কী? ঘুম ভাঙল? নারকী কোথাকার!'

বন্দীকে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দিলুম আমরা। অমনি ভাস্‌কা লাফিয়ে জিনের ওপর উঠে বসে, একটিও বাক্যব্যয় না করে চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে খাদের অসমান জমির ওপর দিয়ে ছুটিয়ে দিল।

চুবুকের মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল, ঘাম ঝরছিল মুখ বেয়ে। ফোঁসফোঁস শব্দ করে কষ্টে নিশ্বাস টানতে-টানতে উনি আমার কনুই ধরে টানলেন, 'ইদিকে এস! আমার পিছু-পিছু!'

ঝোপঝাড় ধরে-ধরে চড়াই বেয়ে কোনোমতে ওপরে উঠলেন উনি।

চড়াইয়ের মাথার কাছে পৌঁছে হঠাৎ থেমে বললেন, 'বোসো, বোসো! বসে পড় শিগ্‌গিরি!'

ঝোপের পেছনে উবু হয়ে বসে পড়ামাত্রই দেখলুম নিচে খাদের তলা দিয়ে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে। বোঝা গেল, আগের সেই ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পার্শ্বরক্ষী প্যাট্রল-দলের এটাই প্রধান অংশ। ঘোড়সওয়াররা আমাদের নিচে থেমে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ওরা যে ওদের সঙ্গীকে খুঁজছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জোরে-জোরে ওরা গালাগাল দিচ্ছিল তাও কানে আসছিল আমাদের। এরপর পাঁচজনই কাঁধ থেকে ওদের ছোট ছোট হালকা বন্দুকগুলো নামিয়ে নিল। একজন ঘোড়া থেকে নেমে কী যেন একটা মাটি থেকে কুড়িয়েও নিল। দেখা গেল, ওটা সেই আগের শ্বেতরক্ষীর টুপি, যা আমরা তাড়াহুড়োর মধ্যে ওখানেই ফেলে চলে এসেছিলুম। এবার ঘোড়সওয়ারগুলো ভয়ে-ভয়ে কথা বলছে শুনলুম। ওদের একজন — সম্ভবত সে ওদের দলনেতাই হবে — দেখলুম সামনের দিকে কী যেন দেখাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, 'এই-রে, ওরা-না ভাস্‌কাকে ধরে ফেলে। ভাস্‌কা ভারি ওজন নিয়ে চলেছে। তাছাড়া ওরা সংখ্যায় পাঁচজন আর ভাস্‌কা একা।'

'বোম ছোড়! বোম ছোড় শিগগিরি!' চুবুক হুকুম দিলেন। ওঁর হাতে কী একটা চকমক করে উঠেই নিচের দিকে ছুটে গেল।

ধুম করে একটা ভোঁতা শব্দে থমকে গেলুম।

'কী হল? ছোড় শিগ্‌গির!' চুবুক চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর উচুঁ-করে-ধরা আমার হাত থেকে বোমাটা ছিনিয়ে নিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে দিলেন। তারপর খাদের নিচে ছুড়ে দিলেন বোমাটা।

'হতভাগা গাধা!' খেঁকিয়ে উঠলেন উনি। বোমার বিস্ফোরণের শব্দে আর পরপর অতগুলো অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখোমুখি পড়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি তখন একেবারে গুলিয়ে গিয়েছিল। উনি বললেন, 'আঙ্‌টাটা খুলে ফেলিছিলে, এদিকে সেফ্‌টি ক্যাচ তেমনি নাগানো ছিল। বলিহারি বুদ্ধি!'

অতঃপর সদ্য-লাঙল-দেয়া কাদা-প্যাচপেচে একটা সব্জিখেত মাড়িয়ে প্রাণপণে ছুটলুম আমরা। অতসব ঝোপঝাড় থাকায় শ্বেতরক্ষীর দলটা ঘোড়ার পিঠে চড়াই বেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠায় মোটেই সুবিধে করতে পারছিল না। তাই শেষপর্যন্ত তারা হেঁটে চড়াই ভাঙছিল। কাজেই আমরা সময় পেয়ে গেলুম আরেকটা খাদে পেঁছিতে। তারপর খাদ পেরিয়ে আরেকটা মাঠও পার হয়ে পেঁছে গেলুম জঙ্গলে। পেছনে, অনেক দূরে, তখন বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

'ও-ওরা বো-বোধহয় ভাস্‌কাকে ধ-ধরেই ফেলেছে!' নিজেরই অপরিচিত অদ্ভুত একটা গলায় তুত্‌লে-তুত্‌লে বললুম।

গুলির আওয়াজ ভালো করে শুনে নিয়ে কিন্তু চুবুক বললেন, 'না। ওরা আপন মনে গায়ের ঝাল মেটাচ্চে আর কি। চলে এস, বাচ্চা, কোমর বেঁধে কষে পা চালাও দিকি। ওরা যেন আমাদের যাওয়ার পথের গন্ধটি না পায়, বুইলে।'

নিঃশব্দে চলতে লাগলুম আমরা। আমার মনে হতে লাগল, চুবুক নিশ্চয় আমার ওপর মর্মান্তিক খেপে গেছেন আর আমাকে ঘেন্না করছেন। যেরকম ভয় পেয়ে আমার হাত থেকে রাইফেল পড়ে গিয়েছিল, হাস্যকর ইশকুলের ছেলের কায়দায় যেভাবে আমি শ্বেতরক্ষীটার আঙুল কামড়ে দিয়েছিলুম, ঘোড়ার পিঠে আমাদের বন্দীকে তোলার সময় যেরকম আমি হাতের কাঁপুনি বাগে আনতে পারছিলুম না, আর সবচেয়ে বেশি, মনের জোর এতখানি হারিয়ে ফেলেছিলুম আমি যে সামান্য একটা বোমা পর্যন্ত ছুড়তে পারি নি, এতসব কেলেঙ্কারি কাণ্ড দেখে উনি আমার সম্বন্ধে কী-না-কী মনে করেছেন কে জানে! বিশেষ করে যখন মনে হচ্ছিল চুবুক ফিরে গিয়ে বাহিনীর লোকেদের কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথা বলে দেবেন, তখন একটা বিশ্রী তিক্ততায় আর মর্মান্তিক লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিলুম আমি। ভাবলুম, সব

শোনার পর সুখারেভ নিশ্চয়ই বলবেন: 'কয়েছিলাম না, ওরে সঙ্গে না নিতে। সিম্‌কারে নেয়া উচিত ছিল তোমার।' অসহ্য অপমানে আর নিজের ভীরুতায়, নিজেরই ওপর আক্রোশে চোখে জল এসে গেল আমার।

এক সময় চুবুক থামলেন। তারপর তামাকের থলি বের করে পাইপটায় মাখোর্‌কা ভরতে শুরু করলেন। লক্ষ্য করলুম, ওঁর আঙুলগুলোও অল্প-অল্প কাঁপছিল। অসম্ভব তেষ্টা নিয়ে প্রাণভরে — যেন পেট ভরে জল খাচ্ছেন এমনিভাবে — তামাক টানতে লাগলেন উনি। পরে তামাকের থলিটা ফের পকেটে পুরে আমার কাঁধে কয়েকটা চাপড় দিলেন। তারপর খুব সরলভাবে হাসিখুশি-ভরা গলায় বললেন:

'খুব অল্পের জন্যি বেঁচে যাওয়া গ্যাচে, কী বল, ইয়ার? হুঁহুঁ, বরিস, কাজটা নেহাত মন্দ কর নি! যেমন করি নোকটার হাতে দাঁত বসিয়ে দিলে-না!' ঘটনাটা মনে পড়ায় মুখ টিপে হাসলেন চুবুক। 'সাবাস, এক্কেবারে নেকড়ের বাচ্চা! ঠিক করেচ, নড়াইয়ে রাইফেলই একমাত্তর হাতিয়ার লয়, অন্য হাতিয়ারও ব্যাভার করা চলে, বুইলে ইয়ার? তা, দাঁতও কখনো-সখনো কাজে নাগে বইকি!'

'কিন্তু বোমাটা যে...' অপরাধীর সুরে আমি বিড়বিড় করে বললুম, 'সেফ্‌টি ক্যাচ লাগানো থাকতেই ছুড়তে গিয়েছিলুম।'

'বোমটা?' চুবুক হাসলেন। 'আরে, ইয়ার, একা তোমারই যে ওই ভুল হয়েছিল তা কে কইল? যারা আগে কখনও বোম ছোড়ে নি এমন পেত্যেকটি নোকে পেরথম ছুড়তে গেলেই গণ্ডগোল করে — হয় সে সেফ্‌টি ক্যাচ নাগানো থাকতিই ছুড়ে বসে, আর লয়তো ছুড়তে গিয়ে আসল খোলটাই পল্‌তে থেকে খুলে পের্‌থক হয়ে পড়ে। আরে, আমিও যখন ছোট ছিলাম অমন ভুল কত বার করেছি। কাজের সময়তে এমন ধোঁকায় পড়ে যেতি হয় যে বোঝাই যায় না ছাই কী করচি আর না-করচি। তখন ইটপাটকেলের মতো ধরেই ছুড়ে বসে থাকে নোকে। আরে, চলি এস। অনেকটা পথ যেতি হবে আমাদের।'

আমাদের বাহিনীর কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত বাকি পথটা এবার আমি বেশ হালকা মন নিয়ে দুলকি চালে হেঁটে গেলুম। আমার মনের অবস্থা তখন পরীক্ষার পর ইশকুলের ছাত্রের যে-অবস্থা হয় তেমনই।

যাক, সুখারেভ আর আমার সম্বন্ধে কখনও খারাপ মন্তব্য করতে পারবেন না।

বাহিনীর আশ্রয়শিবিরে পেঁৗছে ভাস্‌কা তার অচৈতন্য বন্দীকে কম্যান্ডারের হাতে তুলে দিল। পরদিন সকালে শ্বেতরক্ষীটার জ্ঞান ফিরে এল। ওকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে একখানা সাঁজোয়া ট্রেন সামনের রেললাইন পাহারা দিচ্ছে। ওই রেললাইনই আবার আমাদের পার হওয়ার কথা। যাক, বন্দী আরও জানাল, সামনের ছোট্ট ফ্ল্যাগস্টেশনে একটা জার্মান ব্যাটালিয়ন ঘাঁটি গেড়েছে, আর গ্লুখোভ্‌কায় আছে ক্যাপ্‌টেন জিখারেভের নেতৃত্বে একটা শ্বেতরক্ষী বাহিনীর ঘাঁটি।

গাছের ঝলমলে সবুজ পাতায় তখন ফুটন্ত পাখি-চেরিফুলের গন্ধ। বিশ্রাম পাওয়ায় আমাদের বাহিনীর লোকজনেরও বেশ হাসিখুশি ভাব। আপাতদৃষ্টিতে যেন ভাবনাচিন্তা নেই বলে মনে হচ্ছিল ওদের। আগ বাড়িয়ে টহল সেরে ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভও তার প্রাণোচ্ছল ঘোড়সওয়ার দলটি নিয়ে ফিরে এসে খবর দিল সামনে পথ একদম পরিষ্কার, আর কাছের একটা গাঁয়ের চাষীরা সবাই লাল ফৌজের পক্ষে। কারণ, ও-গাঁয়ের জমিদারবাবু, যিনি আগের অক্টোবর মাসের গোড়ায় গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিলেন, তিনি অল্প কয়েক দিন আগে ফের গাঁয়ে ফিরে এসে সঙ্গে সেপাই সামন্ত নিয়ে চাষীদের কুঁড়েয় কুঁড়েয় তল্লাসি চালিয়ে তাঁর জমিদারির সম্পত্তি সব উদ্ধারে লেগেছিলেন। আর তল্লাসি চালিয়ে যাদের-যাদের বাড়িতে ওই জমিদারি সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছিল তাদের গির্জের সামনের চৌকোনা চত্বরে এনে এমন সাংঘাতিকভাবে জমিদার বেত মেরেছিলেন, যেমনটা নাকি ভূমিদাসপ্রথার আমলেও কেউ কোনোদিন শোনে নি। তাই চাষীরা মেনে নিয়েছিল যে লাল ফৌজ যদি গাঁয়ে আসে তো তারা খুশিই হবে।

চায়ের বিকল্প গরম জলের সঙ্গে এক-টুকরো শুয়োরের চর্বি গিলে লাল ফৌজের লোকজন যেখানে বন্দীকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছিল আমি সেখানে গেলুম।

'আরে, এস, এস!' টিনের মগভর্‌তি গরম জল গিলে জামার হাতা দিয়ে ঘামে-ভেজা মুখটা মুছতে-মুছতে ভাস্‌কা শ্‌মোকভ বন্ধুর মতো ডাকল আমায়। 'ভ্যালা নোক বটে তুমি বাপু একখান!'

'কেন, কেন? কী হয়েছে?'

'কাল রাইফেলখান ছুড়ে ফেলে দিলে?'

'আর কে সবচেয়ে প্রথম ওপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে সবশেষে এসে হাজির হয়েছিল, শুনি?' ওর আক্রমণ ঠেকাতে পালটা আক্রমণ করলুম।

'আরে, ইয়ার, ঝাঁপ খেয়ে উপর থেকে সোজা জলার পাঁকে গিয়ে পড়লাম যে। সেই জন্যিই তো দেরি হল। যাই হোক, আমরা বেশ চটপটই কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর পিছনে যখন বোমের আওয়াজ শুনলাম তখন ভাবলাম তোমার আর চুবুকের বুঝি দফা নিকেশ হয়ে গেল। সত্যি, কথাটা তখন মনে হইছিল বটে। তাই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এখেনে সবাইরে বললাম: 'মনে হচ্চে, ওদের ও-কম্মো শেষ হয়ে গ্যাচে।' আর নিজের মনে বললাম: 'যেমন ছোঁড়া আমার সঙ্গে ওর চামড়ার ব্যাগটা বদলাবদলি করতে চায় নি, তা এখন হল তো? শ্বেতরক্ষীগুলো এখন ওটা এমনিই নিয়ে নেবে!' আহা, ব্যাগটা বড় সোন্দর ছিল গো।' কথা কটা বলে বনের মধ্যে ছোকরাটাকে মেরে ফেলে তার যে-ব্যাগটা আমি হাতিয়েছিলুম তখনও আমার কাঁধে-ঝোলানো সেই চ্যাপ্টা ম্যাপকেস্‌টার গায়ে ভাস্‌কা একবার হাত বুলিয়ে নিলে। 'ঠিক আচে, ঠিক আচে, নিতে আমার ভারি বয়েই গ্যাচে — ইচ্ছে হলি তুমিই ওটা রেখে দিতি পার,' ও বলল। 'গত মাসে ওটার চাইতেও বেশি সোন্দর একটা ব্যাগ পেয়েছিলাম, তা সেটারে বেচে দিলাম। ওটার জন্যি অত টান ভালো নয়, বুইলে?' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নাক সিঁটকে কথাটা শেষ করল ও।

অবাক হয়ে আমি ভাস্‌কার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ওর বোকাটে লাল মুখখানা আর আনাড়ির মতো নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখে কে বলবে যে তার আগের দিনই শ্বেতরক্ষীদের গতিবিধির সন্ধান করার সময় ও অমন চট্‌পটে ভাব দেখিয়েছিল আর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বন্দী সৈন্যটাকে বেঁধে নেয়া সত্ত্বেও সজোরে চাবুক কষিয়ে অত জোরে বেয়াড়া ঘোড়া ছুটিয়েছিল।

লাল ফৌজের লোকজন ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সকালের খাওয়া সেরে, টিউনিকগুলো পরে নিয়ে বোতাম লাগিয়ে, পায়ে পটি জড়িয়ে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হল বাহিনী।

আগেই তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল বলে আমি জঙ্গলটার একটা প্রান্তে গিয়ে ফুটন্ত পাখি-চেরিফুল দেখতে লাগলুম।

পেছনে পায়ের শব্দে এক সময় আমার মনোযোগ আকর্ষিত হল। ফিরে দেখলুম, সামনে-সামনে বন্দী গাইদামাক আসছে আর পেছনে আসছে আমাদের বাহিনীর তিনজন লোক আর তাদের সঙ্গে চুবুক।

'ওরা কোথায় চলেছে কে জানে?' আলুথালু চুল, বিষণ্ণ মুখ বন্দীর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলুম।

'দাঁড়াও!' চুবুক হুকুম করলেন। ওরা সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একবার শ্বেতরক্ষীর দিকে আরেকবার চুবুকের দিকে তাকিয়ে এবার আমি বুঝতে পারলুম বন্দীকে ওখানে কেন এনেছে ওরা। জোর করে মাটি থেকে যেন পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে পেছন ফিরে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে একটা বার্চগাছের গুঁড়ি প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

তারপরই পেছন থেকে সংক্ষিপ্ত একঝাঁক গুলির আওয়াজ কানে এল।

'বুইলে খোকা,' আমার সঙ্গে দেখা হতে গম্ভীরভাবে বললেন চুবুক। ওঁর গলায় যেন একটা ক্ষীণ অনুতাপের সুর, 'যদি ভেবে থাক লড়াইটে এট্টা খেলাকথা, আর নয়তো সোন্দর-সোন্দর জায়গায় ঘুরি বেড়ানো, তাইলে তোমার ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত। শ্বেতরক্ষী হচ্ছে শ্বেতরক্ষী, আমাদের আর ওদের মধ্যি মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। ওরা আমাদের গুলি করি মারে, কাজেই আমরা ওদের ছেড়ে দিতি পারি না!'

লাল লাল চোখ মেলে ওঁর দিকে তাকালুম আমি। তারপর শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললুম:

'আমি বাড়ি ফিরে যাব না, চুবুক। আসলে, ব্যাপারটার কথা আগে ভাবি নি কিনা, তাই, কিন্তু আমি লাল ফৌজেরই লোক, আমি নিজে লড়াই করতেই এসেছি...' হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপর যেন কিছুটা কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে আস্তে-আস্তে বললুম, 'সমাজতন্ত্রের সমুজ্জ্বল রাজত্বের জন্যে লড়াই করতে এসেছি।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাশিয়া আর জার্মানির মধ্যে বহুদিন আগেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছিল, অথচ তখনও ইউক্রেন আর দোন্‌বাস অঞ্চল ছিল জার্মান সৈন্যে ভরতি। এই জার্মানরা শ্বেতরক্ষীদের নিজ নিজ বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। আর বসন্তের প্রচণ্ড বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল আগুন আর ধোঁয়া।

আমাদের বাহিনী আরও কয়েক ডজন পার্টিজান দলের মতো কার্যত নিজেদের চেষ্টায়ই স্বাধীনভাবে শত্রুপক্ষকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করছিল। দিনের বেলা আমরা মাঠে কিংবা খাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতুম, আর নয়তো অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো খামারে তাঁবু ফেলতুম। আর রাত্রে আক্রমণ চালাতুম ছোট-ছোট রেলস্টেশনের সৈন্যঘাঁটির ওপর। মেঠো রাস্তার ধারে ওত্ পেতে থেকে আমরা কখনও শত্রুর যোগানদার গাড়িগুলোকে আক্রমণ করতুম, আবার কখনও-বা পথের মধ্যে ওদের সামরিক খবরাখবর আটক করতুম কিংবা ওদের ঘোড়ার দানাপানি সংগ্রহকারী দলকে দিতুম ছত্রভঙ্গ করে।

কিন্তু যে-রকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমরা শত্রুর বড়-বড় বাহিনীকে এড়িয়ে চলতুম আর সামনাসামনি সুনির্দিষ্ট লড়াই এড়ানোর জন্যে যেভাবে সর্বদা সচেষ্ট থাকতুম তাতে প্রথম-প্রথম আমি বেশ লজ্জাই পাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে ওই বাহিনীর সঙ্গে আমার ছ-সপ্তা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু ওই ছ-সপ্তায় একবারও সত্যিকার লড়াইয়ে যোগ দিই নি। অবিশ্যি শত্রুর ছোটখাট দলের সঙ্গে গুলি ছোড়াছুড়ি, ঘুমন্ত শ্বেতরক্ষীদের ওপর হঠাৎ-হঠাৎ হানা দেয়া কিংবা দলছুটদের ওপর আক্রমণ যে আমরা করি নি তা নয়। কত-যে তার কেটেছিলুম আমরা কিংবা কত-যে টেলিগ্রাফের পোস্ট করাত দিয়ে কেটে টুকরো করেছিলুম তার ইয়ত্তা ছিল না, কিন্তু সত্যিকার লড়াই ইতিমধ্যে সত্যিই করি নি।

আমার কাছে আমাদের বাহিনীর এই আচরণ অশোভন বলেই ঠেকছিল। আমি যখন চুবুকের কাছে এ-নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলুম তখন কিন্তু চুবুক মোটেই লজ্জা পেলেন না। তিনি আমায় বোঝালেন, 'আরে ওই জন্যিই তো আমাদের পার্টিজান কয়। তুমি চাইচ ছবিতে যেমনধারা যুদ্ধ দেখায় তেমনটি হোক — সারবন্দী সেপাই সাজিয়ে, ঘাড়ে রাইফেল হেলিয়ে দিয়ে, ডান-বাঁ পা ফেলে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাওয়া। নোকে তাইলে বাহবা দেবে, বলবে এ-ই না হলি সাহস! কিন্তু কও দেখি, আমাদের ক-খান মেশিন-গান আছে? মোটে একখান, আর আছে তার তিন পট্টি গুলি। উঁদিকে জিখারেভের আছে চার চারখান ম্যাক্‌সিম মেশিন-গান আর দুটো কামান। তাইলে? কও, ওদের বিরুদ্ধে নড়ে এঁটে উঠতি পারবে তুমি? তাই দোসরা উপায়ে কাজ করতি হয় আমাদের। আমরা পার্টিজানরা হলাম গিয়ে তোমার ওই বোল্‌তার মতো — ছোট্ট কিন্তু হুল বড় জব্বর। আমাদের হল গিয়ে, মারো আর

ছুট লাগিয়ে গা-ঢাকা দাও, এই কায়দা। লোক-দেখানোর জন্যি ঝুট্মুট সাহস দেখিয়ে আমাদের কী কাম? আরে, ওরে তো সাহস কয় না, ওরে কয় সেরেফ আহম্মকের মতো গোঁয়াতুমি!'

ওই সময়ে বহু কমরেডের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছিলুম আমি। রাত্রে পাহারার ডিউটি দিতে-দিতে, সন্ধেবেলায় আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে, কিংবা অলস দুপুরের গরমে মউচাষের বাগানে চেরিগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে-নিতে কতদিন আমার কমরেডদের জীবনের কত কাহিনী যে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই।

তিরিক্ষি মেজাজের, সব-সময়ে-গোমড়া-মুখো মালিগিনের ছিল একটা মাত্র চোখ। খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ওঁর একটা চোখ গলে বেরিয়ে গিয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে একদিন উনি বলছিলেন:

'নিজির জেবনের কথা আর কীই-বা কব! কেবল এইটুকই কইতে পারি, জেবনটা বেশ কষ্ট করেই কেটেচে। গত বিশ বছর ধরি পেত্যেক দিন যে-জেবন কাটিয়েচি আমি, তারে তিনটে সমান ভাগ করা চলে। রোজ ভোর ছ-টায় বিছ্না ছেড়ে ওঠো, মাথা তখন কামড়ে ছিঁড়ে পড়চে তাও। ওটা হল আগের দিনের জের। তারপর খনির পোশাক পরে লিয়ে লম্ফর দখল লাও আর লেমে পড় লিচে। তারপর বারুদ ফাটানোর জন্যি যন্তর দিয়ে গর্ত খোঁড় আর বারুদ ফাটাও। তা বারুদ ফাটাতে-ফাটাতে তোমার গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে কালাবোবা হবার সামিল। ফের উপরি ওঠবার জন্যি খাদের মুখি যাও। তারপর তোমারে শয়তানের মতো টপ করি মুখি পুরে ওপরে পেঁাছে দেবে'খন। তখন সারা গা জলে ভিজে একশা আর চেহারা কালো ভূতের মতো খোলতাই। এই গেল আমার পেত্যেক দিনের একটা ভাগ। তারপর ঢোকো গিয়ে শুঁড়িখানায়। সেখেনে তোমারে আস্ত একটা বোতল দেবে' খন। এমনি বিনি-পয়সায়ই দেবে, আপিস থেকে ওর পয়সা দিয়ে দেয়া হয়। তারপর যাও খনির দোকানে। বোতলটা দেখালেই ওরা কথাটি কইবে না, সঙ্গে সঙ্গে দু-খান টকে-জারানো শশার কুচি, একটা রাইয়ের রুটি আর একখান হেরিং মাছ দেবে'খন। বোতলের সঙ্গে ওই চাটটুক তোমার, কুলিকামিনদের পাওনা। খাও বসি পেট পুরে তখন তো — পরে অবিশ্যি আপিস তোমার মাইনে থেকে দাম বাবদ সব পাওনা কেটে লেবে। এই হল গিয়ে আমার পেতি দিনের দ্বিতীয় ভাগ। তারপর তিন লম্বর ভাগ হল, বিছ্নায় পড়ে ঘুম। একদম মড়ার মতন ঘুম। ঘুমটা ভোদ্কার থেকেও

বেশি ভালো লাগত আমার। ই বাবা, ঘুমের মধ্যি কত-যে স্বপন দেখতাম! সেই জন্যি ঘুমটা ভারি ভালো লাগত। স্বপন কী জিনিস তা তো জম্মে জানি না বাবা। তবে ঘুমির মধ্যি ভারি মজার-মজার জিনিস দেখতাম তখন। কী যে তার মানে তা বোঝতাম না। যেমন, ধর, একদিন স্বপন দেখলাম যে খনির ফোর্‌ম্যান আমারে ডেকে কচ্চে: 'মালিগিন, আপিসে চলে যা, তোর চাকরি খতম হয়ে গ্যাচে।' তা কলাম, 'কেন বাবু? চাকরি খতম হল কেন?' তো বাবু কইল, 'মালিগিন, তোর চাকরি চলি গেল, কেননা তুই যে ডিরেক্টরের মেয়েরে বিয়ে করতি চাইলি।' আমি শুনি আকাশ থেকে পড়লাম। কলাম, 'কে? আমি? দোহাই বাবুসায়েব, কে কবে শুনেচে বারুদ-ফাটাইওয়ালা ডিরেক্টরের মেয়েরে বিয়ে করেচে? দুঃখের কথা আর কী কব বাবু, সাধারণ ঘরের মেয়েরাই আমারে বিয়ে করতে চায় না, এক চোখ গলে গ্যাচে আমার তাই।' তারপর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। যারে ফোর্‌ম্যান ভেবেছিলাম সে মোটেই ফোর্‌ম্যান লয়, সে ডিরেক্টরের টমটম গাড়ির ঘোড়া। আর দেখি ডিরেক্টর-সায়েব লিজেই গাড়ি থেকে নেমে সেলাম ঠুকি আমারে কচ্চে: 'শোন, বারুদ-ফাটাইওয়ালা মালিগিন, তুমি আমার মেয়েরে তোমার ইস্তিরি করি লাও। তাইলে তোমারে যৌতুক দেব দশ হাজার রুবল আর এই ফোর্‌ম্যানেরে — মানে, ঘোড়াসুদ্ধু এই টমটম গাড়িটারে।' শুনে তো আমি একদম থ'বনে গেলাম, ইটা সায়েব কয় কী! তা আহ্লাদে ফুটিফাটা হয়ে যেই গাড়িতি চড়তে যাব অমনি ডিরেক্টর তার হাতের ছড়িগাছাটা দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটতে নাগল আমারে। আর সেই ফোর্‌ম্যান-ব্যাটা আমারে পায়ের নিচে ফেলি খুর দিয়ে ডলতি নাগল আর ডাক ছাড়তে নাগল, 'হা-হা-হা! হা-হা-হা! দ্যাখো ব্যাটার হাল দ্যাখো!' তা ব্যাটা পায়ের নিচি ফেলে পিষতে নাগল তো নাগলই। শেষে এত কষ্ট হতি নাগল আমার যে ঘুমের মধ্যি ওঠলাম চেঁচিয়ে। সারা মাটকোঠায় যত নোক ঘুমুচ্ছিল, সবার ঘুম ভেঙে গেল। একজনা তো আমার পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে গালাগালই দিয়ে ওঠল কাঁউরে ঘুমুতে দিচ্চি না বলে।'

'মাইরি, স্বপন বটে একখান!' ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভ হেসে উঠে বলল, 'তোমার, দাদা, ছুঁড়িটারে বড্ড মনে ধরে গেছিল, তাই ওরে লিয়ে স্বপন দেখলে অমন, আমি বাজি ধরে কচ্চি। আমার তো সব্বদাই অমন হয় — ঘুমুতে যাবার আগে কোনো কিছু লিয়ে ভাবলি সেই জিনিসের স্বপন দেখবই দেখব। সেদিন ওই-যে জার্মান

মড়াটার পা থেকে জুতোজোড়া খুলে লিতে ভুলে গেলাম। ভারি সোন্দর বুটজোড়া ছেল কিন্তু। তা এখন পেত্যেক রাত্তিরে ওই জুতোর স্বপন দেখতে নেগেচি!'

তিড়বিড়িয়ে উঠলেন মালিগিন। বললেন, 'বুটজোড়া! বুটজোড়া! তুই নিজেই বুটজুতো কোথাকার! আমি বলে নোকটার মেয়েটারে তার আগে সারা বছরে মাত্তর একবারই দেখিচি। একদিন কষে মদ খেয়ে খানায় পড়ে ছিলাম। এমন সময় মেয়েটা আর তার মা বাড়ির সব্জি-বাগানের রাস্তা ধরে বেড়াচ্ছিল, ওদের গাড়ির ঘোড়াগুলো যাচ্ছিল পাশে-পাশে। মা তো মান্যিগণ্যি ভদ্দরঘরের মেয়েছেলে যেমন হয় তেমনি, পাকা চুল — আমার কাছ-বরাবর এসে কইল: 'তোমার নজ্জা নাগে না? মানুষ হিসেবে মর্যোদা বোধ কোথা গেল তোমার? ভগমানের কথা ভাব একবার।' তা, আমি কলাম, 'কী করব মা, ও মানুষের মর্যোদা-টর্যোদা আমার নেই, তাই মদ গিলি।'

'তা মেয়েটার মা-র আমার ওপর কেমন দয়া হল। সে আমার হাতে এট্টা দশ কোপেক গুঁজে দিয়ে ক'ল: 'ওরে চাষী, একবার চারদিক তাকিয়ে দ্যাখ্। প্রিকিতি কেমন আহ্লাদে আটখানা হয়েচে। সুয্যি আলো ছড়াচ্চে, পাখিরা গান গাইচে আর তুই কিনা গিয়ে মদ গিল্‌চিস। যা, একটু সোডা-ওয়াটার কিনে খেগে যা, নেশা কমবে।' শুনি খেপে গেলাম আমি। কলাম, 'আমি চাষী না, আমি তোমাদের খনির মজুর। প্রিকিতি শালা খুশিতে ডগমগ হতে চায় তো হোক-না কেন, তা দেখি আমার আহ্লাদ হতে যাবে কিসের জন্যি শুনি? আর তোমার ওই সোডা-ওয়াটার, ও আমি জম্মে খাই নি। তবে যদি দয়া করতেই চাও মা, তো আরও দশ কোপেক দিয়ে যাও আমারে। তাইলে আধ-বোতল ভোদ্‌কা কিনে গলা ভেজাই আর মনে করি ভাগ্যে আজ তোমার সঙ্গে দেখা হল।' শুনে বড়মানুষের বৌ আমারে কয় কিনা, 'চাষা, একদম চাষা! কালই আমি আমার সোয়ামিরে কব তোরে এখেন থেকে, এই খনি থেকে বরখাস্ত করতে।' এই বলে মেয়েছেলেটা তার মেয়েরে লিয়ে গাড়ি চেপে চলে গেল। ওই একবারই তার সঙ্গে আমার কথা হইছিল। আর মেয়েটা? সে তো আমাদের কথাবাত্তার সময় সারাক্ষণই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর তুই কস কিনা আমি মেয়েটার দিকে বড্ড তাকিয়েচি, ওরে বড্ড মনে ধরেচে আমার?'

'আরে ও তো স্বপন — সত্যি না!' একগাল হেসে বলল ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভ। 'তাইলে একটা সত্যি গপ্পো কব? আমারে আর এক কাউণ্টেসরে জড়িয়ে লিয়ে?

বলতে পার, ওই ঘটনা ঘটার পরেই আমি বিপ্লবের পথে পা বাড়াই। গপ্পোটা যদি শোন-না তো নিজের কানরে পর্যন্ত পেত্যয় যাবে না কাউর।'

গল্প শুরু করার আগে একরাশ চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে সুখের ঘোরে চোখ দুটো কোঁচকাল ফেদিয়া। দেখে মনে হল যেন ভাঁড়ারঘরে ঢুকে চুরি করে একপেট খেয়ে বেড়াল বেরোল।

একই সঙ্গে কৌতূহল আর অবিশ্বাস-মেশানো গলায় ভাস্‌কা শ্‌মাকভ বলল, 'ফের মিছে কথার জাল বুন্‌চিস, ফেদিয়া?' কিন্তু কথাটা বললেও ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে এসে বসল ও।

'পেত্যয় যাবি কি যাবি নে, সে তোর খুশি। পেরমান দেবার জন্যি তো আর দলিলপত্তর দেখাতি পারব না।'

ফেদিয়া আড় ভাঙল। তারপর মাথাটা ঝাঁকাল, যেন গল্পটা বলবে কি বলবে না তাই নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করল। পরে মনস্থির করেই যেন মুখে একটা শব্দ করে শুরু করল গল্প।

'তিন বছর আগের ঘটনা। দেখতি-যে সোন্দরই ছেলাম তা না বললেও চলে। এখনকার থেকে আরও ভালো দেখতি ছেলাম তখন। অবস্থার ফেরে এক কাউণ্টের জমিদারিতে গোরুর রাখালির কাম লিতে বাধ্য হইচি তখন। কাউণ্টের ইস্তিরি ছিল, তার নাম ছিল এমিলিয়া। আর এক মাস্টারনি থাকত বাড়িতে, তার নাম ছিল আন্না। সবাই তারে জানেত্ বলে ডাকত।

'এখন, একদিন আমি পুকুরপাড়ে গোরুর পাল লিয়ে বসে আচি। তা দেখি, কাউণ্টের সেই ইস্তিরি আর মাস্টারনি দু-জনে ছাতা মাথায় দিয়ে আসচে। কাউণ্টেসের মাথায় ছিল শাদা ছাতা আর জানেতের মাথায় লাল ছাতা। জানেত্‌রে দেখতে ছিল শুকনো হেরিং মাছের মতো — হাড্ডিসার, তার ওপর নাকে এট্টা চশমা চড়ানো। আবার গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যখন সেই মেয়েছেলে চলে ফিরে বেড়াত তখন সব সময় নাকে রোমাল চাপা দিয়ে রাখত, নইলে গোবরের গন্ধে নাকি মাথা ধরত তার। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার গোরুর পালে একটা ষাঁড় ছিল — খাঁটি সিমেন্‌থাল জাতের একেবারে, ইয়া মস্ত বাহারে ষাঁড়। তা আমার সেই ষাঁড়টা যেই লাল ছাতা দেখতে পেলে অমনি সিধে গোত্তা খেয়ে ছুটল জানেতের দিকে। আমিও পাগলের মতো আড়াআড়ি ছুটলাম ওরে আটকাতি। মেয়েলোক দুজনাও চিল্লোতে লাগল। কাউণ্টেস

ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যি, কিন্তু জানেত্ জ্ঞানহারা হয়ে সিধে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। সিমেন্থাল-ব্যাটাও তার পিছু পিছু পুকুরে নামল। তা হাতের ছাতাটা ফেলে দে, তা না, বোকা মেয়েছেলেটা ওইটে দিয়েই নিজেরে ঢেকে বাঁচতে চেষ্টা পেল। আর সারাক্ষণ চিল্লোতে লাগল, জার্মান না ফরাসী কোন্ ভাষায় তা বলতি পারব না। আমি কান্ডকারখানা দেখি ঝাঁপ খেয়ে জলে পড়লাম, জানেতের হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে ষাঁড়টার মুখে ছাতার বাঁট দিয়ে ঘা-কতক কষিয়ে দেলাম। ষাঁড়টা তখন পাগলের মতো তেড়ে এল আমার দিকি। আমি সাঁতরে পুকুরের মাঝমধ্যিখানে চলে গেলাম, তারপর ছাতাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাঁতার দিয়ে গিয়ে পুকুরের অপর পাড়ে উঠে ঝোপের মধ্যি নুকিয়ে পড়লাম। এর মধ্যি অন্য রাখালরা সবাই ছুটে এসে দারুণ হৈ-হল্লা শুরু করে দিলে। ষাঁড়টারে চারধার দিয়ে ঘিরে ধরলে উরা। জানেত্রেও জল থেকে টেনে তুললে। পাড়ে উঠে মেয়েলোকটা অজ্ঞানই হয়ে গেল।'

এই পর্যন্ত বলে ফেদিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল যেন সেইমাত্র ও ষাঁড়টার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে এসেছে। আবার জিভের সেই আওয়াজটা করল ও, তার মানে গল্পটা আবার শুরু করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কে যেন খামারবাড়ির বারান্দা থেকে হাঁক দিয়ে বললে:

'ফিয়োদর... সির্ত্সভ! কম্যান্ডার তোমারে দেখা করতি বলচে।'

'এই-যে, মিনিটখানেকের মধ্যি যাচ্চি,' বলে ফেদিয়া বিরক্তিভরে হাত নাড়ল। তারপর হেসে ফের শুরু করল: 'অন্য সবাই যখন জানেতের জ্ঞান ফেরাতি ব্যস্ত, এদিকে কাউন্টেস এমিলিয়া তখন আমার কাছে এগিয়ে আলেন। দেখি, ওঁর মুখখান কাগজের মতো শাদা, দু-চোখে জল, বুকটা তোলাপাড়া করতে নেগেছে। কাউন্টেস আমারে কইলেন, 'ছোকরা, তুমি কে কও তো?' তা আমি কলাম, 'মাননীয়া, আমি একজন রাখাল। আমার নাম সির্ত্সভ, ফিয়োদর সির্ত্সভ।' শুনে কাউন্টেস ফোঁস করে এক নিশ্বাস ছেড়ে আমারে কলেন: 'থিয়োদোর,' — সত্যি কলেন, ওরা নাকি ফিয়োদররে থিয়োদোর কয় — কলেন, 'থিয়োদোর, আমার আরও কাচে এস'।'

কাউন্টেস ফেদিয়াকে কী বলেছিল, আর তার সঙ্গে পরে ফেদিয়ার লাল ফৌজের দলে যোগ দেয়ার সম্পর্কই বা কী ছিল তা তখন জানতে পারি নি, কারণ ঠিক

সেই সময়েই ঘোড়সওয়ারের নালের ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক আওয়াজ কানে এল, আর সাংঘাতিক চটে-মটে ঠিক আমার পেছনেই শেবালেভ এসে হাজির হলেন।

নিজের তরোয়ালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন সুরে তিনি বললেন, 'ফিয়োদর, তোমারে-যে ডেকে পাঠিয়েচি শোন নি?'

দাঁড়িয়ে উঠে ফিয়োদর ঘোঁত-ঘোঁত করে বললে, 'শুনেচি। তা, ডেকেছিলেন কেন?'

'কী কইতে চাও তুমি, 'ডেকেছিলেন কেন' মানে? কম্যান্ডার ডেকে পাঠালি যে যেতি হয়, জান না?'

ফেদিয়া আবার স্বমূর্তি ধারণ করল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, হুজুর। তা, মহামহিম হুজুর কেন তলব করেছিলেন হুকুম করুন?'

শেবালভ ছিলেন সাধারণভাবে নির্ঝঞ্ঝাট আর নরম স্বভাবের মানুষ। কিন্তু এই ঠাট্টায় সাংঘাতিক খেপে গেলেন।

ওঁর গলার স্বরে বেদনার আভাস ফুটে উঠল। গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি তোমার মহামহিম হুজুর নই, বুইলে? আমারে 'হুজুর, হুজুর' করতে হবে না তোমারে। কিন্তু, মনে রেখো, আমি এই বাহিনীর কম্যান্ডার, আর আমি চাইতে পারি তুমি আমার হুকুম মেনে চলবে। শোন, তেম্‌লুকভ গাঁয়ের চাষীরা এইমাত্তর এসেছিল এখেনে।'

ফেদিয়ার কালো চোখ দুটো বোঁ-করে একবার চারদিক ঘুরে এল। ও বলল, 'তাতে কী হল?'

'ওরা নালিশ জানাল, আবার কী। কইল: 'আপনেদের স্কাউটরা এসেছিল। তা আমরা ওদের পেয়ে খুশিই হলাম — ওরা তো আমাদের আপনজন, কমরেড সব। ওদের দলপতি, কালোমতো লোকটি, গাঁয়ে একটা সভা ডাকল। ডেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে বক্তৃতা দিলে, জমি আর জমিদারদের কথাও বললে। কিন্তু আমরা গাঁয়ের সবাই যখন বক্তৃতা শুনচি আর পরস্তাব পাশ করচি তখন ওর দলের ছেলেপিলেরা আমাদের ঘরে-ঘরে ঢুকে ভাঁড়ার হাঁটকে ননীর খোঁজ করতি নাগল আর মুরগি ধরতে ছুটোছুটি নাগাল।' এসব কী, ফিয়োদর? তবে কি তুমি ভুল করি আমাদের দলে এসেচ, গাইদামাকদের দলে না-গিয়ে? এ সব কাজ তো ওরাই করে বলে জানি। আমাদের বাহিনীতে এ কাজ চলতি পারে না, কখনও না — এ নজ্জার কথা!'

ফেদিয়া চুপ করে রইল বটে, কিন্তু ওর ধরনধারণে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চোখ নিচু করে বুটের মাথাটা ও চাবুক দিয়ে ঠুকতে লাগল।

তরোয়ালের হাতলে-বাঁধা বাহারি লাল সুতোর গোছা হাত দিয়ে লুফতে লুফতে শেবালভ তখনও বলে চলেছেন, 'তোমারে এই শেষবারের মতো কচ্চি কিন্তু, ফিয়োদর। আমি মহামহিম নই, জুতো সেলাই করি, শাদামাটা নোক আমি। কিন্তু যতক্ষণ আমারে কম্যাণ্ডার করি রাখা হয়েচে ততক্ষণ তুমি আমার হুকুম মান্য করতি বাধ্য। সবার সামনে এই তোমারে সাবধান করি দিচ্চি কিন্তু, ফের যদি এ জিনিস হয় তো তোমারে ফেরত পাঠিয়ে দেব। হাঁ! তা যতই ভালো লড়নেওয়ালা কমরেড হও না কেন তুমি!'

উদ্ধত ভঙ্গিতে শেবালভের দিকে তাকাল ফেদিয়া, তারপর ওর চারপাশে দাঁড়ানো লাল ফৌজের লোকজনের দিকে এক নজর দেখল। কিন্তু মাত্র তিন-চার জন ঘোড়সওয়ার হেসে ওকে উৎসাহ দিল, আর কেউ সমর্থন করল না দেখে ও পিঠটা আরও টানটান করে তুলল। তারপর শেবালভের প্রতি বিদ্বেষ লুকোনোর চেষ্টা পর্যন্ত না করে জবাব দিল:

'যা করচ হুঁশিয়ার হয়ে কর কিন্তু, শেবালভ। আজকালকার দিনে ভালো নোক সহজে মেলে না, কয়ে দিচ্চি।'

'দূর করি দেব তোমারে,' শান্তভাবে কথা কটা বলে, মাথা নিচু করে শেবালভ আস্তে-আস্তে খামারবাড়ির বারান্দার দিকে চললেন।

ঘটনাটায় আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। আমি বুঝেছিলুম শেবালভ ঠিকই করেছেন, তবু আমি ফেদিয়ার পক্ষ নিলুম। ভাবলুম, 'একেবারে তাড়িয়ে দেয়ার ভয় না দেখিয়ে ছেলেটাকে কি কথাগুলো বলা যেত না?'

ফেদিয়া ছিল আমাদের বাহিনীতে সবচেয়ে সেরা লোকেদের একজন। সব সময়ে হাসিখুশি, অফুরান প্রাণে ভরপুর ছিল ও। যখনই দরকার পড়ত কোনো কিছুর খোঁজ করে আসার, শত্রুর ঘোড়ার দানাপানি সংগ্রহের দলের ওপর আচমকা হামলা করার, কিংবা শ্বেতরক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে এমন কোনো জমিদারের জায়গাজমির মধ্যে সেঁধোনোর, তখনই ফেদিয়া ঠিক একটা সুবিধেজনক পথ বের করে ফেলত আর আঁকাবাঁকা খাদের মধ্যে দিয়ে কিংবা গাঁয়ের পেছনের বাগবাগিচার মধ্যে দিয়ে যথাস্থানে চুপিচুপি ঢুকে পড়ত।

ঘোড়ার খুরের শব্দ, ঘোড়সওয়ারের নালের টুংটাং কিংবা ঘোড়ার চিঁহিডাক একদম না-করতে দিয়ে চুপিচুপি এগোনোর পক্ষপাতী ছিল ফেদিয়া। ঘোড়ার ডাক বন্ধ করতে তার মুখে একটা থাবড়া কষিয়ে দিতে কিংবা ঘোড়সওয়ারদের ফিস্‌ফিসানি বন্ধ করতে তাদের পিঠে চাবুক চালাতে একটুও ইতস্তত করত না ও। এইভাবে ফেদিয়ার দলের ঘোড়ারা হঠাৎ-হঠাৎ না-ডেকে উঠতে শিক্ষা পেয়েছিল, আর ওর ঘোড়সওয়াররা শিখেছিল একটু টুঁশব্দ না করে জিনে চেপে বসে থাকতে। ওর স্কাউট-দলের সামনে-সামনে দুল্‌কি-চালে-চলা ঘোড়ার ঘন ঝাঁপালো কেশরের ওপর অল্প-একটু কুঁজো-হয়ে-বসে-থাকা ফেদিয়াকে দেখলে মনে হত যেন একটা শিকারী পিঁপড়েভুক ঘাসে আটকে-পড়া নধর মাছির দিকে তাক করে হিল্‌বিল করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু যদি কখনও শত্রুর পাহারাদাররা ওদের আঁচ পেয়ে যেত আর ভয় পেয়ে হাঁকডাক শুরু করত, তাহলে ফেদিয়ার আঁটোসাঁটো ছোট্ট বাহিনীটি হুপ্‌হুপ আওয়াজ আর বিকট চিৎকার করতে-করতে রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি আর এদিক-ওদিক বোমা ছুড়তে-ছুড়তে হঠাৎ আক্রমণ করে বসত শ্বেতরক্ষীদের। ওদিকে তখনও হয়তো শ্বেতরক্ষীরা ভ্যাবাচাকা-খাওয়া অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, অনেকেই তখনও টানাটানি করে ট্রাউজার্স পরতে ব্যস্ত, কিংবা ওদের মেশিনগান-চালিয়ে ঘুমচোখে উঠে তখনও হয়তো গুলির ফিতে লাগিয়ে উঠতে পারে নি। একমাত্র ওই সময়ই ফেদিয়া প্রচণ্ড হৈ-হল্লা করতে ভালোবাসত। প্রচণ্ড বেগে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ছোড়া-বুলেট যদি লক্ষ্যবস্তুতে না লাগত, কিংবা ঘাসের ওপর এলোপাতাড়ি ছোড়া বোমার আওয়াজে ভয় পেয়ে যদি মুরগি আর পুরুষ্টু হাঁসগুলো প্রাণের দায়ে উড়ে বাড়ির চিমনির ওপর গিয়ে পড়ত, তাতে ফেদিয়ার কিছু আসত-যেত না, যথেষ্ট হট্টগোল তুলে সবাইকে ভয় পাওয়াতে পারলেই ও ছিল খুশি। এ-সব ক্ষেত্রে ওর উদ্দেশ্য ছিল হতভম্ব শত্রুর মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া যে লাল ফৌজের অসংখ্য সেপাই গ্রামে ঢুকে পড়েছে। ওর মতলব ছিল, রাইফেলের বলটুতে কার্তুজ পুরতে গিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাবড়ে-যাওয়া সেপাইদের আঙুলগুলো কেমন এদিক-ওদিক হাতড়ে বেড়াবে আর কাঁপতে থাকবে, তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে-নেয়া মেশিনগানটা গুলির ফিতে কুঁচকে থাকার জন্যে চলতে-চলতে কেমন বন্ধ হয়ে যাবে, আধঘুমন্ত-অবস্থায় হতবুদ্ধি সৈন্যরা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে রাইফেল

ফেলে, ভয়ে বেড়ার দিকে ছুটতে-ছুটতে কেমন পাগলের মতো চেঁচাবে: 'লালজুজু এসে গ্যাচে! ঘিরে ফেলেচে আমাদের!' তা-ই দেখে দারুণ মজা পাওয়া যাবে।

আর তারপর, বোমাগুলো ফের বেল্টের নিচে আটকে নিয়ে, পিঠের ওপর কোণাকুণিভাবে রাইফেলগুলো ঝুলিয়ে ফেদিয়ার স্কাউটরা তাদের এই সাফল্যে আটখানা হয়ে নিঃশব্দে তাদের ঠাণ্ডা, ক্ষুরধার তরোয়ালগুলোর সাহায্যে কাজ শুরু করে দেবে। আমাদের ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভের ধারাই ছিল ওইরকম। তাই সেদিন আমার মনে হয়েছিল, 'এমন একটা লোককে কিনা আমাদের বাহিনী থেকে অকারণে তাড়িয়ে দেয়ার কথা হচ্ছে! কী জন্যে, না তুচ্ছ কতকগুলো মুরগি আর খানিকটা ননী চুরি করার দায়ে! ভাবো একবার কাণ্ডটা!'

ফেদিয়া আর শেবালভের মধ্যে ঝগড়ার ব্যাপারটা নিয়ে তখনও আমি মনে-মনে তোলাপাড়ায় মশগুল হয়ে আছি, এমন সময় খামারবাড়ির ছাদের ওপর থেকে চুবুক চিৎকার করে নিচে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে শত্রুর প্রকাণ্ড একদল পদাতিক সৈন্য রাস্তা ধরে ওই খামারের দিকেই আসছে। চুবুকের ওপর ভার ছিল ওই ছাদের ওপর থেকে চারিদিকে নজর রাখার। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লাল ফৌজের লোকজনের মধ্যে প্রচণ্ড ছুটোছুটি আর তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। দেখেশুনে মনে হল, কোনো কম্যাণ্ডারের পক্ষেই ওই উত্তেজিত জনতাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা বোধহয় সম্ভব নয়। কেউই তখন হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছিল না, আগে থেকেই সকলে জানত এ-সময়ে কাকে কী করতে হবে বা না-হবে। প্রত্যেকে দৌড়তে-দৌড়তেই একে একে পরীক্ষা করতে লাগল প্রত্যেকের রাইফেলের ম্যাগাজিনে কটা করে কার্তুজ আছে। প্রাতরাশে বাধা পড়ায় প্রত্যেকে বাকি খাবারটুকু গোগ্রাসে গিলে কিংবা চিবোতে চিবোতেই ছুট লাগাল। গাল্‌দার অধীনে এক-নম্বর কোম্পানির লোকজন নিচু হয়ে ছুটতে-ছুটতে গ্রামটার একেবারে প্রান্তে গেল চলে, আর সেখানে মাটিতে শুয়ে পড়ে রক্ষা ব্যূহটাকে অনেক লম্বা করে বাড়িয়ে নিলে। ঘোড়ার পিঠের জিনগুলোকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে নিল স্কাউটরা। তারপর ঘোড়ার পায়ের বাঁধন খুলে নিতে লাগল, খুলতে অসুবিধে বোধ করলে তরোয়ালের এক-এক কোপে

বাঁধুনিগুলো কেটেও দিতে লাগল। মেশিনগান-চালকরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর গুলির ফিতেগুলো গাড়ি থেকে নামাতে লাগল টেনে-টেনে। লাল হয়ে উঠে ঘামতে-ঘামতে সুখারেভ তাঁর দু-নম্বর কোম্পানির লোকজন নিয়ে বনের ধারটায় ছুটে চলে গেলেন। এরপর মিনিট-খানেক মিনিট-দুয়েকের মধ্যে সব চুপচাপ হয়ে গেল। খামারবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে শেবালভ ফেদিয়াকে কী-যেন একটা হুকুম দিলেন। ফেদিয়াও 'ঠিক আছে, করে ফেলচি'-গোছের একটা ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। তারপর বাড়ির জানলা-দরজা গেল দুমদাম বন্ধ হয়ে আর খামারের মালিক চাষীটি বাড়ির মেয়ে আর কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে মাটির নিচে ভাঁড়ারঘরে নেমে গেলেন।

আমায় দেখতে পেয়ে শেবালভ বললেন, 'দাঁড়াও। তোমারে এখেনেই থাকতি হবে। তুমি বরং, বাড়ির চালে চুবুকের কাচে চলি যাও। ওখেন থেকে চুবুক যা দেখবে তা একছুটে জঙ্গলের ধারে গিয়ে আমারে জানিয়ে আসবে। আর ওরে বোলো, ডানদিকি খামুর রোডের ওপরও যেন লজর রাখে। কওয়া তো যায় না, ওদিক থেকেও কিছু এসে পড়তি পারে।'

এক, দুই, ক্লিঙ্ক-ক্লিঙ্ক... অলসভাবে রোদ পোহাতে-পোহাতে একটা হাঁস উঠল প্যাঁকপ্যাঁক করে। ল্যাজে গাড়ির-চাকার-তেলকালি-মাখা আগুন-রঙা একটা মোরগ বেড়ার ওপরে বসে হঠাৎ বিজয়ীর মতো ডাক ছাড়তে লাগল, কোঁকর-কোঁ। তারপর সজোরে পাখা ঝাপ্‌টাতে-ঝাপ্‌টাতে মোরগটা যখন নিচের ধুলোমাখা আগাছাগুলোর ওপর পড়ে চুপ করে গেল, তখন সারা খামারটা গেল আবার একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে। চারিদিক এত স্তব্ধ হয়ে গেল যে বহুদূর শূন্য থেকে ভেসে আসতে লাগল ভরতপাখির খুশিভরা ডাক আর ফুলে-ফুলে উষ্ণ, মিষ্টি গন্ধে-ভরা ফোঁটা-ফোঁটা মধু সংগ্রহে-ব্যস্ত মৌমাছির একটানা গুন্‌গুনুনি।

আমি যখন খামারবাড়ির খড়ে-ছাওয়া চালে উঠলুম তখন চুবুক মাথা না-ফিরিয়েই বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

'শেবালভ আপনাকে সাহায্য করার জন্যে আমায় পাঠালেন।'

'ঠিক আচে। বসি থাক চুপচাপ। লিজে থেকে দেখা দিও না কিন্তু।'

শেবালভের নির্দেশ আমি জানিয়ে দিলুম চুবুককে, 'ডান দিকটায় একটু চোখ রাখবেন। খামুর রোডের ওপর যদি কিছু দেখা যায়, সেই জন্যে।'

'যেখেনে আচ, চুপটি করে বসি থাক,' উনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন। তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে প্রকাণ্ড বড় মাথাটা চিমনির পেছন থেকে অল্প-একটু বের করে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু কোথাও তখনও পর্যন্ত শত্রুর সেনাবাহিনীর দেখা নেই। বোঝা গেল, ওরা একটা খাদের আড়ালে আছে, আর যে-কোনো মুহূর্তে ফের দেখা দিতে পারে। চালের ওপর খড়গুলো পেছল থাকায় পাছে হড়কে নিচে নেমে যাই এই ভয়ে নড়াচড়া না-করে চুপচাপ বসে রইলুম আমি, আর পায়ের আঙুলগুলো খড়ের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পা আটকে রাখার একটা জায়গা করে নিলুম। চুবুকের মাথা আর আমার মুখ প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছিল। সেই প্রথম আমি লক্ষ্য করলুম, ওঁর কুচকুচে কালো মোটা-মোটা চুলের ফাঁকে শাদার ডোরা দেখা দিয়েছে। অবাক হয়ে ভাবলুম, 'আচ্ছা, চুবুক কি তাহলে বুড়ো হয়ে গেছেন?'

আর কেন জানি না ভাবতেই আমার কেমন অদ্ভুত লাগল, চুবুকের মতো একজন বয়স্ক লোক পাকা-পাকা চুল আর চোখের চারপাশে কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজ নিয়ে আমার সঙ্গে ওই চালের ওপর উঠে বসেছিলেন। আর হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয়ে পা-দুটো রেখেছিলেন আনাড়ির মতো ফাঁক করে। ওঁর প্রকাণ্ড আলুথালু মাথাটা উঁকি দিচ্ছিল চিমনির পেছন থেকে।

ফিস্‌ফিস করে ডাকলুম, 'চুবুক!'

'কী? কও?'

'আপনি কিন্তু বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, চুবুক।'

'হাবাগবা কোথাকার...' চটে উঠলেন চুবুক। 'মুখের রাশ নেই তোমার?'

হঠাৎ চুবুক মাথাটা নিচু করে সরিয়ে নিলেন। শত্রুর বাহিনী খাদ থেকে উঠে আসছিল। চুবুকের উৎকণ্ঠা চারিয়ে গেল আমার মধ্যেও। দেখলুম উনি জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন আর অস্বস্তিতে নড়াচড়া করছেন।

'বরিস, দ্যাখো!'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'শিগ্‌গির নাবো। নেবে দৌড়ে গিয়ে শেবালভরে খবর দাও ওরা খাদ থেকে উঠি এসেচে, তবে রকমসকম কেমন-কেমন লাগচে যেন: গোড়ার দিকে ওরা একটানা সার বেঁধে আসছিল, কিন্তু খাদের মধ্যি থাকতি-থাকতি ছোট-ছোট প্লেটুন-দলে ভাগ

হয়ে ছড়িয়ে পড়েচে দেখচি। আমার কথাটা বুয়েচ? প্লেটুন-দলে ভাগ-ভাগ হয়ে যাবে কেন ওরা? আমরা-যে এই খামারটায় আচি সেটা টের পেয়ে গেল নাকি ব্যাটারা? যাও দেখি, শিগ্‌গিরি যাও! তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু!'

খড় থেকে পা টেনে বের করে চালা থেকে হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়লুম আমি। আর পড়বি তো পড় একেবারে একটা মোটাসোটা শুয়োরের ঘাড়ে। আর্ত একটা চিৎকার করে শুয়োরটা পালাল। শেষ পর্যন্ত শেবালভকে খুঁজে বের করলুম। একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন ল্যাগিয়ে দেখছিলেন উনি। চুবুকের দেয়া খবরটা ওঁকে শোনালুম।

'তাই তো দেখচি,' এমন সুরে উত্তর দিলেন শেবালভ যে মনে হল কোনো কারণে বুঝি আমি ওঁকে চটিয়ে দিয়েছি। বললেন, 'নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমি।'

বুঝলুম, শত্রুর সৈন্য সাজানোর এই অপ্রত্যাশিত কৌশল দেখে ওঁর মেজাজটা শুধু খিঁচড়ে গেছে, আর কিছুই নয়।

'ফেরত যাও, আর আসতি হবে না। ওদের পাশের দিকি আর খামুর রোডের দিকি কড়া নজর রাখো।'

খামারবাড়ির ফাঁকা উঠোনে একছুটে ঢুকে ঘরের চালে ওঠার জন্যে শুকনো ডালপালা-দিয়ে-বাঁধা বেড়ার ওপর উঠলুম।

হঠাৎ একটা ফিস্‌ফিসে গলায় কথা শোনা গেল, 'সেপাই-ছেলে! অ সেপাই-ছেলে!'

চমকে উঠে আমি পেছন ফিরে তাকালুম। আওয়াজটা ঠিক কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারলুম না।

ফের সেই গলা শোনা গেল, 'অ সেপাই-ছেলে!'

এবার লক্ষ্য করলুম উঠোনের ওপর মাটির নিচের ভাঁড়ার-ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা আর তার ভেতর থেকে একটি মেয়েছেলে মাথা বের করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েছেলেটি হল চাষীরই বৌ।

ফিস্‌ফিস করে এবার তিনি বললেন, 'ওরা কি আসতিছে?'

আমিও ফিস্‌ফিস করে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, কও তো, ওদের সাথে কি কামানও আছে, নাকি খালি মেশিনগান?' তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মেয়েছেলেটি শুধোলেন, 'ভগমান করুন

ওদের সাথে যেন শুধু মেশিনগান থাকে, নইলে এখেনে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করি দেবে!'

আমি ওঁর কথার উত্তর দেবার আগেই একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল আর একটা অদৃশ্য বুলেট সজোরে তীক্ষ্ম একটা 'পি-ইং' আওয়াজে শিস দিয়ে আকাশের দিকে কোথায় যেন উড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েছেলেটির মাথা গেল অদৃশ্য হয়ে আর ভাঁড়ারঘরের দরজা বন্ধ হল দড়াম করে। ভাবলুম, 'এই শুরু হতে চলেছে'। যুদ্ধ শুরু হবার মুখে — অর্থাৎ, দমকে-দমকে মেশিনগানের ক্রুদ্ধ চটাপট্ শব্দের ফোয়ারা আর থেকে-থেকে কামানগুলোর গুরুগম্ভীর গর্জনসহ রীতিমতো আক্রমণ আর গোলাগুলি-বর্ষণ শুরু হয়ে যায় যখন তখন নয়, আসলে যখন কোনো কিছুই শুরু হয় নি কিন্তু সত্যিকার বিপদ ঘটতে চলেছে, তখনই — যে-যন্ত্রণাকর উত্তেজনা মানুষকে পেয়ে বসে, সেইরকম একটা অনুভূতি আমাকে তখন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। অন্য সকলের মতো আমারও মনে হচ্ছিল, 'চারিদিক এত চুপচাপ কেন? এত দেরি হচ্ছে কেন ব্যাপারটা ঘটতে? এর চেয়ে যা হবার হয়ে যাক-না তাড়াতাড়ি!'

'পিং!' শব্দে খ্যাঁক করে উঠল দ্বিতীয় বুলেটটা।

তবু তখনও পর্যন্ত কিছুই শুরু হয় নি। সম্ভবত শ্বেতরক্ষীরা মাত্র সন্দেহ করছিল যে খামারটা লাল ফৌজের লোক দখল করে আছে, কিন্তু সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না। তাই এলোমেলোভাবে দুটো গুলি ছুড়েছিল মাত্র। স্কাউট-দলের কম্যান্ডাররাও অনেক সময় এই ধরনের আচরণ করত। তারা হয়তো শত্রুসেনার অবস্থানের একপাশে কোনো ছোট ঘাঁটি পর্যন্ত চুপিচুপি এগিয়ে দু-চারটে গুলি ছুড়ে দেখত শত্রুর পালটা গুলি-চালনার বেগ কতটা, তারপরে আবার শত্রুসেনার বিপরীত পাশে গিয়ে ছোটার মুখেই এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত আর নাজেহাল করে তুলত। অবশেষে সত্যিকার কোনো লড়াই না-করে, লড়াইয়ে না-জিতে আর শত্রুর তেমন কোনো ক্ষতি না-করেই দ্রুত তারা ফিরে আসত নিজেদের ঘাঁটিতে। এতে অন্তত তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হত যে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে মনে করে শত্রু সৈন্য-সমাবেশ করার ফলে শত্রুর শক্তি আসলে কতখানি তা তারা টের পেয়ে যেত।

আমাদের বাহিনী ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তারা কিন্তু চুপ করে রইল, আগে যে গুলি-ছোড়ার কথা বলা হয়েছে তার কোনো জবাব দিল না।

এরপর তিড়িং-তিড়িং-লাফানো কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদের জনা পাঁচেক ঘোড়সওয়ার বিপদ অগ্রাহ্য করে শত্রুর বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেল আর বেশ চট্‌পট ঘোড়া চালিয়ে আসতে লাগল এগিয়ে। খামার থেকে তিন-শো মিটার আন্দাজ দূরে পৌঁছে ঘোড়সওয়াররা থামল। আর একজন বাড়িটার দিকে দূরবীন কষে দেখতে লাগল। দূরবীনের কাচ দুটো উঠতে লাগল বেড়ার মাথা ঘেঁষে আস্তে-আস্তে বাড়ির চাল আর চিমনির দিকে। চিমনির পেছনে তখন চুবুক আর আমি শুয়ে।

'ভারি সেয়ানা, শত্রুর পর্যবেক্ষককে কোথায় খুঁজতে হয় তা ওরা জানে,' চুবুকের পিঠের আড়ালে মাথাটা লুকোতে-লুকোতে আমি ভাবলুম। যুদ্ধের সময় শত্রু কাউকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দূরবীনের কাচের মধ্যে টেনে নিয়ে দেখছে, কিংবা সার্চলাইটের এক-ঝলক আলো অন্ধকার চিরে যে-সারিতে সে চলছে সেই সারিটাকে স্পষ্ট করে তুলছে, অথবা যখন পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত এরোপ্লেন মাথার ওপর পাক খাচ্ছে আর তার মধ্যে অদৃশ্য পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে কেউ নিজেকে লুকোনোর কোনো সদুপায় খুঁজে পাচ্ছে না, তখন সেই সৈনিকের মনে যেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির সঞ্চার হয়, আমারও তেমনই মনে হতে লাগল।

আর এই সময়টায় নিজের মাথাটাই মনে হয় প্রকাণ্ড বড় হয়ে উঠেছে, হাত দুটোকে মনে হতে থাকে অস্বাভাবিক লম্বা, আর দেহটাকে বেঢপ, জবুথবু আর অনড়। ওগুলোকে যে কিছুতেই লুকোনো যাচ্ছে না, গুটিয়ে, তালগোল পাকিয়ে একটা বর্তুলে পরিণত করা যাচ্ছে না, ঘরের চালের খড় কিংবা ঘাসের মধ্যে ঘাস হয়ে থাকা যাচ্ছে না, কিংবা ওপরে ভেসে-বেড়ানো নিঃশব্দ শকুনের পাথুরে দৃষ্টির নিচে ছাইরঙা অশান্ত চড়ুই যেমন জড়ো-করা কাঠকুটোর স্তূপের মধ্যে প্রাণপণে মিশে থাকে কিছুতেই তেমনটি হওয়া যাচ্ছে না একথা ভেবে তখন নিজের ওপরই দারুণ বিরক্তি এসে যায়।

হঠাৎ চুবুক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরা আমাদের দেখতি পেয়েচে!' আর তারপর, আমাদের আর লুকোচুরি খেলে লাভ নেই একথা প্রমাণ করতেই যেন তিনি চিমনির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাইফেল বাগিয়ে তার বল্টুটা সশব্দে খুলে নিলেন।

চালা থেকে নেমে শেবালভকে খবরটা জানানোর কথা ভাবলুম আমি। কিন্তু বনের ধারে আমাদের বাহিনীর যারা লুকিয়ে ছিল তারা ইতিমধ্যে নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল যে আমাদের ফাঁদ পাতা ব্যর্থ হয়েছে, শ্বেতরক্ষীরা আগে ঠিকমতো অবস্থান

না নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে না, তাই দেখলুম ঘোড়সওয়াররা ফিরে যাওয়ার সময় তাদের পেছনে গাছের আড়াল থেকে কিছু বুলেট ছোড়া হল।

দূর থেকে দেখা গেল, আক্রমণের উপযোগী করে ভাঙা ভাঙা সারিতে সাজানো শ্বেতরক্ষীদের ছোট ছোট প্লেটুন-দলগুলো ক্রমশ ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যে-গোলমতো টিলাটার ওপর শ্বেতরক্ষীরা ছড়িয়ে ছিল, ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের শেষ লোকটা সেখানে পৌঁছনোর আগেই ঘোড়াসুদ্ধ তাকে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখা গেল। তারপর হাওয়ায় ধুলোর আস্তরণটা সরে যেতে দেখলুম ঘোড়াটা একাই রাস্তায় পড়ে আছে, আর তার সওয়ার কুঁজো হয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তার বাহিনীর দিকে ছুটে চলেছে।

এই সময়ে একটা বুলেট এসে চিমনির ইটের গাঁথনিতে লাগল। একরাশ চুনবালির ধুলোবৃষ্টির মধ্যে আমরা তাড়াতাড়ি মাথা লুকোলুম। চিমনিটা ওদের ভালো নিশানার কাজ করছিল। ওটার পেছনে থাকায় সরাসরি গায়ে গুলি লাগার হাত থেকে আমরা বাঁচছিলুম সত্যি, কিন্তু নড়াচড়া বন্ধ করে আমাদের বেমালুম শুয়ে থাকতে হচ্ছিল। শেবালভ যদি আমাদের খামুর রোডের দিকে নজর রাখার হুকুম না দিতেন, তাহলে আমরা ওই সময়ে চালা থেকে নেমে পড়তুম। এদিকে অসংলগ্নভাবে এদিক-সেদিক থেকে গুলিচালানোর মাত্রা বাড়তে-বাড়তে ক্রমশ তা নিয়মিত গুলি-বিনিময়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর শ্বেতরক্ষীদের রাইফেল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিচালনাও গেল বন্ধ হয়ে, আর শুরু হল মেশিনগানের পট-পট-পট-পট আওয়াজ। আর এই গুলিচালনার আড়ালে ওদের সৈন্যদের অসমান সারিগুলো তিরিশ-চল্লিশ পা এগিয়ে এসে ফের শুয়ে পড়ল। এরপর মেশিনগান চুপ করে গেল, আর ফের শুরু হল রাইফেল থেকে গুলি-বিনিময়। এইভাবে ক্রমশ শৃঙ্খলা আর প্রশিক্ষণের চমৎকার নিদর্শন দেখিয়ে একটানা নাছোড়বান্দা ভাবে শ্বেতরক্ষীরা আমাদের কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

‘শয়তানগুলো একদম নাছোড়বান্দা,’ চুবুক বিড়বিড় করে বললেন। ‘দাবাবোড়ের ঘুঁটির মতো এগিয়ে আসচে দ্যাখো-না। এদের তো জিখারেভের দলবল বলি ঠেকচে না। জার্মান নয় তো এবা?’

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, ‘চুবুক! খামুর রোডের দিকে একবার দেখুন দেখি। ওখানে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কী যেন একটা নড়ছে মনে হচ্ছে না?’

'কই? কই? কোথায়?'

'না-না, ওদিকে নয়। আরও ডানদিক ঘেঁষে। পুকুরটার ওপাড়ে। হ্যাঁ, ওই-যে, দেখতে পাচ্ছেন?' চেঁচিয়ে বললুম আমি। আর ঠিক সেই সময়, কাচের ওপর এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়লে যেমন হয়, জঙ্গলের ঠিক ধার ঘেঁষে সেইরকম কী-একটা যেন ঝকমক করে উঠল।

আর একটা অদ্ভুত অচেনা শব্দে ভরে উঠল আকাশবাতাস। মরার আগে ঘোড়ার গলায় যেমন ঘড়ঘড়ানি ওঠে, অনেকটা সেইরকম শব্দ। তারপর সেই ঘড়ঘড়ানি ক্রমে পরিণত হল গর্জনে। আর গির্জের ফাটা ঘণ্টার মতো আওয়াজে ভরে উঠল বাতাস। তারপরই কাছাকাছি কিছু একটা ভেঙে পড়ার আওয়াজ পেলুম। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন ঠিক ওইখানেই, আমার ঠিক পাশটাতেই, ধোঁয়া আর কালো ধুলোর একটা মেঘের মধ্যে থেকে ঝলসে উঠল বাদামীরঙের বিদ্যুৎ। বাতাস তোলপাড় করে উঠল, আর গরম জলের ঢেউয়ের ধাক্কার মতো সেই ঝাপ্‌টা আমার পিঠে আছড়ে পড়ল যেন। যখন আমি চোখ খুললুম, দেখলুম ধসে-পড়া গোলাবাড়ির শুকনো খড়ের চালাটা সূর্যের আলোয় প্রায়-অদৃশ্য ফ্যাকাশে আগুনের শিখা মেলে দাউদাউ করে জ্বলছে। এরপর দ্বিতীয় গোলাটা এসে পড়ল শাকসব্জির খেতে।

'এস, নেবে পড়ি,' চুবুক বললেন। আমার দিকে মুখ ফেরালেন যখন, দেখলুম সে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। 'আচ্ছা পাকে পড়া গেচে এবার। আমার ধারণা, ওরা কখনই জিখারেভের দল নয়, নির্ঘাত জার্মান ওরা। খামুর রোডে ওরা কামান বসিয়েচে।'

ছুটতে-ছুটতে জঙ্গলের ধারে গিয়ে প্রথম যে-লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হল, সে লাল ফৌজের বেঁটেখাটো এক সিপাহি। লোকে তাকে খট্টাশ বলে ডাকত।

ঘাসের ওপর বসে পড়ে সে তার রক্তে-ভেজা টিউনিকের হাতাটা অস্ট্রিয়ান বেয়োনেট দিয়ে কেটে ফেলছিল। পাশেই শোয়ানো ছিল তার রাইফেলটা। রাইফেলের বলটুটা ছিল খোলা, আর তার তলা থেকে একটা কার্তুজের খোল তখনও বের না-করা অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের প্রশ্নের জবাব না-দিয়েই সে চ্যাঁচাতে লাগল, 'জার্মান! জার্মান এসে গেচে! কেটে পড়তে হচ্ছে!'

জল তোলার জন্যে তাকে আমার টিনের মগটা দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলুম।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমাদের সেই প্রথম সত্যিকার যুদ্ধের ঘটনাবলী স্মরণ করতে গিয়ে এখন দেখছি, ঘটনার পারম্পর্যের দিক থেকে বিচারে শেষ যে ঘটনাটি আমি মনে করতে পারছি তা হল, খট্টাশের সেই রক্তে-ভেজা জামার হাতা আর জার্মানদের সম্পর্কে তার কথাগুলো। এরপর খাদের মধ্যে ভাস্‌কা শ্মোকভ যখন আমার কাছে এসে জল খাওয়ার জন্যে আমার মগটা চাইল সেই মুহূর্ত থেকে আবার বাকি সবকিছু আমার পরিষ্কার মনে পড়ে।

এসেই ভাস্‌কা আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতে ওটা কী?'

তাকিয়ে যা দেখলুম তাতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলুম। দেখি, আমার বাঁ-হাতে মস্ত বড় একটুকরো ছাইরঙের পাথর শক্ত-করে-ধরা। কী করে যে ওটা আমার হাতে এল তা জানি না।

জিজ্ঞেস করলুম, 'ভাস্‌কা, মাথায় তোমার হেল্‌মেট কেন?'

'একটা জার্মানের মাথা থেকে নিয়েচি। এট্টু জল খাওয়াও দেখি।'

'আমার কাছে তো মগ নেই। আমার মগটা খট্টাশকে দিয়েছি।'

'খট্টাশরে দিয়েচ?' ভাস্‌কা একটা শিস দিল। 'তাইলে ওটারে তুমি বিদেয় দিয়েচ ভাবতি পার।'

'তার মানে? আমি তো জল খাওয়ার জন্যে ওকে মগটা দিয়েছি।'

'ওটারে আর তুমি দেখতি পাবে না,' দাঁত বের করে হেসে ভাস্‌কা বলল। ছোট্ট নদীটা থেকে হেল্‌মেটে করে জল তুলতে-তুলতে আরও বলল, 'মগটাও চলে গ্যাচে, খট্টাশও গ্যাচে তার সঙ্গে।'

'খুন হয়েছে?'

'খুন হয়ে মারা পড়েছে,' কী কারণে জানি না, দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে ভাস্‌কা বলল। 'প্রাইভেট খট্টাশ লাল সৈনিকের মৃত্যু বরণ করেচে।'

বললুম, 'সব ব্যাপারেই তোমার হাসি আসে, ভাস্‌কা! খট্টাশের জন্যে তোমার কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না?'

'কার? আমার?' ভাস্‌কা নাক সিঁট্‌কোল, তারপর নোংরা হাতে ওর ভিজে ঠোঁট দুটো মুছল। 'লিচ্চয় দুঃখু হচ্চে। খট্টাশের জন্যি, নিকিশিনের জন্যি, সের্গেইয়ের জন্যি, এমন কি আমার লিজের জন্যিও দুঃখু হচ্চে। শালারা নিপাত যাক, দ্যাখো-না আমার হাতটার কী দশাখান করেচে!'

কাঁধটায় একটু ঝাঁকি দিল ও। আর আমি লক্ষ্য করলুম, ওর বাঁ-হাতটা এক টুকরো ছাইরঙের কাপড় দিয়ে পটিবাঁধা।

'মাংসর ঘা, এই এট্টু ছড়ে গ্যাচে আর কি। তবে জ্বলতে নেগেচে খুব,' ও বলল। ফের নাকটা সিঁটকে এবার বেশ হাসিখুশিভাবে বলল ভাস্কা: 'তা কথাটা ভাবলি দেখা যায়, আমাদের দুঃখু করার আছে কী? আমাদের কেউ যে জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়েচে এমন তো নয়। কী জন্যি লড়াই করতে আসচি ভালোই জানতাম আমরা, জানতাম না? তবে? এখন শুধু শুধু দুঃখু করে লাভ কী!'

এই লড়াইয়ের মুহূর্তগুলো আমার স্মৃতিতে আলাদা-আলাদাভাবে আঁকা হয়ে আছে, আমি কেবল সেই মুহূর্তগুলোকে একটা সুসংবদ্ধ পরম্পরায় বাঁধতে পারি নি। এখনও মনে পড়ে, এক সময়ে আমি এক হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন জার্মানের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে গুলিবিনিময় করেছিলুম। অথচ লোকটা আমার কাছ থেকে দু-শো পায়ের চেয়ে বেশি দূরে ছিল না। পাছে আমি গুলি ছোড়ার আগেই ও আমাকে গুলি করে বসে এই ভয়ে তাড়াহুড়ো করে নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টানলুম। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমার মনে হয় ও-লোকটারও মনোভাব আমার মতই ছিল, তাই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওর গুলিও আমার গায়ে লাগল না।

আরও মনে পড়ে, কাছাকাছি শত্রুর কামানের গোলা ফাটায় আমাদের মেশিনগানটা ছিট্‌কে উলটে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানটা টেনে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল।

'গুলির পটিগুলোরে টেনে আন!' সুখারেভ চিৎকার করে বলছিলেন। 'হাত নাগাও, নয় চুলোয় যাও!'

ঘাসের ওপর পড়ে-থাকা বাক্সগুলোর একটাকে ধরে আমি হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগলুম। পরে আমার মনে পড়েছিল, তা-ই দেখে শেবালভ আমার কাঁধে একটা খোঁচা দিয়ে গালাগাল দিয়েছিলেন। কেন যে, তা তখন ধরতে পারি নি।

আর তারপরই, আমার যতদূর মনে পড়ে, একটা বুলেট ছুটে এসে নিকিশিনকে পেড়ে ফেলল। কিন্তু না, নিকিশিন বোধহয় এর আগেই মারা পড়েছিলেন, কারণ আমি যখন সেই বাক্সটা টেনে নিয়ে দৌড়চ্ছি তখন তিনি ধমক দিয়ে আমায় বলেছিলেন: 'বাক্সটারে লিয়ে তুমি তো উল্‌টাদিকে দৌড়াচ্ছ দেখি! আরে, ওটারে মেশিনগানের কাছে লিয়ে যাও!' আর এরপরই তাঁকে পড়ে যেতে দেখি।

ফেদিয়ার ঘোড়াটা সেদিন গুলিতে মারা যায়। ও তখন সেই ঘোড়ার পিঠে বসে।

চুবুক পরে বলছিলেন, 'ফেদিয়াটা কানচে। দেখি পাগলা ঘাসের মধ্যি মাথা গুঁজে অঝোরে কানচে। তা, কাছে গিয়ে বললাম, 'বোকামি করিস না, মানুষের জন্যিই কান্নাকাটির ফুরসত নেই, তার আবার।' অমনি ফেদিয়া করল কী, বোঁ-করে এক পাক ঘুরে পিস্তলটারে তুলে ধরল। কইল, 'চলি যাও। চলি যাও নইলে গুলি করব।' ওর চোখ দুটা কেমন পাগলের পারা নাগল। চলি এলাম। পাগলের সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কী? ফেদিয়া ছোকরাটা বাজে, বুইলে?' পাইপটা ধরাতে-ধরাতে চুবুক বললেন, 'ওরে আমি বিশ্বেস করি নে।'

'ওকে বিশ্বাস করেন না মানে?' আমি বললুম। 'ওর মতো সাহসী লোক কটা আছে?'

'তাতে হলটা কী? সব সত্ত্বেও ও ছোকরাটা বাজে। ছোকরা মহা উচ্ছৃঙখল, পার্টির নোকদের মানতি চায় না। ও কয়, 'আমার কর্মসূচি হল গিয়ে শ্বেতরক্ষীরা সব কটা নিকেশ না-হওয়া পেয্যন্ত ওদের সঙ্গে লড়ে যাওয়া। তারপর আমরা কী করব না করব সে সময় হলে দেখা যাবে।' আমার বাপু ওই কর্মসূচি পছন্দ লয়। ওটা কর্মসূচিই লয়, সব ধোঁয়া। আর বাতাসে ধোঁয়া কেটে গেলি দেখা যাবে, কিছুই বত্তমান নেই!'

ওই দিনের যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দশজন লোক মারা যায়। আহত হয় চোদ্দ জন। তার মধ্যে ছ-জন মারা যায় পরে। যদি আমাদের ডাক্তার আর ওষুধসহ আহতদের চিকিৎসার কোনো উপযুক্ত কেন্দ্র থাকত তাহলে আহতদের মধ্যে অনেকেই প্রাণে বেঁচে যেতে পারত সেদিন।

আহতদের ক্ষতস্থান-চিকিৎসা কেন্দ্রের বদলে আমাদের ছিল এক টুকরো ঘাসে-ঢাকা জমি, আর ডাক্তারের বদলে ছিলেন কালুগিন নামে জার্মান যুদ্ধ-ফেরত চিকিৎসা-কেন্দ্রের একজন আর্দালি। ওষুধ বলতে সবে ধন নীলমণি ছিল আমাদের এক ক্যানেস্তারা-ভরতি টিংকচার আয়োডিন। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, অর্থাৎ যে-কোনো রকমের কাটাছেঁড়ায় আয়োডিন ব্যবহারে আমরা ছিলুম অমিতব্যয়ী। এক সময়ে দেখলুম কালুগিন কাঠের তৈরি বড় একটা সুপের চামচ আয়োডিনে কানায় কানায় ভরে লুকোইয়ানভের মস্ত বড় দগ্‌দগে ঘাটায় তার সবটুকুই ঢেলে দিলেন।

তারপর লুকোইয়ানভকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'যন্তন্না একটুকু, বাপু, সহ্যি

করতেই হবে। আইডিনটা তোমার পক্ষে বড় উব্‌গারি, বুইলে? এই আইডিনটুক না থাকলে তুমি বাপু এতক্ষণে পটল তুলতে। হাঁ, এ আমার গিয়ে একদম খাঁটি কথা। তা, এখন তুমি সেরে উঠলেও উঠতি পারবে।'

ওই জায়গাটা ছেড়ে আমাদের তখন উত্তরে যাওয়ার কথা। সেখানে লাল ফৌজের নিয়মিত ইউনিটগুলো সবাই মিলে একটা বেড়াজাল গড়ে তুলেছিল। সেইখানে আমাদের অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। এদিকে আমাদের ঘাটতি পড়ে গিয়েছিল কার্তুজে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আহতদের জন্যে জায়গাটা ছেড়ে নড়তে পারছিলুম না। ওদের মধ্যে জনা পাঁচেক আমাদের সঙ্গে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিল, কিন্তু তিন জনের অবস্থা ছিল সঙ্গীন, তারা সেরেও উঠছিল না আবার মারাও যাচ্ছিল না। এইরকম খারাপ অবস্থা যাদের ছিল, তাদের মধ্যে একজন হল বাচ্চা বেদে ইয়াশ্‌কা। ইয়াশ্‌কা নেহাতই ভুঁড়ে ফুঁড়ে আমাদের মধ্যে এসে উদয় হয়েছিল। ওর সেই উদয় হওয়ার গল্পটা বলি।

একদিন আমরা যখন আর্‌খিপোভ্‌কা গ্রাম থেকে রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছি, তখন রওনা হবার ঠিক আগে আমরা বাহিনীর লোকেরা রাস্তা-বরাবর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম মাথা-গুন্‌তির অপেক্ষায়। গুন্‌তির সময় বাঁ-দিকের সবশেষের লোকটি, আমাদের বেঁটেখাটো খট্টাশ (পরে ও মারা গিয়েছিল), চেঁচিয়ে বলল: 'একশো সাতচল্লিশ!'

ওর আগে পর্যন্ত খট্টাশ সব সময়েই হয়ে এসেছিল একশো ছেচল্লিশ জনের জন। তাই শেবালভ গর্জন করে বললেন:

'ফিরেফিরতি গুন্‌তি!'

দেখা গেল, খট্টাশ আবার সেই একশো সাতচল্লিশ জনের জন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খেপে গেলেন শেবালভ। 'কী সব কাণ্ড-মাণ্ড হচ্ছে? সুখারেভ, দ্যাখো তো গুন্‌তিতে গণ্ডগোল করচে কে?'

'কেউ না,' আমাদের সারি থেকে চুবুক জবাব দিলেন। 'আমাদের মধ্যি একজন নোক বাড়তি আচে।'

বাস্তবিক, দেখা গেল, সারিতে চুবুক আর নিকিশিনের মধ্যে একজন নতুন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার বয়েস আঠারো কিংবা বড়জোর উনিশ হবে। কালোমত একটি ছেলে, এলোমেলো একমাথা কোঁকড়ানো চুল।

শেবালভ তো অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি এখেনে কী করচ, বাপু?’

ছেলেটি চুপ করে রইল।

চুবুক বললেন, ‘ও দেখি দিব্যি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তা আমি ভাবলাম বুঝি দলে লতুন নোক নেয়া হয়েচে। রাইফেল লিয়ে এসে এখেনটায় দাঁড়াল।’

‘কে তুমি?’ শেবালভ চটে আবার প্রশ্ন করলেন।

‘আমি... আমি বেদে, লাল বেদে,’ ছেলেটি এবার উত্তর দিল।

‘ল্-লাল বে-বে-দে?’ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শেবালভ প্রশ্ন করলেন। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, ‘কিন্তু তুমি তো সাবালক বেদে লও দেখি, তুমি তো বাচ্চা বেদে!’

ছেলেটা সেই থেকে রয়ে গেল আমাদের সঙ্গে। আর থেকে গেল ওর ‘বাচ্চা বেদে’ ডাকনামটাও।

সেই বাচ্চা বেদের আঘাত লেগেছিল বুকে। তামাটে মুখখানা ওর হয়ে গিয়েছিল বিবর্ণ, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গিয়েছিল আর কী এক অপরিচিত ভাষায় ও দ্রুত বিড়বিড় করে যাচ্ছিল।

‘এমনি কত বছর তো ফৌজে কাম করে কাটালাম, জার্মান যুদ্ধের আদ্ধেক সময়টাই তো ফৌজে কাটিয়েচি, কিন্তু আমার জীবনে কখনও বেদে সিপাই দেখিনি,’ বলেছিল ভাস্কা শ্মাকভ। ‘তাতার দেখেচি, মোর্দভীয়দের দেখেচি, এমন কি চুভাশও দেখেচি, কিন্তু বেদে একটাও না। যদি আমারে শুধোও তো কই, ওরা নোক সুবিধের হয় না বাপু। কারা আবার ওই বেদেরা? ধর না কেন, ওরা না-ফলায় ফসল, না-করে কোনো কাজকম্মো কিংবা ব্যবসা, ওদের একমাত্তর কাজ হল ঘোড়া চুরি, আর ওদের মেয়ে-লোকরা ভালো মান্ষিদের ঠকিয়ে বেড়ায়। ও ছোঁড়া যে কী কত্তে এখেনে এয়েচে তা ভগাই জানে। স্বাধীনতার কথাই যদি কও তো বলি, ওদের চেয়ে দুনিয়ায় স্বাধীন আর কে আচে? জমিজায়গা ওদের রক্ষে কত্তে হয় না। জমি লিয়ে করবে কী ওরা? মজুরদের সঙ্গেই বা সম্পক্ক কী ওদের? তাইলে? এ-ঝামেলায় মাথা গলিয়ে লাভ কী ছোঁড়ার? সেই জন্যিই আমার মনে লিচ্চে, এর মধ্যি লিচ্চয় অন্য কথা আচে। কী মতলবে ও এয়েচে তা কে জানে।’

‘ও-ও যে বিপ্লবের পক্ষে নয় তা তুমি জানলে কী করে?’

'জীবন থাকতি লয়! বেদে যে বিপ্লবের পক্ষে থাকতি পারে এ আমার জীবন থাকতি পেত্যয় যাবে না। আগের দিনে ঘোড়া চুরির জন্যি মার খেত ওরা, আর বিপ্লবের পরেও ওই জন্যি ওরা মার খেয়ে যাবে!'

'কিন্তু বিপ্লবের পর তো ওরা কিছু চুরি নাও করতে পারে?'

'কে জানে,' বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল ভাস্‌কা। 'আমাদের গাঁয়ে নোকে বেদেদের মুগুর-পেটা করেচে কত, লাঠি দিয়েও কত পিটিয়েচে। তো তাতে হয়েচে কী? স্বভাব কিছু শুধরেচে তাতে? আবার তারা ফাঁক পেলেই চুরি-বাটপাড়ি করেচে। তা, বিপ্লব হলেই ওদের ঘোড়া-রোগ সেরে যাবে ভাবলে কেম্‌নে?'

এতক্ষণ চুবুক চুপ করে ছিলেন। এখন মুখ খুললেন। বললেন, 'তুই তো আচ্ছা বোকা রে ভাস্‌কা। তোর ওই কুঁড়ে আর ঘোড়ার বাইরে একটা জিনিসও যদি চোখে পড়ে তো কী বলেচি। তোর মতে, এত বড় একটা বিপ্লবের মানে হল, তোর জমিদারের সম্পত্তির একটা টুকরো পাওয়া আর জমিদারের খাস বন থেকে কয়েক খান কাঠ হাতানো। এই তো? আর সোভিয়েতের সভাপতি কেবল গেরাম-পের্‌ধানের জায়গায় বসবে আর জীবনটা আগে যেমন চলছিল তেমনই চলবে। তাই না?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিন দুই পরে বাচ্চা বেদে একটু ভালো বোধ করতে লাগল। সন্ধেবেলা আমি যখন ওর কাছে গিয়ে বসলুম, দেখলুম একরাশ শুকনো পাতার ওপর শুয়ে তারাভরা কালো আকাশটার দিকে তাকিয়ে ও গুনগুন করে কী একটা সুর ভাঁজছে।

বললুম, 'বাচ্চা বেদে, আমি তোমার পাশেই একটা আগুনের কুণ্ড জেবলে খানিকটা জল গরম করি। তারপর চা খাওয়া যাবে। আমার ফ্লাস্কে খানিকটা দুধ আছে। চা করি, কেমন?'

দৌড়ে গিয়ে খানিকটা জল সংগ্রহ করলুম। তারপর আগুনের দু-পাশে মাটিতে দুটো বেয়োনেট পুঁতে তাদের ওপর বন্দুকের নল সাফ করার ডাণ্ডাটা এমনভাবে আটকে দিলুম যাতে ডাণ্ডাটা আগুনের কুণ্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে

ঝুলে থাকে আর সেই ডান্ডার ওপর জল ভরে বসিয়ে দিলুম আমার কানাউঁচু খাওয়ার থালিটা। এরপর জখম-হওয়া ছেলেটার কাছে গিয়ে বসলুম।

জিজ্ঞেস করলুম, 'বাচ্চা বেদে, কী গান গাইছ তুমি?'

জবাব দিতে একটু দেরি করল ও। তারপর বলল:

'খুব পুরনো এট্টা গান করচি গো। গানটা বুলচে, বেদেদের লিজের কোনো দেশ নাই, যে-দেশে তারা ভালো ব্যাভার পায় সেটি তাদের দেশ। গানটা আরও বুলচে: 'বল্ তো বেদে, কোন্ দেশে তোরা ভালো ব্যাভার পেয়েচিস?' তা গানটাই জবাব দিচ্চে: 'কত দেশের ইধার-সিধার ঢুঁড়ে বেড়ালম। হাঙ্গারিয়ান দেখলম, বুল্‌গেরিয়ান দেখলম, তুর্কদের দেশেও গেলম, কিন্তুক এমন দেশটি দেখলম নাই যে-দেশের মানুষ আমার জাতভাইদের সাথে ভালো ব্যাভার করে'।'

আমি বললুম, 'বাচ্চা বেদে, তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে গেলে কেন? তোমার জাতভাইদের তো ফৌজে যোগ দিতে ডাকা হয় নি?'

কথাটা শুনে ওর চোখের শাদা অংশ দুটো যেন ঝল্‌সে উঠল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে ছেলেটা জবাব দিলে:

'ফৌজে ডাকবে তবে আসব কেনে? আমি নিজের থেকে এয়েচি। বেদের তাঁবুতে-তাঁবুতে ঘোরা আর ভালো লাগল নি। আমার বাপ ঘোড়া চুরি করতে জানে, মা মান্‌ষির কপাল গনে বলে। আমার ঠাকুন্দাও ঘোড়া চুরি করত, আর ঠাকুমা মান্‌ষির কপাল গনত। কিন্তুক ওদের কেউ তো সুখ চুরি করতে পারলেক না, লিজেদের কপাল গনতেও পারলেক না। ও সব ভুল, সব ভুল।'

উত্তেজনায় উঠে বসেছিল বাচ্চা বেদে। কিন্তু ওর জখম-হওয়া জায়গাটায় যন্ত্রণা হতে থাকায় কুঁকড়ে গিয়ে অস্পষ্ট একটা কাত্‌রানির আওয়াজ তুলে জড়ো-করা পাতার স্তূপের ওপর আবার শুয়ে পড়ল।

দুধটা ফুটে উঠল আর থালিটা আগুনের ওপর থেকে নামাতে না-নামাতে খানিকটা দুধ উপচে পড়ে আগুন দিল নিবিয়ে। হঠাৎ বাচ্চা বেদে হেসে উঠল।

'কী হল? হাসছ যে বড়?'

খুশির একটা ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। বলল, 'আমি ভাবছিলম কী, সকল মান্‌ষিও অমনি করে। রুশী বল, ইহুদি বল, জর্জিয়ান বল কি তাতার বল, সব্বাই পুরনো জীবন মেনে লিয়ে চলে। কিন্তু যেই তাদের সহ্যি করার ক্ষ্যামতা

টগবগ করে ফুটতে থাকে, অমনি তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আগুনে। থালি থেকে জল যেমন পড়লেক না, অমনি। আমার হালও অমনিধারা... যতদিন পারলম সহ্যি করে নিলম, তারপর রাইফেল উঠিয়ে লিয়ে কী করে ভালোভাবে বাঁচা যায় তাই ঢুঁড়তে বেরিয়ে পড়লম।'

'তুমি কী মনে কর, ভালো জীবনের সন্ধান তুমি পাবে?'

'একা তো পাব না, কুছুতে না... তবে সবাই যখন এত করে চাইছে, সবাই মিলমিশ করে ঢুঁড়লে মিলতে পারে বটেক।'

এমন সময় চুবুক কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বললুম, 'বসুন। চা খাবেন নাকি একটু?'

'সময় নেই। বরিস, যাবে নাকি আমার সঙ্গে? কও।'

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম আমি। কোথায় তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন তা জানতে পর্যন্ত চাইলুম না।

'তাইলে, জলদি চা-টুক শেষ কর। আমাদের জন্যি গাড়ি দাঁড়িয়ে আচে।'

'গাড়ি কী জন্যে, চুবুক?'

আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তখন চুবুক বললেন যে আমাদের বাহিনী তার পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু করে ওই জায়গাটা থেকে অল্প খানিক দূরে বোগিচেভের খনি-মজুরদের যে সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ করছে তার সঙ্গে মিলতে যাবে। তারপর ওদের সঙ্গে মিলিত হবার পর একসঙ্গে আমরা লাল ফৌজের প্রধান অংশের সঙ্গে মেলবার জন্যে এগোতে থাকব। কিন্তু এটা করতে গেলে আমাদের ওই তিনজন সাংঘাতিক আহত লোককে সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ এই যাত্রায় আমাদের শ্বেতরক্ষী আর জার্মানদের দখল-করা এলাকা পার হয়ে যেতে হবে।

আমরা তখন যেখানে ছিলুম সেখান থেকে কাছেই ছিল একটা মৌমাছিচাষের বাগান। জায়গাটা অজ পাঁড়া-গা, লোক-চলাচলের এলাকা থেকে একটু দূরে। তাছাড়া মৌমাছি-পালক লোকটি ছিল লাল ফৌজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। আহতরা সেরে না-ওঠা পর্যন্ত সে তাদের আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছিল। চুবুক তখন ওই বাগান থেকেই একটা একঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে আসছিলেন। জানালেন, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই আহতদের সরিয়ে ফেলতে হবে।

'আর কেউ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে?'

'না। শুধু আমরা দুজনা। আমি একাই সামলাতে পারতাম, তবে ঘোড়াটা একটুক বেয়াড়া বলেই মুশকিল। আমাদের একজনরে ঘোড়ার লাগাম ধরে ওরে চালাতি হবে, অপর জন জখমি কমরেড্‌দের দেখাশোনা করবে। তা, তুমি যাবে নাকি?'

'আরে, চুবুক, নিশ্চয়ই যাব। আপনার সঙ্গে আমি যে-কোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত। আচ্ছা, ওখান থেকে আমরা কোথায় যাব? আবার কি ফিরে আসব এখানে?'

'না। ওখেন থেকে নদী পার হয়ে সোজা আমাদের বাহিনীর সঙ্গে মিলতে যাব। চল, তাইলে যাওয়া যাক,' ঘোড়ার মাথাটা যেদিকে ফেরানো সেদিকে যেতে-যেতে চুবুক বললেন। 'দেখো, বাপু, আমার রাইফেলটা পড়ে না যায়,' অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওঁর গলার আওয়াজ ভেসে এল।

অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হল ঘোড়ার গাড়িটা। গাড়ির চাকার ঘষা লেগে একটা ঝোপ থেকে একফোঁটা শিশির ছিটকে এসে আমার মুখে লাগল। আমাদের বাহিনী যাত্রা শুরু করার তোড়জোড়ের সময় আগুনের যে কুণ্ডগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছিল দেখতে দেখতে সেগুলো চোখের আড়াল হয়ে গেল।

রাস্তাটা ছিল খুবই খারাপ। গাড়ির চাকার গভীর দাগ আর কাদা-ভরতি গর্তে বোঝাই, আর আশপাশের গাছের গাঁটওয়ালা শেকড়বাকড় রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়ায় অসম্ভব এবড়োখেবড়ো। চারিদিক এত অন্ধকার যে গাড়ির পাশ থেকেই ঘোড়াটাকে কিংবা চুবুককে দেখা যাচ্ছিল না। আহত ছেলে তিনটে একবোঝা টাটকা খড়ের ওপর শুয়ে চুপচাপ করে চলছিল।

গাড়িটার পেছন-পেছন হেঁটে আসছিলুম আমি। একহাতে গাড়ির পেছনদিকটা ধরে, আরেক হাতে রাইফেলটা শক্ত করে চেপে রেখে। হোঁচট খেয়ে পড়ার হাত থেকে কোনোরকমে নিজেকে সামলাতে-সামলাতে আসছিলুম। চারিদিক নিস্তব্ধ। কাছে কোথাও একটামাত্র চাতকপাখি একঘেয়ে করুণ সুরে আর্তনাদ না-করে চললে আমাদের চারপাশের অন্ধকারটাকে একেবারে প্রাণহীন বলে মনে হত। আমরা সকলেও চুপচাপ যাচ্ছিলুম। কেবল গাড়ির চাকাগুলো যখন কোনো গর্তের মধ্যে পড়ছিল কিংবা গাছের শেকড়ে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠছিল একমাত্র তখনই আহতদের মধ্যে একজন, তিমোশ্‌কিন, অস্পষ্টভাবে একটু-আধটু কাত্‌রে উঠছিল।

যে-জঙ্গলের পথে আমরা তখন যাচ্ছিলুম সেটা আসলে ছিল ছোট্ট একটা বন। কিন্তু সেই বিরল-গাছপালা, অর্ধেক কেটে সাফ-করে-ফেলা বনটাকেই তখন আমাদের

কাছে আদিম, দুর্ভেদ্য এক জঙ্গল বলে বোধ হচ্ছিল। রাস্তার দু-পাশে গাছের সারির মাঝখানটাতে মেঘে-ঢাকা আকাশটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কালো একটা ঘরের ছাদের মত্যো সেটা নিচু হয়ে এসেছে। আবহাওয়া ছিল গুমোট। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন একটা লম্বা আঁকাবাঁকা বারান্দা ধরে হাতড়ে-হাতড়ে চলেছি।

যেতে-যেতে এই রকম অনেক দিন আগেকার আরেক গরমকালের রাত্তিরের কথা মনে পড়ল আমার। সে বোধহয় আরও বছর তিনেক আগেকার কথা হবে। বাবা আর আমি সে-রাত্রে রেলস্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সোজা রাস্তায় যাচ্ছিলুম। সেদিন সে-পথেও এমনি শোনা যাচ্ছিল চাতকের কান্না আর নাকে আসছিল এমনি বেশি-পাকা ব্যাঙের ছাতা আর বুনো রাস্প্‌বেরির গন্ধ।

সেদিন রেলস্টেশনে ভাই পিয়োত্‌র্‌কে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে বাবা ছোট গেলাসের কয়েক গেলাস ভোদ্‌কা খেয়েছিলেন। সেই জন্যেই, নাকি রাস্প্‌বেরির মিষ্টি গন্ধে, তা ঠিক জানি না, বাবা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন আর কথা বলছিলেন অনর্গল। বাড়ি ফেরার পথে তাঁর নিজের অল্প বয়সের কথা আর সেমিনারিতে পড়াশুনোর গল্প বলছিলেন। মনে পড়ে তাঁর ইশকুল-জীবনের কাহিনী আর বার্চ-গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে কীভাবে তাঁদের বেত মারা হত সেই সব কথা শুনতে-শুনতে খুব হাসছিলুম। আমার বাবার মতো অমন একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান লোককে যে কেউ বেত মারতে পারে এটা কেমন হাস্যকর আর অবিশ্বাস্য ঠেকছিল।

'বললেই হল, এ তোমার নিজের কথা নয়। নিশ্চয়ই কোথাও এ-বিষয়ে পড়ে বলছ,' আমি বলেছিলুম 'কার যেন একখানা বই আছে না, তাতে এ-সব লেখা আছে। বইটার নাম 'সেমিনারির রূপরেখা'। কিন্তু ও তো কোন্‌ আদ্যিকালের কথা!'

'তুমি কি ভাবছ আমি বেশিদিন আগে পড়াশুনো করি নি? সেই কোনকালে লেখাপড়া শিখেছি আমি।'

'তুমি তো সাইবেরিয়ায়ও থেকেছ, বাপি। নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক জায়গা সাইবেরিয়া, দ্বীপান্তরের কয়েদীতে গিজগিজ করছে একেবারে। তাই না? পেত্‌কার কাছে শুনেছি, ওখানে নাকি যে-কোনো লোক খতম হয়ে যেতে পারে, আর সেজন্যে নালিশ জানানোরও কেউ নেই।'

শুনে বাবা হাসতে শুরু করে দিলেন। আর আমাকে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। উনি কী যে আমায় বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, সেদিন তা বুঝতে

পারি নি। কারণ, বাবার মতে, সাইবেরিয়ার কয়েদীরা মোটেই নাকি কয়েদী ছিল না, কয়েদীদের মধ্যে বাবার পরিচিতও ছিল অনেকে, আর তাছাড়া সাইবেরিয়ায় নাকি অনেক ভালো লোক ছিল, অন্ততপক্ষে আর জামাসে যত ভালো লোক ছিল সাইবেরিয়ায় তার চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল তারা।

এই সব কথা সেদিন আমার কানে ঢুকলেও মনের মধ্যে ধরা পড়ে নি। এ-রকম আরও কত-যে কথা শ্নেছিল্ম সেদিন! আর মাত্র এখনই সেই সব কথার মানে একটু-একটু ব্ঝতে শ্র্ করেছিল্ম।

'না। আমার সেই অতীত জীবনে কখনই ঘ্ণাক্ষরে আমি সন্দেহ করি নি, কিংবা ভাবতেও পারি নি যে আমার বাবা ছিলেন বিপ্লবী। আর এখন যে আমি লাল ফৌজের সঙ্গে আছি আর কাঁধে রাইফেল বয়ে বেড়াচ্ছি, এর কারণ এই নয় যে আমার বাবা বিপ্লবী ছিলেন আর আমি তাঁর ছেলে। এ-ব্যাপারটা আপনা-আপনিই ঘটেছে। নিজে থেকেই আমি এ-পথ বেছে নিয়েছি,' আমি ভাবল্ম। আর এটা চিন্তা করে নিজের সম্বন্ধে আমার গর্ব বোধ হল। না, সত্যি কথা, এত তো পার্টি ছিল দেশে, অথচ আমি সঠিক পার্টিকেই, একমাত্র বিপ্লবী পার্টিকেই, ঠিক ঠিক বেছে নিতে পেরেছি!

চুব্ককে আমার এই চিন্তার ভাগ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল্ম। আর হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, কই, ঘোড়ার সামনে কেউ তো নেই। তাহলে কি এতক্ষণ ধরে এই অপরিচিত রাস্তায় ঘোড়াটা নিজের খ্শিমতো গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে!

ভয় পেয়ে হাঁক পাড়ল্ম, 'চুব্ক!'

'উহ্!' ওঁর র্ঢ়, সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গেল। 'চ্যাঁচাচ্চ কিসের জন্যি, শ্নি?'

কিছ্টা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বলল্ম, 'এখনও কি অনেক দেরি, চুব্ক?'

'আচে খানিকটে দ্র,' উনি বললেন। তারপর থামলেন। 'ইদিকে এস দিকি একবার। কোটটারে খ্লি ফ্যালো। পাইপটা ধরাব আমি।'

ঘোড়ার মাথা-বরাবর অন্ধকারে পাইপটা ভেসে চলল জোনাকির মতো। আস্তে-আস্তে রাস্তাটা সমতল হয়ে গেল। দ্-ধারের জঙ্গল খানিকটা সরে গেল রাস্তা থেকে। আমরা দ্-জন হাঁটতে লাগল্ম পাশাপাশি।

আমি কী ভাবছিল্ম চুব্ককে খ্লে বলল্ম। আশা করছিল্ম, বলশেভিকদের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলার জন্যে চুব্ক আমার ব্দ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার

প্রশংসা করবেন। কিন্তু চুবুক মোটেই প্রশংসা করার জন্যে ব্যস্ত হলেন না। অন্ততপক্ষে আধখানা পাইপের তামাক ফুঁকে শেষ করার পর ধীরেসুস্থে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন:

'ওরকম হয়েই থাকে। কখনও কখনও কাউরে নিজেরেই মাথা খাটিয়ে সবকিছু ভেবে বার করতি হয়। যেমন, লেনিনরে করতি হয়েছিল। তোমার কথা অবিশ্যি আমি জানি নে।'

'কী বলছেন আপনি?' অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে নিচু গলায় বললুম। 'নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি আমি।'

'নিজে থেকেই... তা এয়েচ বই কি। তোমার তাই মনে লিতেছে বটে। তবে কি জান, জীবনটাই তোমারে এই পথের হদিস দেচে। এই আর কি। ধর না কেন, পেরথম, তোমার বাবারে ওরা মেরে ফেলল। দ্বিতীয়, বলশেভিকদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটল। তিন লম্বর, ইশকুলের বন্ধুদের সঙ্গে তোমার ঝামেলা হল। চার লম্বর কথা, ইশকুল থেকে তোমারে খেদিয়ে দিল। এই ঘটনাগুলো সব বাদ দিলে পর, বাকিটা তোমার নিজের হাত বলতি পার বটে। তবে, মনে কিছু কোরো না,' আমার মনে উনি আঘাত দিয়ে ফেলেছেন বুঝতে পেরে এবার যোগ করে দিলেন, 'তোমার কাছে এয়ার বেশি তো কেউ আশা করে নাই, লয় কি?'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমি নিজেকেই ঠকাচ্ছিলুম এতদিন... তাহলে আমি লাল নই?' আগের চেয়ে আরও একটু চাপা গলায় বললুম। 'আমার ধারণা তাহলে সত্যি নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে কী আমি সব সময়ে পর্যবেক্ষণের কাজে বেরোই নি? নিজের ইচ্ছেয় লড়াই করবার জন্যে আমি কি ফ্রণ্টে যাচ্ছিলুম না?... অথচ এখন...'

'গাধা কোথাকার! এখন কিছুই না! হ্যাঁ, আমি যা কচ্চিলাম — সবটাই ঘটনাচক্র, বুইলে? যেমন, ধর, তোমারে যদি মিলিটারি ইশকুলে পড়ানো হত — তাইলে তোমারে ওরা কাদেত বানিয়ে ছাড়ত আর এতক্ষণ তুমি জেনারেল কার্লোদিনের অধীনে থেকে নড়াই করতে।'

'আর আপনি?'

'আমি?' চুবুক হাসলেন। 'আমার পেছনে বিশ বছর খনি-মজুরের কাজের ইতিহাস আছে, বুইলে খোকা। আর তোমার কোনো কাদেত ইশকুলই আমার মন থেকে সেই বিশ বছররে মুছে দিতে পারত না!'

অসম্ভব মনঃক্ষুণ্ণ হলুম আমি। চুবুকের কথাগুলো আমাকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছিল, তাই চুপ করে গেলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ আবার চুপ করে থাকতে পারলুম না।

"তাহলে, চুবুক, আমার আর এ-বাহিনীতে থাকার দরকার কী? আমি যখন কাদেত হতে পারতুম, কালোদিন-ওয়ালা হতে পারতুম...'

'গাধা কোথাকার!' শান্তভাবে চুবুক বললেন। মনে হল, আমি যে এতটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি তা যেন উনি লক্ষ্যই করেন নি। 'কী তুমি হতি পারতে তা লিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে। তুমি এখন কী, সেই হল গিয়ে আসল কথা। তোমারে আমি এ-সব কথা কেন কচ্চি জান তো, পাছে তোমার মাথা গরম হয় সেই জন্যি। তবে সব সত্ত্বেও কইতে হয়, ছেলেটা তুমি খারাপ লও। আরও ভালো করে তোমারে চেনলে জানলে পর কের্মে তোমারে পার্টিতেও লিয়ে লিতে পারি। বোকা ছেলে কোথাকার!' এবার একটু নরম গলায় বললেন উনি।

আমি জানতুম চুবুক আমায় পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারছিলেন যে সেই মুহূর্তে কতখানি আকুলভাবে, দুনিয়ায় আর সকলের চেয়ে কত বেশি, আমি তাঁকে ভালোবেসেছিলুম? মনে মনে বললুম, 'চুবুক বড় ভালো লোক। মনে রাখতে হবে, তিনি একজন কমিউনিস্ট, দীর্ঘ কুড়ি বছর কাটিয়েছেন খনি-অঞ্চলে, তাঁর চুলে পাক ধরেছে, আর সেই তিনিই আমাকে সর্বদা কাছে-কাছে রাখেন। একা আমার সঙ্গে থাকেন। এর অর্থ, আমি এর যোগ্য। এর যোগ্য হয়ে থাকার আরও বেশি করে চেষ্টা করতে হবে আমাকে। এর পরে যখন আবার সামনাসামনি যুদ্ধ হবে, গুলি আসছে দেখলে তখন আমি ইচ্ছে করেই মাথা লুকোব না। মারা পড়লে পড়ব, কে তোয়াক্কা করে! তাহলে ওরা আমার বাড়িতে মা-র কাছে চিঠি লিখবে: 'আপনার ছেলে ছিল কমিউনিস্ট। বিপ্লবের মহান প্রয়োজনে সে প্রাণবলি দিয়েছে।' খবর পেয়ে মা কাঁদবেন, তারপর আমার ছবিটা বাবার ছবির পাশে দেয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রাখবেন। আর সেই দেয়ালের ওপারে এক নতুন সুখের জীবন স্বাভাবিকভাবে বয়ে যেতে থাকবে।'

'পাদ্রিরা যে মানুষের আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যে গল্প রটিয়ে থাকে, এটা দুঃখের কথা,' আমি ভাবলুম। 'আসলে মানুষের আত্মা বলে আলাদা কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই যদি তার আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে যে-জীবন আসছে সেটা সেই আত্মার

আগে থেকে দেখতে পাওয়া উচিত। মনে হচ্ছে, সেই জীবনটা ভালোই হবে, বেশ মজাদার হবে।'

গাড়ি থামল। চুবুক তাড়াতাড়ি পাইপটা পকেটে পুরে ফেলে চুপিচুপি বললেন:

'শব্দ শুনে মনে লিচ্ছে সামনে কী যেন ধবধবিয়ে আসচে। রাইফেলটা দ্যাও দিকি।'

আহত যাত্রীসহ ঘোড়া আর গাড়ি সবকিছু রাস্তা থেকে নামিয়ে ঝোপের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ির কাছে আমাকে রেখে চুবুক অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরেই ফিরলেন তিনি।

'চুপ, একটা কথাও না... চারটে ঘোড়সওয়ার কসাক। আমারে এট্টা বস্তা দ্যাও দেখি। ঘোড়ার মুখটা ভালো করে ঢেকে দিই, পাছে আবার ডেকে-ডুকে ওঠে।'

ঘোড়ার খুরের খপখপ শব্দ কাছে এগিয়ে এল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম তারই কাছাকাছি এসে কসাকরা ঘোড়াগুলোর গতি কমিয়ে দুল্‌কি চালে চলতে লাগল। এক টুকরো ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের রুপোলি আলো রাস্তাটা আলো করে তুলেছিল। ঝোপের আড়াল থেকে চারটে পাপাখা-টুপি নজরে পড়ল আমার। কসাকদের মধ্যে একজন ছিল অফিসার। তার কাঁধে-আঁটা সোনালী পট্টি এক ঝলক দেখতে পেলুম। ঘোড়ার পায়ের শব্দ যতক্ষণ-না মিলিয়ে গেল ওই জায়গায় অপেক্ষা করে রইলুম আমরা, তারপর ফের রওনা দিলুম।

খামারে গিয়ে পেঁছিলুম যখন, তখন সবে ভোর হচ্ছে।

ঘোড়াগাড়ির শব্দ পেয়ে মৌমাছি-পালক ঘুমচোখে খামারের সদর দরজায় এসে দেখা দিলেন। লোকটি রোগা, লম্বা, লাল চুলওয়ালা এক চাষী। বুকটা চুপসে যাওয়া আর বোতাম-খোলা সুতী কামিজের তলা থেকে তাঁর কাঁধের হাড় দুটো অস্বাভাবিক ঠেলে উঠেছিল। ঘোড়াটাকে খামারবাড়ির উঠোন পার করে তারপর অপর একটা ছোট গেটের ভেতর দিয়ে ঘাসে-ঢাকা, বোঝা-যায়-কি-যায়-না এমন একটা পায়ে-চলা পথের ওপর এনে ফেললেন। বললেন:

'ওইখেনে যাব আমরা। জলার ধারে জঙ্গলের মধ্যি ফসল-মাড়াইয়ের চালা আছে একখান। ওরা ওইখেনে নিশ্চিন্দিতে থাকবে।'

ছোট্ট চালাঘরখানা ছিল খড় দিয়ে ঠাসা, তবে ঠাণ্ডা আর খুব নিস্তব্ধ। ঘরের পেছনের একটা কোণে চটের কাপড় পেতে দেয়া হল। বালিশ হিসেবে ব্যবহারের

জন্যে দ্বটো ভেড়ার চামড়া ভাঁজ করে মাথার নিচে দেয়া হল। কাছেই রইল এক বালতি জল, আর বার্চের বাকল-দিয়ে-তৈরি পাত্রে খানিকটা ক্‌ভাস।

আহত লোকদের বয়ে আমরা চালাঘরটায় নিয়ে গেল্‌ম।

'ওদের খিদে পেয়েচে কী?' মৌমাছি-পালক জানতে চাইলেন। 'তাইলে, ওদের মাথার নিচে র্‌টি আর শোরের চর্বি রাখা আচে, খেতে পারে। গোর্‌ দোয়া হলি গিন্নি খানিকটে দ্বধ দিয়ে যাবে'খন।'

নদী-চরের ওধারে আমাদের বাহিনীর নাগাল পেতে হলে আমাদের তখনই যাত্রা করার দরকার ছিল। আহত কমরেডদের জন্যে যতদ্‌র যা করবার ছিল যদিও আমরা যথাসাধ্য তা করেছিল্‌ম, তব্‌ ওই শত্র্‌-এলাকায় একা তাদের ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে কেমন-যেন অস্বস্তি বোধ করছিল্‌ম।

মনে হল, তিমোশ্‌কিন আমাদের অবস্থাটা ব্‌ঝতে পেরেছেন।

রক্তশ্‌ন্য, শ্‌কনো ঠোঁট নেড়ে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ভাই, বিদায়। চুব্‌ক, তোমারে ধন্যবাদ, তোমারে ধন্যবাদ, বাচ্চা। আশা করি, এই জেবনেই ফের মিলতে পারব তোমাদের সঙ্গে।'

আহতদের মধ্যে সামারিন অন্য দ্‌-জনের চেয়ে বেশি দ্‌র্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শ্‌ধ্‌ চোখ খ্‌লে তাকিয়ে বন্ধ্‌র মতো মাথা নাড়লেন। বাচ্চা বেদে চুপ করে রইল। দ্‌ই হাতের ওপর ভর দিয়ে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। তারপর একটুখানি নিস্তেজ হাসি হাসল।

'ভাইরা, বন্ধ্‌রা, বিদায়,' চুব্‌ক বললেন। 'শিগ্‌গির ভালো হয়ে ওঠ সব। এ-বাড়ির কত্তা আমাদের বিশ্বস্ত নোক, তোমাদের বিপদের মধ্যি ফেলে রেখে পালাবে না। আচ্ছা, চলি, ভালো থাক।'

দরজার দিকে ফিরে যেতে-যেতে সজোরে কাশলেন চুব্‌ক। তারপর রাইফেলের কুঁদোর ওপর তামাকের পাইপটা ঠুকতে লাগলেন।

পেছন থেকে জোর রিন্‌রিনে গলায় বাচ্চা বেদে ডেকে বলল, 'শ্‌ভেচ্ছা জানাই কমরেডরা, তোমাদের জয় হোক!' ওর গলার আওয়াজ শ্‌নে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকাল্‌ম আমরা। 'দ্‌নিয়ার সব শ্বেতরক্ষীদের হারিয়ে তোমাদের জয় হোক,' পরিষ্কার গলায় স্পষ্ট করে শেষের কথাগ্‌লো জ্‌ড়ে দিয়ে কালো চুলে-ভরা মাথাটা নরম ভেড়ার চামড়ার ওপর ধপ করে নামিয়ে নিল বাচ্চা বেদে।

রোদে-পোড়া বালির পাড় নেমে এসে মিশে গেছে জলে। নদীর অগভীর জায়গাগুলোয় ঢেউ খেলছে অল্প-অল্প আর ঝলমল করছে রোদ্দুরে। নদীটার ওপারে আমাদের বাহিনীর কিন্তু কোনো চিহ্ন ছিল না।

ভেবেচিন্তে চুবুক বললেন, 'ওরা লিচ্চয় আরও এগিয়ে গ্যাচে। যাক, তাইতে কিছু আসে-যায় না। এখেন থেকে অল্প দূরেই আমাদের একটা ফৌজী-বেড়াজাল থাকার কথা। আর আমাদের বাহিনীরে ওইখেনে গিয়ে থামতে হবেই।'

'আচ্ছা, চুবুক, একটা ডুব দিয়ে নিলে কেমন হয়?' আমি প্রস্তাব করলুম। 'চট করে চান করে নিই? জলটা দেখুন কী চমৎকার আর কেমন গরম।'

'চানের পক্ষে জায়গাটা কিন্তু ভালো না। বড্ড খোলামেলা চারিদিক।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তাইতে কী হয়েচে, মানে? খালি গায়ে ন্যাংটো নোক কি আর সেপাই থাকে? একটা লাঠি দিয়েই ন্যাংটো একজনেরে ঘায়েল করা চলে। কিংবা ধর, মাত্তর একজনা কসাক ঘোড়ায় চেপে এসি তোমার রাইফেলটা লিয়ে লিতে পারে। তখন কোথা থাকবে তুমি শুনি? জান তো, খোপিওরে একবার এই কাণ্ড হইছিল। আমাদের মতো দুটো নোক নয়, চল্লিশ-জনার গোটা একটা বাহিনী নদীতে চান করতি নেবেছিল। আর মাত্তর পাঁচজনা কসাক এসি ঝাঁপ খেয়ে পড়ল। নদীর মধ্যি গুলি ছুড়তে লাগল তারা। আতঙ্ক কারে কয় সে যদি দেখতে একবার! কিছু নোক সেইখেনেই গুলি খেয়ে মারা পড়ল, আর কিছু সাঁতরে নদী পার হয়ে পালাল। তারপর ন্যাংটো হয়ে বনে বনে ঘুরি বেড়াতে নাগল তারা। চারিদিকের গেরামগুলো ছিল সম্পন্ন, বেশির ভাগ গাঁয়ে ছিল কুলাকদের বাস। কাজেই কোনো গেরামে ঢুঁ-মারার উপায় ছিল না। ন্যাংটো নোক দেখলিই ধরা যেত সে বলশেভিক।'

তা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রাজী করালুম চুবুককে। নদীর পাড় ঘেঁষে যেখানে ঝোপঝাড় ছিল, সেখানটায় গিয়ে চট করে স্নান সেরে নিলুম। তারপর আমাদের ট্রাউজার্স আর বুটজুতো কোমরের বেল্ট দিয়ে বাণ্ডিল করে বেঁধে বেয়োনেটে ঝুলিয়ে নিয়ে নদী পার হলুম দুজন। স্নান করার ফলে রাইফেলগুলো বেশ হালকা লাগছিল আর কার্তুজের থলি দুটো যেন আর পাঁজরে লাগছিল না। নদী থেকে

ওপারে উঠে একটা বনের ধার ঘেঁষে হালকা পায়ে আমরা শার্সি খড়খড়ি ভাঙা পোড়োমতো একটা কুঁড়ের দিকে চললুম। কুঁড়েটার রান্নাঘর থেকে এমনকি তামার পাত পর্যন্ত উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখলুম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, কুঁড়ের মালিকরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে যেখানে যা পেয়েছে সবকিছু উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

চোখ দুটো কুঁচকে খুব সতর্কভাবে চুবুক একবার বাড়িটার চারপাশে ঘুরে দেখলেন। তারপর দুটো আঙুল মুখের মধ্যে পুরে সজোরে কান-ফাটানো একটা শিস দিলেন। জঙ্গলের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে তার প্রতিধ্বনি প্রতিহত হতে-হতে গমগম করে ফিরতে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে ক্রমশ পাতায়-ছাওয়া ঝোপেঝাড়ে গেল মিলিয়ে। কিন্তু শিসের কোনো পালটা সাড়া পাওয়া গেল না।

'আচ্ছা, কী মনে কর? ওদের আসার আগেই আমরা এসে পড়লাম নাকি? হুঁ, দেখছি, আমাদের অপিক্ষে করতে হয়।'

রাস্তা থেকে অল্প একটু ভেতরে ছায়াঢাকা একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে শুয়ে পড়লুম আমরা। বেশ গরম লাগছিল। গায়ের কোটটা খুলে তালগোল পাকিয়ে আমি মাথার নিচে রাখলুম, তারপর স্বস্তি পাওয়ার জন্যে চামড়ার ব্যাগটাও কাঁধ থেকে খুলে রাখলুম। অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলা, রাত্রে থামা আর স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে ঘুমনো—এই সব কারণে রঙ চটে গিয়ে আর ক্ষয়ে ফেটে আমার ব্যাগটা একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাগটার মধ্যে ছিল একটা ছোট ছুরি, এক টুকরো সাবান, একটা ছুঁচ আর এক বান্ডিল সুতো আর পাভলেনকভের রুশ বিশ্বকোষের মাঝের একটা ছেঁড়া অংশ।

বিশ্বকোষ হচ্ছে এমন একখানা বই যা যতবার ইচ্ছে ততবার পড়া চলে। অথচ, তা সত্ত্বেও, কিছুতেই এ বই মুখস্থ করা যায় না। এই কারণে বইখানা আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতুম, আর প্রায়ই বিশ্রামের সময় কিংবা কোনো খাদে বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করার সময় বইটা ব্যাগ থেকে বের করে দলা-মোচড়ান পাতাগুলো ফিরে ফিরে বারবার পড়তুম। বইটাতে পর পর সাজানো নানা বিচিত্র বিষয়ের ওপর একধার থেকে চোখ বুলিয়ে যেতুম। পড়তুম নানা সন্ন্যাসী, রাজা আর জেনারেলদের জীবনী, নানা রকমের বার্নিশ তৈরির ব্যবস্থাপত্র, দার্শনিক পরিভাষা, প্রাচীনকালের নানা যুদ্ধের

উল্লেখ, কোস্টা রিকার ইতিহাস (আগে এ রাজ্যটার নামই শুনি নি), আর সবশেষে জন্তুর হাড় থেকে জমির সার-ময়দা উৎপাদনের বর্ণনা। যাই হোক বইটা থেকে 'এফ' ও 'আর' অক্ষরের মধ্যে যাদের উল্লেখ ছিল এমন দরকারী অদরকারী নানা ধরনের পাঁচমিশেলি খবরাখবর বেশ খানিকটা সংগ্রহ করেছিলুম। তবে ওই 'এফ' ও 'আর'অক্ষরের আগুপিছু অভিধানখানা ছিল ছেঁড়া।

যখনকার কথা বলছি তার কয়েকদিন আগে আমার নির্দিষ্ট জায়গায় পাহারা দিতে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তাড়াতাড়িতে আমি এক টুকরো কালো রুটি ব্যাগটার মধ্যে ভরে রেখেছিলুম। এখন দেখলুম, ভুলে-যাওয়া সেই রুটির টুকরোটা সেঁতিয়ে ভেঙে ভেঙে গেছে আর বইটার কয়েকখানা পাতা ওই সেঁতানো রুটিতে মাখামাখি হয়ে আটকে গেছে। তাই ব্যাগের যাবতীয় জিনিসপত্র ঘাসের ওপর ঢেলে ফেলে রুটিতে মাখামাখি-হয়ে-থাকা ব্যাগের ভেতরটা হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলুম। আর এই সময়ে আমার আঙুলের ঘসা লেগে ব্যাগের চামড়ার আস্তরের একটা কোণ হঠাৎ দেখলুম আলগা হয়ে গেল।

ব্যাগটাকে সূর্যের দিকে তুলে ধরে ওর ভেতরটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল, আস্তরের নিচে এক টুকরো শাদা কাগজ লুকনো।

আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। টেনে আস্তরটা আরও খানিকটা খুলে ফেলে ভেতর থেকে একতাড়া পাতলা কাগজ টেনে বের করলুম। তারপর তার মধ্যে থেকে একখানা খুলে দেখলুম। কাগজখানার মধ্যিখানে দেখলুম দু-মুখো ঈগলের একটা গিলটি-করা প্রতীকচিহ্ন, আর তার নিচে সোনালী বুটিদার অক্ষরে স্পষ্ট করে লেখা 'সার্টিফিকেট' শব্দটা।

সার্টিফিকেটখানা পড়লুম। কাউণ্ট আরাকচেইয়েভ কাদেত কোরের দু-নম্বর কোম্পানির ছাত্র ইউরি ভাল্‌দ্‌কে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছিল যে সে তার ক্লাসের বাৎসরিক পাঠসূচি সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে আর 'চমৎকার পরিশ্রম ক্ষমতার ও আচরণের পরিচয় দিয়েছে সে, তাই তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়ে দেয়া হল।

এই ব্যাগের মালিক সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ল আমার। জঙ্গলে হঠাৎ সেই অচেনা ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া, তারপর তাকে গুলি করে মারা, সব কথাই মনে পড়ল। আর হঠাৎ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে: 'ওঃ, তাহলে

এই হল ব্যাপার!' এখন বুঝলুম, কেন ওর কালো টিউনিকের সব কটা বোতাম ও ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেলেছিল, আর ওর জামার কলারের আস্তরে ছাপমারা সেই অক্ষর কটারই বা মানে কী ছিল।

আরেকখানা কাগজে দেখলুম ফরাসী ভাষায় কাছাকাছি সময়ের তারিখ দেয়া একখানা চিঠি লেখা। যদিও ইশকুলে ফরাসী ভাষাটা শেখা সত্ত্বেও ওটার সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র আমার মনে অবশিষ্ট ছিল, তবু আধ ঘণ্টা ধরে চিঠিটা পড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করে আর আমার জ্ঞানের ফাঁকগুলো স্রেফ আন্দাজ দিয়ে ভরিয়ে নিতে-নিতে এটুকু বুঝলুম যে চিঠিটা কর্নেল কোরেন্‌কভের কাছে কাদেত ইউরি ভাল্‌দের একখানা পরিচয়পত্র।

ওই অদ্ভুত কাগজ দুখানা চুবুককে দেখাতে ইচ্ছে হল। কিন্তু উনি তখনও ঘুমিয়ে আছেন, আর ওঁকে এ জন্যে জাগিয়ে তুলতে ইচ্ছে হল না মোটে। এর আগের দিন সকাল থেকেই উনি খাড়া পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। যাই হোক, কাগজগুলো ফের ভাঁজ করে আমি ব্যাগটার মধ্যে রেখে দিলুম আর অভিধানখানা খুলে পড়তে শুরু করলুম।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। বাতাসের গুনগুনুনি আর পাখির ডাক ভেদ করে হঠাৎ দূর থেকে একটা অন্য রকমের শব্দ আমার কানে এল। উঠে দাঁড়িয়ে কানের পেছনে একটা হাত রেখে ভালো করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলুম। অনেক লোকের একসঙ্গে পা ফেলে আসার শব্দ আর গলার আওয়াজ ক্রমশ বেশি বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চুবুকের কাঁধ ধরে এবার নাড়া দিতে লাগলুম। 'চুবুক, উঠুন, চুবুক! আমাদের লোকেরা আসছে!'

'আমাদের নোকেরা আসচে!' যন্ত্রের মতো আমার কথার পুনরুক্তি করে চুবুক উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা খুব কাছে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠুন।'

'কী কান্ড, ঘুম ধরে গিইছিল একবারে!' অবাক হয়ে চুবুক বললেন। 'আমি কোথায় মিনিট খানেকের জন্যি এট্টু গড়িয়ে নিতে গেলাম। কী কান্ড দ্যাখো দিকি!'

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে যখন চুবুক আমার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলেন

তখনও ও'র চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে আর কড়া রোদ্দুরের জন্যে চোখ দুটো পিটপিট করছে।

ওদের গলার আওয়াজ একেবারে যেন পাশেই শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমি কুঁড়েটার পেছন থেকে লাফিয়ে সামনে পড়ে মাথার টুপিটা ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলুম কাছে-এসে-পড়া কমরেডদের স্বাগত জানাতে।

ওপর দিকে ছোড়া টুপিটা যে কোথায় গিয়ে পড়ল তা দেখার আর ফুরসত হল না। কারণ সেই মুহূর্তে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, বুঝতে পারলুম একটা মারাত্মক ভুল ঘটে গেছে।

আমার ঠিক পেছন থেকে ফ্যাসফেসে ক্রুদ্ধ গলায় চুবুক চিৎকার করে উঠলেন, 'ফেরো শিগ্‌গিরি!'

গুড়ুম ... গুড়ুম ... গুড়ুম ...

বাহিনীটার সামনের সারি থেকে প্রায় একসঙ্গে তিনটে গুলি ছুটে এল। আর কী একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমার হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে তার কুঁদোটা এমন আক্রোশে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিলে যে আমি কোনোক্রমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু ওই গুলির আওয়াজ আর জোর ধাক্কা আমার হতবুদ্ধি ভাব আর অসাড় অবস্থাটা কাটিয়ে তুলল। হঠাৎ মনে হল, 'এরা তো শ্বেতরক্ষী,' সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চুবুকের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। এই সময়ে চুবুক পালটা গুলি চালালেন।

এর পর পুরো একটি ঘণ্টা চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া শত্রু সৈন্যের হাতে পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা রয়ে গেল। তবে শেষপর্যন্ত আমরা ওদের বেষ্টনী এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাতে সমর্থ হলুম। আমাদের পেছনে ধাওয়া-করা লোকগুলোর গলার আওয়াজ ক্ষীণ হতে-হতে একেবারে মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও মুখ লাল করে, ঘামে জবজবে হয়ে ভিজে আমরা যে-দিকে-চোখ-যায় দৌড়তে লাগলুম। শুকনো ঠোঁট দুটো ফাঁক করে তখনও জঙ্গলের ভিজে ভিজে হাওয়া গিলছি, পা দুটো কনকন করছে, পায়ের পাতা দুটো জ্বলে যাচ্ছে যেন, তবু কাটা গুঁড়ি আর ঢিবিতে হোঁচট খেতে-খেতে ছুটে চলেছি।

অবশেষে এক জায়গায় ঘাসের ওপর ধপ করে বসে পড়ে চুবুক বললেন, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এখন একটুক আরাম করা যাক। উহ, অতি অল্পের জন্য পেরানটা

বে'চে গ্যাচে! আমারই দোষ। ঘ্মোতে গেলাম কেন। তুমি চ্যাঁচাতি শ্রু করলে: 'আমাদের নোক! আমাদের নোক!' ভাবলাম, তুমি লিচ্চয় সব দেখে শ্নেই কচ্চ। ব্যস, কোনোদিক না তাকিয়ে আধঘ্মন্ত অবস্থায় ছ্টে চললাম।'

এই সময় আমার হাতের রাইফেলটার দিকে নজর পড়ল। দেখল্ম, কু'দোটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে, গ্লি রাখার খোপটাও গেছে বে'কে তুবড়ে।

চুব্কের হাতে রাইফেলটা তুলে দিল্ম। একবার ওটার দিকে তাকিয়ে উনি রাইফেলটা ছ্ড়ে ঘাসে ফেলে দিলেন।

'রাইফেল লয়, ওটা লাঠির সামিল হয়ে গ্যাচে,' অবজ্ঞাভরে বললেন উনি। 'এটা দিয়ে এখন শোর ঠেঙানো চলে, আর কিছ্ না। যাক গে। তোমার গায়ে যে গ্লি নাগে নি এই ঢের। কোটটা গেল কোথা তোমার? চলি গ্যাচে? আমার গ্টিয়ে রাখা ফৌজী কোটটা কোথা ফেললাম কে জানে? তাইলে, ইয়ার, এই হল গে অবস্তা!'

কামিজের কলার আলগা করে দিয়ে, পা থেকে ব্ট খ্লে ফেলে, নড়াচড়া না করে ঘাসের ওপর চুপচাপ শ্রে পড়ে থেকে আমরা অনেকক্ষণের জন্যে লম্বা একটানা বিশ্রাম নিতে পারতুম। কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদের চেয়েও জলতেষ্টা সাংঘাতিক প্রবল হয়ে উঠল। অথচ কাছেপিঠে কোথাও জলের চিহ্নমাত্র ছিল না।

উঠে পড়ে সতর্কভাবে হাটতে শ্রু করল্ম। একটা মাঠ পেরিয়ে দেখল্ম খানিকটা দ্রে একখানা গ্রাম। গ্রামের ছোট-ছোট কু'ড়েগ্লো যেন পাহাড়ের পক্ষপ্টে আশ্রয় নিয়ে আছে। খড়ের চালওয়ালা শাদা শাদা মাটির কু'ড়েগ্লোকে দ্র থেকে দেখতে লাগছিল যেন একগোছা বাদামী টোপরওয়ালা ব্যাঙের ছাতা। কিন্তু গাঁয়ে ঢুকতে সাহস হল না। মাঠ পেরিয়ে আমরা একটা ছোটখাট বনের মধ্যে ঢুকল্ম।

হঠাৎ থেমে পড়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক-দেয়া লালরঙের টিনের চালের একটা কোণের দিকে আঙ্ল দেখিয়ে আমি ফিসফিস করে বলল্ম, 'একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।'

অতর্কিতে পাছে আক্রান্ত হই এই ভয়ে সাবধানে গ্'ড়ি মেরে আমরা বাড়িটার উ'চু বেড়ার ধার পর্যন্ত এগোল্ম। গেটটা ছিল তালাবন্ধ। বাড়িটা থেকে না-শোনা যাচ্ছিল কুকুরের ডাক বা ম্রগির কোঁকর-কোঁ, না গোয়ালে গোর্র খ্রের শব্দ।

সবকিছু ছিল একদম চুপচাপ। যেন মনে হচ্ছিল আমরা আসছি বলে যত ক'টা জনপ্রাণী ছিল বাড়িটায় সব লুকিয়ে পড়েছে। বাড়িটার চারপাশ একবার ঘুরে দেখলুম আমরা, কিন্তু ভেতরে ঢোকার কোনো রাস্তা খুঁজে পেলুম না।

চুবুক বললেন, 'আমার পিঠের উপরি উঠে বেড়ার উপর দিয়ে ভেতরটা একবার দ্যাখো দিকি।'

বেড়ার ওপর দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলুম। খালি চোখে পড়ল খামারবাড়ির শূন্য উঠোনে ঘাস গজিয়ে গেছে আর ফুলের কেয়ারিগুলো পায়ে দলাই-মলাই করা। কেবল এখানে-ওখানে পায়ে-পেষা দু-চারটে ডালিয়া ফুল আর নীল তারা-চোখো প্যানজি তখনও ধুকপুক করে বেঁচে আছে।

'হল?' চুবুক অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'নেবে পড় দিকি। কী ভাবো আমার শরীলটারে — পাথরে-গড়া না কি!'

লাফিয়ে নেমে পড়ে বললুম, 'কেউ কোথাও নেই। বাড়িটার সামনের জানলাগুলো সব তক্তা সেঁটে বন্ধ করা আর পাশের জানলাগুলোর চৌকাঠ পর্যন্ত লোপাট হয়ে গেছে। দেখেই মনে হয়, লোক থাকে না এখানে, পোড়ো বাড়ি একটা। তবে উঠোনে একটা পাতকুয়ো আছে।'

বেড়ার একখানা আলগা তক্তা টেনে-হিঁচড়ে খুলে ফেলে সেই ফাঁক দিয়ে আমরা ভেতরের উঠোনে ঢুকে পড়লুম। কুয়োর ছাতাপড়া গর্তটার মধ্যে অনেক নিচে কালির ফোঁটার মতো চকচক করছিল জল, কিন্তু কুয়ো থেকে জল তোলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একটা চালার নিচে স্তূপাকার ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের মধ্যে চুবুক একটা মরচে-ধরা ফুটো বালতি খুঁজে পেলেন। কিন্তু বালতিটাকে কুয়োয় নামিয়ে যখন টেনে তোলা হল তখন দেখা গেল একটুখানি তলানি জল পড়ে আছে ওটায়। ফুটোটাকে ঘাস দিয়ে কোনমতে বন্ধ করে আবার জল তোলার চেষ্টা করা হল। এবার খানিকটা জল উঠল। জলটা পরিষ্কার আর এত ঠাণ্ডা যে তা আমাদের অল্প-অল্প করে চুমুক দিয়ে খেতে হল। ধুলোমাখা, ঘামে-ভেজা মুখগুলো ধুয়ে আমরা বাড়িটার কাছে গেলুম। বাড়িটার সামনের জানলাগুলো তক্তা মেরে বন্ধ করা ছিল বটে, কিন্তু বারান্দা দিয়ে উঠে দেখলুম একপাশের দরজাটা হাট করে খোলা। নিচের একটামাত্র কব্জায় ভর করে ঝুলছিল পাল্লাটা। কিঁচকিঁচ আওয়াজ-করা তক্তাগুলোর ওপর সাবধানে পা রেখে রেখে আমরা ভেতরে ঢুকলুম।

ভেতরে ঢুকে দেখলুম ঘরময় খড়কুটো, কাগজ আর ছেঁড়া ন্যাকড়া ছড়ানো। তাছাড়া ছিল কয়েকটা ফাঁকা প্যাকিং বাক্স, একটা ভাঙা চেয়ার আর একটা সাইডবোর্ড, যার দরজাগুলো ভোঁতা আর ভারি কোনো জিনিস দিয়ে ভেঙে খোলা হয়েছে।

নিচু গলায় চুবুক বললেন, 'চাষীরা খামারটে লুট করেচে। দরকারী সবকিছু লিয়ে বাদবাকি জিনিস ছেড়ে গেচে।'

পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখলুম মেঝের ওপর একগাদা বই এলোমেলোভাবে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। চটের মাদুর দিয়ে বইগুলো ঢাকা। বইগুলোর মধ্যে এক মোটাসোটা ভদ্রলোকের একটা ছেঁড়া ফোটোগ্রাফও দেখতে পেলুম। কে যেন কালিতে আঙুল ডুবিয়ে ছবির মানুষটার ফর্সা, গর্বোদ্ধত কপালে একটা অসভ্য কথা লিখে রেখেছিল।

ওই যথাসর্বস্ব লুট-করে-নেয়া, পরিত্যক্ত বাড়িটার ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়ানো ছিল ভারি অদ্ভুত আর মজার এক অভিজ্ঞতা। ওখানকার প্রতিটি টুকিটাকি জিনিস — যেমন একটা ভাঙা ফুলদানি, ভুলে-ফেলে-যাওয়া একখানা ফোটোগ্রাফ, জঞ্জালের মধ্যে ঝিলিক-দেয়া একটা বোতাম, ছড়ানো-ছিটনো, পায়ে-মাড়ানো দাবার ঘুঁটিগুলো, ভাঙা একটা জাপানি ফুলদানির টুকরোর মধ্যে একা-একা পড়ে থাকা তাসের প্যাক থেকে ছিটকে-পড়া একটা ইস্কাপনের রাজা — পাড়াগাঁয়ের ওই জমিদারবাড়ির এককালের বাসিন্দাদের আর বিক্ষুব্ধ তৎকালীন বর্তমান থেকে কত আলাদা তাদের নিরুদ্বেগ অতীত জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

পাশের ঘর থেকে হঠাৎ থপ্ করে একটা নরম পায়ের আওয়াজ কানে এল। পোড়ো বাড়িটার চারিদিকে ছড়ানো ক্ষয় আর ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে ওই শব্দটা এত অপ্রত্যাশিত ছিল যে শুনে আমরা চমকে উঠলুম।

'ওখেনে কে?' চুবুকের জোরালো গলার চিৎকারে নৈঃশব্দ্য ছিঁড়ে গেল। উনি রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলেন।

হালকা বাল্লির রঙের প্রকাণ্ড একটা বেড়াল লম্বা-লম্বা পা ফেলে চুপিচুপি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমাদের দু-হাতের মধ্যে এসে বেড়ালটা থেমে মিউ-মিউ করে ডেকে খিদে জানাল, তারপর ঠাণ্ডা, সবুজ বিদ্বেষভরা চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর গায়ে হাত বুলোতে গেলুম, কিন্তু ও পিছিয়ে গিয়ে, একলাফে জানলাটা ডিঙিয়ে বাইরের ফুলের কেয়ারির ওপর গিয়ে পড়ল। পরক্ষণে ঘাসের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বেড়ালটা।

'আশ্চর্য কিন্তু, বেড়ালটা এখনও না-খেয়ে মরে নি।'

'মরতে যাবে কোন দুঃখে। বেড়াল তো ই'দুর খায়। তা গন্ধেই মালুম দিচ্ছে, জায়গাটা ই'দুরে ভরতি।'

দূরের একটা দরজা ক্যাঁচ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটার মধ্যেও ছ্যাঁত করে উঠল যেন। তারপর খুব মৃদু কিছু একটা ঘষ্‌টানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল যেন কেউ শুকনো একটা ন্যাকড়া দিয়ে মেঝেটা ঘষছে। পরস্পর চোখ-তাকাতাকি করলুম আমরা। কারণ, আওয়াজটা ছিল মানুষের পায়ের।

আমাকে টেনে নিয়ে জানলার দিকে যেতে-যেতে, রাইফেলটা বাগিয়ে চুবুক ফিসফিস করে বললেন, 'শয়তানটা কে হতি পারে?'

অল্প একটু কাশির শব্দ, তারপর দরজাটা খোলার জন্যে ধাক্কা লেগে মেঝেয়-পড়ে-থাকা কাগজের খড়মড় আওয়াজ। তারপর ঘরে ঢুকল একজন বুড়ো লোক। লোকটির দাড়ি গোঁফ ভালো করে কামানো হয় নি, পরনে জীর্ণ নীলরঙের পাজামা, খালি পায়ে স্লিপার গলানো। লোকটি আমাদের দিকে অবাক হয়ে কিন্তু নির্ভয়ে তাকাল। তারপর নিচু হয়ে ভদ্রতাসূচক অভিবাদন জানিয়ে অনুভূতিশূন্য গলায় বলল:

'আমি তাই অবাক হচ্ছিলুম, নিচের তলায় কে আবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবলুম, চাষীরাই ফিরে এসেছে হয় তো। কিন্তু তাও মনে হল না, কারণ জানলা দিয়ে তাকিয়ে নিচে কোনো ঘোড়ার গাড়ি তো দেখতে পেলুম না।'

কাঁধে আবার রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিতে-নিতে চুবুক কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনে কে?'

'আমি কি আগে জিজ্ঞেসা করতে পারি, তোমরা কে?' বৃদ্ধ আগের মতোই শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় পালটা প্রশ্ন করল। 'যদি তোমরা এ বাড়িতে আসা দরকারই বোধ করে থাক, তাহলে দয়া করে বাড়ির কত্তার কাছে তোমাদের পরিচয় দেবে কী? অবিশ্যি, অনুমান করা শক্ত নয়,' চুবুকের সর্বাঙ্গে মলিন কটা চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো ফের বলল, 'তোমরা লাল, তাই না?'

লোকটির নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, যেন কেউ টেনে ঠোঁটটা নিচে নামিয়ে দিল। একটা সোনার দাঁত ঝলসে উঠেই হলদে আভা ছড়িয়ে ফের মিইয়ে গেল, আর হঠাৎ সজাগ হয়ে-ওঠা চোখের পাতা দুটো লোকটির কটা চোখ থেকে যেন

ধুলো ঝেড়ে ফেলে দিল। অতিথিপরায়ণ গৃহকর্তার মতো আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে বৃদ্ধ আমাদের তার সঙ্গে যেতে বলল:

'আস্তাজ্ঞে হোক, ভদ্রমহোদয়গণ।'

পরস্পরের দিকে থতমত খেয়ে তাকালুম আমরা। তারপর বিধ্বস্ত ঘরখানার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে সরু একটা কাঠের সিঁড়ি ধরলুম।

'অতিথিদের এখন আমি দোতলায় বসাই কিনা', আমাদের গৃহকর্তা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল। 'একতলাটা এত নোংরা হয়ে আছে। সাফ করার লোকও নেই, সবাই সরে পড়েছে। এইদিকে এস।'

ছোট্ট কিন্তু আলোহাওয়া যুক্ত একটা ঘরে এসে হাজির হলুম আমরা। ঘরটায় দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল ছেঁড়াখোঁড়া, ছোবড়া-বের-করা, পুরনো ভাঙাচোরা একটা সোফা। চাদরের ঢাকনার বদলে সোফাটা গাছের বাকলে-তৈরি মাদুর দিয়ে ঢাকা ছিল। আর, এককালে দেখতে সুন্দর ছিল কিন্তু এখন বড়-বড় পোড়া গর্তে ভরতি এমন একখানা গালচে দিয়ে সোফার ওপর কম্বলের কাজ চালানো হচ্ছিল। সোফার পাশেই দাঁড় করানো ছিল তেপায়া একটা লেখার টেবিল। টেবিলটার ওপর ক্যানারি পাখি-সমেত একখানা খাঁচা ঝুলছিল। ক্যানারি পাখিটা ছিল আবার মরা। পাখিটা যে অনেক কাল আগেই মরে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। দানার পাত্রের মধ্যে ঠ্যাং দুটো ওপর-দিকে-করে মরে পড়ে ছিল পাখিটা। ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছিল কয়েকখানা ধুলোয়-ঢাকা ফোটোগ্রাফ। বোঝা যাচ্ছিল, বাড়ির ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের মধ্যে যে ক-খানা অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকে ওই ঘরে বৃদ্ধের ব্যবহারের জন্যে টেনে আনতে অপর কেউ গৃহকর্তাকে সাহায্য করেছিল।

'বোসো, বোসো,' সোফাটা দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল। 'এখানে আমি একাই থাকি, বুঝেছ। অনেক কাল বাড়িতে অতিথ-জন আসে না। চাষীরা কদাচিৎ-কখনও আসে এটা-ওটা জিনিস নিয়ে। তবে অনেক কাল কোনো ভদ্দরলোকের মুখ দেখি নি। ক্যাপটেন শ্‌ভার্ৎস অবিশ্যি একবার এসেছিলেন বটে। তাঁকে চেনো নাকি তোমরা? ওহো, কিছু মনে কোরো না, তোমরা যে আবার লাল। তাও তো বটে।'

আমাদের গৃহকর্তা সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে দু-খানা প্লেট আর দুটো কাঁটা বের করল। প্লেট দুটো, বোঝা গেল, বিপর্যয়ের হাত এড়াতে পেরেছিল। কাঁটা দুটোর একটা ছিল কাঠের হাতলওয়ালা রান্নাঘরে ব্যবহার করার মতো সাধারণ কাঁটা, আর

দ্বিতীয়টা ছিল কারুকাজ-করা আর বাঁকানো, ভোজের শেষে ফল-মিষ্টি খাওয়ার কাঁটা। এই দ্বিতীয় কাঁটাটার একটা দাঁড়া আবার ছিল ভাঙা। যাই হোক, এরপর গৃহকর্তা সাইডবোর্ড থেকেই বের করল একখানা আস্ত কালো পাঁউরুটি আর ইউক্রেনীয় সসেজের মালার আধখানা।

তারপর ঝুলকালিতে প্রায় কালো-হয়ে-গেছে এমন একটা কেটলি ত্রিভঙ্গমুরারি একটা কেরোসিন স্টোভের ওপর বসিয়ে গৃহকর্তা তোয়ালেয় হাত মুছল। তোয়ালেটা-যে কতদিন কাচা হয় নি তা ভগবানই জানে। তারপর সে দেয়াল থেকে একটা অদ্ভুত আকারের সুন্দর পাইপ নামাল। পাইপটার গায়ে খোদাই-করা ছাগলের মূর্তিতে মানুষের মুখ ছিল বসানো। ছাগলটার দন্তহীন মুখে ছিল একগাল হাসি। পাইপে মাখোরকা তামাক ভরে লোকটি এবার মচমচ-আওয়াজ-করা স্প্রিং-উঁচনো একটা ভাঙাচোরা আরাম-কেদারায় বসল। আর ওর এইসব কাজকর্ম চলার সময় আগাগোড়া আমরা চুপচাপ সোফাটার ওপর বসে রইলুম। বৃদ্ধ একবার আমাদের দিকে পেছন ফিরতে চুবুক আমাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখালেন। উনি কী বলতে চাইছিলেন বুঝে আমিও হাসলুম।

'অনেক দিন পর আবার লালেদের দেখছি,' গৃহকর্তা বলল। তারপর প্রশ্ন করল: 'আচ্ছা, লেনিনের শরীরগতিক কেমন? ভালো তো?'

'লেনিন ভালোই আছেন। ধন্যবাদ,' চুবুক গম্ভীরভাবে বললেন।

'হুম্, ভালোই, ভালোই।'

বৃদ্ধ এবার একটা তার দিয়ে বোট্কা-গন্ধ-ছড়ানো পাইপের মুখটা খোঁচাতে লাগল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সে তো বটেই, ভালো থাকবেন না-ই বা কেন?' তারপর একটু থেমে, যেন আমাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে এইভাবে, ফের বলল: 'আমার শরীরটে কিন্তু ভালো যাচ্ছে না। অনিদ্রা রোগ, এই আর কি। মনের সেই আগেকার ধীরস্থির ভাবটা আর নেই কিনা। রাত্তিরে কখনও-কখনও বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরগুলোয় ঘুরপাক খাই — চারিদিক এত নিঝুম হয়ে গেছে, খালি ইঁদুরের খুটখাট ছাড়া আর কিছু শোনাই যায় না।'

খুদে-খুদে হাতের লেখায় ভর্তি একতাড়া ছোট-ছোট কাগজ দেখে আমি প্রশ্ন করলুম, 'কী লিখছেন কাগজে?'

'ওই আর কি, আজকালের সব ঘটনা সম্বন্ধে আমার মতামত,' লোকটি জবাব দিল। 'বিশ্বের পুনর্গঠন নিয়ে একটা পরিকল্পনার ছক তৈরি করছি। আমি একজন দার্শনিক কিনা, জীবনে নানা ঘটনার আনাগোনা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষপাতশূন্য। কোনো কিছুর জন্যে অভিযোগ নেই আমার।'

বৃদ্ধ একবার উঠে চুপিচুপি জানলার দিকে তাকাল। তারপর ফের নিজের জায়গায় এসে বসল।

'জীবনে অনেক সময় অনেক রকম হট্টগোল ওঠে, কিন্তু সত্য চিরকাল থেকে যায়। হ্যাঁ, সত্য টিকে থাকবেই চিরকাল,' নিজের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বোধ হয় কিছুটা উৎসাহী হয়ে উঠে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করল, 'এর আগেও দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেক হয়েছে। পুগাচেভের বিদ্রোহ ছিল, উনিশ শো পাঁচও ছিল। এই একই ভাবে জমিদারবাড়িগুলো ভেঙেচুরে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যা ধ্বংস হয়েছিল সময়ে আবার ছাই থেকে ফিনিক্স পাখির মতো তা মাথা চাড়া দে' উঠল, আর যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল তা ফের জোড়া লেগে গেল।'

'কী বলতে চান আপনে? আপনে নিশ্চয় সবকিছু সেই পুরনো ধাঁচে ফিরিয়ে নেয়ার কথা ভাবচেন না, না কি?' চুবুক কিছুটা রুক্ষভাবে কথাগুলো বললেন।

সরাসরি এভাবে প্রশ্ন করায় বৃদ্ধ কেমন যেন চুপসে গেল। মনরাখা হাসি হেসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'না-না, সে কী কথা! কে বললে আমি তা চাই? মোটেই চাই নে। আরে, আমি না, ক্যাপটেন শ্ভার্ৎস তা-ই চান। চাষীগুলো আমার কাছ থেকে যা ধার করে নিয়ে গেছে, উনি এমন কি সে সবকিছু আমাকে ফেরত দেয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হই নি। আমি চাই চাষীরা বরং একটু-আধটু খুদকুঁড়ো খেতে দিয়ে আমায় সাহায্য করুক আর আমার সম্পত্তি ওরা সুখেস্বচ্ছন্দে ভোগ করুক।'

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ ফের উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। তারপর তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে ফিরে এল।

'আরে, আরে... জল তো ফুটে গেছে দেখছি। এস, তোমরা টেবিলে এসে বস।'

দ্বিতীয়বার আর ডাকতে হল না আমাদের। রুটির টুকরোগুলো মুচমুচ করে আমাদের দাঁতের চাপে ভাঙতে লাগল, রসুনের গন্ধওয়ালা সসেজের সুঘ্রাণে আমাদের নাক হয়ে উঠল ভরপুর।

গৃহকর্তা এক সময়ে পাশের ঘরে গেল। এ-ঘর থেকে আমরা দেরাজের টানা খোলার আওয়াজ পেলুম।

'মজার বুড়ো,' ফিসফিস করে আমি বললুম।

'মজার বটে, কিন্তু,' সায় দিয়েও চুবুক বললেন, 'কিন্তু ও জানলা দিয়ে বারবার বাইরের দিকি দেখচে কেন?'

কথাটা বলেই চুবুক ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। এবার ঘরের এক কোণে পাতা পুরনো একটা চটের থলের দিকে ওঁর চোখ পড়ে গেল। ভুরুটা কুঁচকে উনি উঠে ঘরের ওপাশে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এই সময়ে গৃহকর্তা ফিরে এল। ওর হাতে ছিল একটা বোতল। নিজের পাজামার তলাটা দিয়ে বোতলের গায়ে-জমা ধুলো ও মুছে নিল।

'এই-যে, এস,' টেবিলের কাছে এসে গৃহকর্তা বলল। 'ক্যাপটেন শ্‌ভার্ৎস যখন শেষবার এসেছিলেন তখন এ-বোতলটা শেষ করতে পারেন নি। এস, তোমাদের চায়ে একটু করে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দিই। জিনিসটা আমার নিজেরই ভারি পছন্দ, তবে কিনা অতিথদের জন্যে... অতিথ বলে কথা...' বোতলের মুখে-আটকানো ছিপির বদলে একদলা কাগজ টেনে খুলে বোতলের জিনিসটা আমাদের গেলাস দুটোয় ঢেলে দিল ও। আমার গেলাসটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াতেই জানলা থেকে চুবুক ছুটে এসে রূঢ়ভাবে আমায় বললেন:

'আচ্ছা ছেলে তো তুমি! ঘরে-যে সবার জন্যি যথেষ্ট গেলাস নেই, চোখি দেখতে পাও না? যাও, গা এলিয়ে বসে না থেকি জায়গাটা বুড়া ভদ্দরনোকরে ছেড়ে দ্যাও দিকি। তুমি পরে খেও। আসুন, বুড়োবাবা, বসুন। আমরা দু-জনা একসঙ্গে খাই।'

হঠাৎ অমন রুক্ষভাবে আমার সঙ্গে কথা বলায় আমি অবাক হয়ে চুবুকের দিকে তাকালুম।

'না-না, থাক, থাক!' বলতে-বলতে বৃদ্ধ গেলাসটা ঠেলে সরিয়ে দিল। 'আমি পরে খাব অখন। তোমরা হলে গিয়ে আমার অতিথ...'

'খান, বুড়োবাবা,' দৃঢ়সংকল্পের ভঙ্গিতে গৃহকর্তার দিকে গেলাসটা এগিয়ে দিতে-দিতে চুবুক ফের বললেন।

'না-না, ও নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না,' বৃদ্ধও জিদ ধরে বলতে লাগল। আর হাঁকুপাঁকু করে গেলাসটা ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে উলটে ফেলল।

আমি আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসলুম। বৃদ্ধ গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। তারপর জানলার ময়লা পরদাটা টেনে দিলেন।

'কী হল?' চুবুক বললেন।

গৃহকর্তা বলল, 'ডাঁশমশা। জ্বালিয়ে মারলে একেবারে। বাড়িটা নাবাল জমির ওপর কিনা। তাই ডাঁশমশায় থিকথিক করে।'

'আপনে একাই থাকেন এখেনে?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন চুবুক। 'তাইলে ঘরের কোণে ওই আরেকটা বিছানা কী জন্যে?' আঙুল দিয়ে মেঝের ওপর পাতা চটটা দেখিয়ে দিলেন এবার।

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই পরক্ষণে উঠে পড়লেন চুবুক। তারপর জানলার পরদাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে বাইরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমিও উঠে পড়ে জানলার কাছে এলুম।

জানলা দিয়ে টিলা আর জঙ্গলের অনেকখানি দৃশ্য চোখে পড়ল। বাড়ি থেকে রাস্তাটা ঢেউ-খেলিয়ে উঁচুনিচু হতে-হতে দূরে চলে গেছে। আর সেই উঁচু-হয়ে-ওঠা দিগন্তে লাল-হয়ে-আসা আকাশের পটভূমিতে চার-চারটে ছুটন্ত বিন্দু আমাদের নজরে পড়ল।

'ডাঁশমশা? না?' রুক্ষভাবে চিৎকার করে চুবুক বৃদ্ধকে বললেন। তারপর লোকটার চুপসে-যাওয়া চেহারাটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে যোগ করে দিলেন, 'যা দেখছি তাতে বোঝা যাচ্ছে বুড়া নিজেই এট্টা ডাঁশমশা। চলি এস, বরিস!'

ছুটে নিচে নেমে চুবুক এক মুহূর্তের জন্যে থেমে একটা জঞ্জালের স্তূপে জ্বলন্ত দেশালাই-কাঠি একটা ছুড়ে দিলেন। জঞ্জালের স্তূপে পড়ে থাকা কাগজটায় আগুন ধরে উঠল, আর সেই আগুন ঘরের মেঝেয় ছড়ানো খড়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আর মিনিট-খানেকের মধ্যেই জঞ্জালে-ভরা ঘরখানা দাউদাউ করে জ্বলে উঠত, যদি না চুবুক হঠাৎ অন্যরকম মনস্থ করে পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিবিয়ে দিতেন। আমাকে টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে-এগোতে ত্রুটিস্বীকারের ভঙ্গিতে উনি বললেন:

'আগুন না-দেয়াই ভালো। এ-সব তো পরে আমাদেরই সম্পত্তি হবে।'

এর প্রায় মিনিট দশেক পরে আমরা যে-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলুম তার পাশ দিয়ে চারজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

চুবুক বলছিলেন, 'জমিদার-বাড়ি চলল ওরা। মেঝেয় চটের থলি পাতা দেখেই অনুমান করেছিলাম ব্যাটা বুড়া একা ও-বাড়িতে থাকে না। কেমন বারে বারে বুড়া জানলার ধারে যাচ্ছিল নজর করেছিলে তো? আমরা যখন নিচির ঘরে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছিলাম, বুড়া তখনই শ্বেতরক্ষীদের তলব করতে নোক পাঠিয়েছিল। চায়ির বেলায়ও গন্ডগোল করছিল। ব্র্যান্ডিটা দেখে কেমন সন্দেহ হতি নাগল — কে জানে ওর মধ্যি ইঁদুর-মারা বিষ মেশাল দিইছিল কিনা। যে-সব জমিদারের সব্বস্ব লুট হয়ে গ্যাচে, তারা যখন আমাদের অতিথ বলে জামাই-আদর করে তখন আমার কেমন জানি ভালো মনে হয় না। ওদের বিশ্বেস করি নে আমি। ওরা মুখি যা খুশি বলে ভান করতি পারে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ওরা যে আমার এক নম্বরের শত্তুর এতে সন্দেহ নেই।'

সে রাত্তিরটা আমরা একটা গাদা-করা খড়ের গোলায় কাটালুম। অনেক রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় এল, তারপর প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হল। কিন্তু আমরা এতে খুশিই হলুম। কুঁড়ের চাল দিয়ে জল না-পড়ায়, বাইরে খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে আমরা আরামে ঘুমোতে পারলুম। ভোরের আলো দেখা দিতেই চুবুক আমাকে ডেকে তুললেন।

বললেন, 'এখন আমাদের সাবধান হতি হবে। কিছুক্ষণ থেকি আমি জেগে বসি আচি। এখন আমি এট্টু ঘুমুব, তুমি জেগে বসি থাক। বলা তো যায় না, এ-পথে কেউ-না-কেউ এসে পড়তি পারে। তবে তোমারও ঘুম না এসি যায়, খেয়াল থাকে যেন।'

'না, চুবুক, আমি ঘুমোব না।'

কুঁড়ের বাইরে মাথা বের করে দেখলুম। পাহাড়ের নিচেই একটা ছোট নদী, তা থেকে ভাপ উঠছে। আগের দিন কোমর-সমান গভীর কাদায় ভরা একটা ডোবা পার হতে হয়েছিল আমাদের। রাত্রে গায়ের জল শুকিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কাদাটা শুকিয়ে সারা গায়ে চট্‌চটে মামড়ি পড়ে গিয়েছিল।

ভাবলুম, 'স্নান করলে বেশ হয়। নদী তো খুব কাছেই, এক ধাপ নিচে নামলেই হয়।'

আরও আধঘন্টা চুবুককে পাহারা দিয়ে বসে রইলুম। কিন্তু একছুটে নিচে নেমে গিয়ে নদীতে একটা ডুব দিয়ে আসার ইচ্ছেটা এদিকে মনের মধ্যে ক্রমশ প্রবল

হয়ে উঠল। নিজেকেই বোঝালুম, 'ধারেকাছে কেউ তো নেই। আর এত ভোরে উঠছেই বা কে? তাছাড়া কাছাকাছি কোনো রাস্তাঘাটের চিহ্নমাত্র দেখছি না। আরে, ঘুমের মধ্যে চুবুক ওই পাশ ফেরার আগেই আমি স্নান সেরে ফিরে আসব।'

প্রলোভনটা অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠল। ইচ্ছের তাড়নায় আমার সারা শরীর হয়ে উঠল অস্থির। অদরকারী কার্তুজের ক্রশবেল্‌ট্‌টা ছুড়ে ফেলে রেখে হঠাৎ একছুটে পাহাড় বেয়ে নেমে গেলুম।

যত কাছে মনে করেছিলুম, নদীটা মোটেই তত কাছে ছিল না। মনে হয়, নদীর ধারে পৌঁছতে আমার দশ মিনিট সময় লেগেছিল। বাড়ি থেকে পালানোর সময় ইশকুলের যে কালো টিউনিকটা পরে এসেছিলুম, সেটা ছেড়ে রাখলুম। তারপর একে একে চামড়ার ব্যাগ, বুটজোড়া আর ট্রাউজার্স খুলে রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। হঠাৎ ঠান্ডা জলে পড়ে যেন দম আটকে এল আমার। তারপর এদিক-ওদিক ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করলুম, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীরটা গরম হয়ে গেল। উহ্, কী আরামই যে বোধ করতে লাগলুম! নিঃশব্দে একবার মাঝনদী পর্যন্ত সাঁতরে গেলুম। মাঝনদীতে, ওই জায়গাটায়, একটা বালির চড়া আর সেই চড়ার ওপর একটা ঝোপ ছিল। ঝোপের গায়ে কী একটা যেন আটকে ছিল, হয় এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া, নয় তো একটা কামিজ। কাচা কাপড় কারো হাত থেকে হয়ত ফস্‌কে গিয়েছিল। ঝোপের ডালপালা সরিয়ে জিনিসটা কী দেখতে গেলুম, কিন্তু দেখেই আঁতকে উঠে পিছিয়ে এলুম। একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে ওখানে। তার ট্রাউজার্স বেধে ছিল একটা ডালে। পরনের সার্টটা গিয়েছিল ছিঁড়ে, আর তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, লোকটার পিঠে কালো-হয়ে-যাওয়া একটা মস্ত কাটা ঘা হাঁ হয়ে আছে। যেন ভূতে তাড়া করেছে এমনিভাবে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সাঁতার কেটে আমি পাড়ে ফিরে এলুম।

পড়ে উঠে জামা পরার সময় শিউরে উঠে মাঝনদীর সেই বালুচরের ওপর গজিয়ে-ওঠা ঝাঁপালো সবুজ ঝোপটার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিলুম। নদীর জলেরই ধাক্কায় আপনা থেকে, নাকি আমি ঝোপের ডালপালাগুলো ফাঁক করায় দৈবক্রমে, সেই মরা মানুষের দেহটা ঝোপ থেকে ছাড়া পেয়েছিল তা ঠিক জানি না। কিন্তু এখন দেখলুম মড়াটা স্রোতের টানে উলটে গিয়ে জলে ভেসে আমি যে-পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেই দিকেই আসছে।

তাড়াহুড়ো করে ট্রাউজার্সটা কোমরে টেনে তুলে টিউনিক পরতে শুরু করলুম। যত তাড়াতাড়ি পারি ওই জায়গা থেকে প্যালিয়ে যাওয়াই ছিল আমার ইচ্ছে। কিন্তু টিউনিকের কলারের ভেতর দিয়ে মাথাটা গলাতেই দেখতে পেলুম গুলি-খেয়ে-মরা সেই লোকটা প্রায় আমার পায়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে।

পাগলের মতো হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে আমি সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলুম, আর প্রায় জলে পড়ে যাবার উপক্রম করলুম। মরা লোকটিকে চিনতে পেরেছিলুম আমি। মৌমাছিপালকের রক্ষণাবেক্ষণে যে-আহত তিনজনকে আমরা পেছনে রেখে এসেছিলুম, ও ছিল তাদেরই একজন। ও আর কেউ নয়, ও ছিল আমাদের সেই বাচ্চা বেদে।

'হেই, খোকা!' পেছনে একটা চিৎকার শুনতে পেলুম। 'ইদিক এস।'

তিন জন লোক সোজা আমার দিকে আসছিল। তাদের মধ্যে দু-জনের হাতে ছিল রাইফেল। আর তখন আমার পালানোর রাস্তা বন্ধ। সামনে ছিল ওই লোকগুলো, পেছনে নদী।

'কে তুমি বটে?' লম্বা, কালো দাড়িওয়ালা একটা লোক প্রশ্ন করল।

চুপ করে রইলুম। বুঝতে পারছিলুম না লোকগুলো কিসের, লাল ফৌজের, না শ্বেতরক্ষী-দলের।

'আমি তোমারে কচ্চি, শুনেচ?' আমার হাতটা চেপে ধরে এবার আরও রুক্ষভাবে লোকটা কথা বলল।

'ওর সাথে কথা কয়ে লাভ কী,' আরেক জন বলল। 'ওরে বরং গেরামে লিয়ে চল। ওখেনে জেরা যা করবার ওরাই করবে'খন।'

দুটো ঘোড়ার গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল।

'ওহে, তোমার চাবুকখান দাও দিকি,' কালো দাড়ি একজন গাড়োয়ানকে চিৎকার করে বলল। লোকটা তার ঘোড়ার মাথার কাছটাতে ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'কিসের জন্যি?' অপর জন জিজ্ঞেস করল। 'বেত মেরে হবে কী। তার চেয়ে ওরে গেরামে লিয়ে চল, ওরাই ওর ব্যবস্থা করবে' খন।'

'আরে বেত মারার জন্যি না, ছোঁড়ার হাত দুটো বাঁধার জন্যি চাবুকখান চাইচি। ওর দিকি ঠাহর করি এট্টু তাকিয়ে দ্যাখো — কেটে পড়ার জন্যি ছটফট করতে নেগেচে যে ছোঁড়াটা।'

আমার কনুই দুটো পেছন দিকে মুচড়ে বাঁধা হল। তারপর ঠেলে গাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে।

'উঠে পড়!'

চকচকে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ঘোড়াগুলো দ্রুত পা চালিয়ে গ্রামের দিকে চলল। বেশ বড়সড় একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল দূরে। সবুজ পাহাড়ের ঢালুতে ঝলমল করছিল গ্রামের ঘরবাড়ির শাদা চিম্‌নিগুলো।

গাড়িতে যেতে-যেতে তখনও আমার মনে-মনে আশা যে হয়তো দেখব লোকগুলো আসলে লাল ফৌজের কোনো একটা বাহিনীর কয়েকজন পার্টিজান, আর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেই যথাস্থানে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছাড়া পেয়ে যাব।

গ্রাম থেকে অল্প দূরে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একজন শান্ত্রী আমাদের চ্যালেঞ্জ করল: 'কে যায়?'

'বন্ধু... গাঁয়ের মোড়ল,' কালো দাড়ি জবাব দিল।

'অ-অ-অ! তা গেছিলে কোথা?'

'আশপাশের গাঁ থেকে গাড়ি যোগাড় করতি।'

ঘোড়াগুলো ফের দ্রুত চলতে শুরু করল। আমার কিন্তু তখন শান্ত্রীটার পোশাক-আশাক কিংবা ওর মুখটা ঠাহর করে দেখার সময় ছিল না। কারণ, আমার সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়েছিল ওর কাঁধের দিকে। ওর কাঁধে আঁটা ছিল একটা চামড়ার ফিতে*।

নবম পরিচ্ছেদ

অত ভোরে রাস্তায় কোনো সেপাই দেখা যাচ্ছিল না — সম্ভবত তারা তখনও ঘুমোচ্ছিল।

গ্রামের গির্জের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকখানা ছোট এক্কাগাড়ি আর রেড ক্রশের চিহ্ন-আঁকা একখানা ভ্যান। আর একটা অস্থায়ী সামরিক রসুইখানার পাশে ঘুমঘুম-চোখে রাঁধুনিরা জ্বালানির কাঠ চেলা করছিল।

---

* ওই সময়ে একমাত্র শ্বেতরক্ষীরাই কাঁধে পট্টি আঁটত। — সম্পাঃ

'ওরে কি সদর দপ্তরে লিয়ে যাব?' গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল মোড়লকে।

'সে-ই ভালো। সায়েব অবিশ্যি এখনও ঘুমিয়ে আছেন। তবে এই পুঁচকে ছোঁড়াটার জন্যি ওনারে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। ওরে আপাতত হাজতে আটকে রাখি গিয়ে চল।'

ঘোড়াগাড়িটা ছোট্ট একটা ইটের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানলায় গরাদ-দেয়া ঘরটা ছিল নিচুমতো কিন্তু বহরে বড়। ঘরের দরজার দিকে আমায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। মোড়ল আমার পকেটগুলো তল্লাসি করল, তারপর চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে নিল। এরপর ঝনাত করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর চাবি পড়ল তালায়।

প্রথম কয়েক মিনিট কাটল নিছক আতঙ্কে। প্রায় শারীরিক যন্ত্রণার মতোই সে আতঙ্ক। তখন মনে হচ্ছিল, আমার মৃত্যু অবধারিত, দুনিয়ায় এমন কিছু নেই যা আমায় বাঁচাতে পারে। এরপর সূর্য আকাশে আরও ওপরে উঠবে। আর মোড়ল যার কথা বলছিল সেই সায়েব জেগে উঠে আমাকে ডেকে পাঠাবে, আর তারপর— জান খতম।

জানলার তাকে মাথাটা রেখে একটা বেঞ্চিতে বসলুম আমি। এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে, কিছু ভাবতে পারছিলুম না। কপালের দু-পাশে রগ দুটোয় রক্তস্রোত যেন হাতুড়ি পিটছিল, আর আমার মনের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র চিন্তাই ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির মতো বারে বারে চমকে-চমকে যাচ্ছিল: 'সব শেষ, সব শেষ, সব শেষ...' একই খাঁজের মধ্যে ক্লান্তিকরভাবে ঘুরে-ঘুরে বারবার ওই কথাগুলো বাজতে-বাজতে হঠাৎ যেন কোন্ অদৃশ্য আঙুলের টোকায় এক সময় আমার চৈতন্যের সূচিমুখ বিন্দুটি, মনে হল, পিছলে গিয়ে মস্তিষ্কের এক সক্রিয় কুণ্ডলীকে আশ্রয় করলে। আর তারপরই আমার চিন্তা পাগলের মতো সবেগে সামনের দিকে অজস্রধারায় ছুটে চলতে শুরু করল:

'সত্যিই আর কোনো পথ নেই কি? ইস্, এইভাবে বোকার মঁতো ধরা পড়া! হয়তো আমি পালাতে পারব? না, পালানো সম্ভব নয়। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে লাল ফৌজ এই পথেই আসছে আর ঠিক সময়মতো এসে হাজির হয়ে আমায় উদ্ধার করবে? কিন্তু যদি ওরা না-ই আসে? কিংবা যদি আসতে খুব বেশি দেরি করে ফেলে, আর তখন যদি সব শেষ হয়ে গিয়ে থাকে? হয়তো... নাঃ, কোনো আশা নেই, উদ্ধারের পথ নেই কোনো।'

আমার জানলার ওপাশ দিয়ে একপাল ভেড়া আর ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে গেল। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে ভেড়াগুলো স্বচ্ছন্দে চলে গেল হেঁটে, টুংটাং ঘণ্টির আওয়াজ করতে-করতে আর ব্যা-ব্যা ডাক ছাড়তে-ছাড়তে চলে গেল ছাগলের পাল। রাখাল গেল চাবুকের আওয়াজ করতে-করতে। একটা পুঁচকে বাছুর গোরুর বাঁটে মুখ দেবার হাস্যকর চেষ্টা করতে-করতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। শান্তিপূর্ণ গ্রামের এই ছবিটি আমার নিরুপায়, অসহায় অবস্থাটা নিজের কাছে যেন আরও বেশি তীব্র করে তুলল। আতঙ্কের স্থায়ী ভাবটার সঙ্গে এখন এসে মিশল একটা ক্রুদ্ধ অভিযোগের মনোভাব। এমন কি, কয়েক মুহূর্তের জন্যে এই ক্রোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল আতঙ্ককেও: ইস্, এমন একটা সকাল... সবাই বেঁচে-বর্তে আছে... গোরুভেড়া থেকে শুরু করে সব্বাই, কেবল আমাকেই মরতে হবে।

আর এ-সময়ে প্রায়ই যেমন হয় সেইরকম তালগোল-পাকানো রাশি রাশি চিন্তা আর হাস্যকর অবাস্তব সব পরিকল্পনার হট্টগোল থেকে ক্রমে বেরিয়ে এল একটিমাত্র আশ্চর্য সহজ-সরল আর স্পষ্ট চেতনা, একমাত্র যে-চেতনাই তখন রক্ষা পাবার স্বাভাবিক পথ বাত্‌লাতে ছিল সমর্থ।

আসলে লাল ফৌজের সৈনিক হিসেবে, প্রলেতারীয় যোদ্ধৃদলের একজন সিপাহি হিসেবে আমার পরিচয়ে আমি নিজেই এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে এই সত্যটা ভুলেই গিয়েছিলুম, এটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়েছে মাত্র, এর জন্যে প্রমাণ দরকার। আমি বরং ধরে নিয়েছিলুম যে আমার এই পরিচয়ের প্রমাণ দেয়া কিংবা একে অস্বীকার করা, অচেনা লোকের কাছে আমার মাথার কালো চুলকে শাদা বলে প্রমাণ করার চেষ্টার মতোই অচল, অকেজো।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' এই কুটো ধরে পার পাবার চেষ্টায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি নিজেকেই নিজে বললুম, 'এটা ঠিকই যে আমি লাল। কিন্তু এখানে আমিই একমাত্র এ-কথা জানি, কেমন তো? আর এমন কোনো কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ আমার মধ্যে আছে কি, যা দিয়ে ওরা এটা বুঝতে পারে?'

চিন্তাটা বারবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে শেষপর্যন্ত আমি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁছিলুম যে এরকম কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ আমার মধ্যে নেই। সঙ্গে আমার এমন কোনো কাগজপত্র ছিল না যা থেকে লাল ফৌজের লোক বলে আমার

পরিচয় পাওয়া যায়। এর আগে শ্বেতরক্ষী-বাহিনীর সামনে পড়ে যাওয়ার পর পালাতে গিয়ে তারার ব্যাজ-আঁটা আমার ছাইরঙের লোমের টুপিটা গিয়েছিল হারিয়ে। ফৌজী কোটটাও আমার ওই একই সময়ে খুলে ফেলে দিয়েছিলুম। ভাঙা রাইফেলটা পরে ফেলে এসেছিলুম জঙ্গলে, আর গুলির ক্রশ-বেল্ট্টা ওইদিন সকালেই নদীতে স্নান করতে যাওয়ার আগে কুঁড়েয় রেখে এসেছিলুম। আর তখন আমার গায়ে কালোরঙের যে-টিউনিকটা চড়ানো ছিল, তা ছিল নিতান্তই ইশকুলের ছাত্রের পোশাক। আমার বয়েসটাও সৈন্যদলে নাম লেখানোর উপযোগী ছিল না। তাহলে? আর বাকি রইল কি?

'ও, হ্যাঁ! আরও একটা জিনিস ছিল বটে। সেটা হল, টিউনিকের নিচে লুকোনো আমার ছোট্ট মাওজারটা। কিন্তু তা ছাড়া? বাকি রইল খালি, কী করে আমি ওই নদীটার ধারে এসে পৌঁছলুম তার কাহিনী। মাওজারটা ওই ঘরেরই উনোনের নিচে লুকিয়ে রাখা চলে। আর নদীর ধারে এসে পড়ার কাহিনী? — আরে, গপ্পো তো সব সময়েই একটা-না-একটা বানিয়ে বলা যায়।'

পাছে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় এই ভয়ে স্থির করলুম নিজের নাম, ধাম আর বয়েস ভাঁড়িয়ে ব্যাপারটাকে আর জটিল করে তুলব না। ঠিক করলুম, আমি আমিই থাকব, অর্থাৎ, আমি থাকব বরিস গোরিকভ, আর্জামাস টেক্নিক্যাল হাই স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র হয়েই। খালি এর সঙ্গে যোগ করে দেব যে আমি আমার মামার সঙ্গে (তাঁর আসল নামই বলব) খার্কভ যাচ্ছিলুম মামীমার কাছে কয়েকটা দিন কাটাতে (মামীমার ঠিকানা আমার জানা ছিল না, ঠিকানাটা আমার মামাই জানতেন)। আর খার্কভ যাওয়ার পথে মামার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, আর আমার কাছে পাশ বা অন্য দলিলপত্র না থাকায় (ওসব কাগজপত্র মামার কাছেই ছিল) আমাকে মাঝপথে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। আমি তখন ঠিক করলুম ট্রেনের লাইন-বরাবর হেঁটে পরের স্টেশনে গিয়ে ফের ট্রেন ধরব। কিন্তু ওইখান থেকে লালেদের এলাকা শেষ হয়ে শ্বেতরক্ষীদের এলাকা শুরু হয়েছিল। ওরা যদি জিজ্ঞেস করে পায়ে-হেঁটে আসার সময় আমি পেট চালালুম কী করে, তো বলব, গ্রামগুলো থেকে ভিক্ষে করে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থেকেছি। যদি ওরা বলে, আমার নিজের মামীমার ঠিকানাই যদি না জানি তো খার্কভ যাচ্ছিলুম আমি কোন্ ভরসায়। তাহলে বলব, ঠিকানা সংগ্রহের দপ্তর

থেকে ওঁর ঠিকানাটা যোগাড় করে নিতে পারব, এই আশায় যাচ্ছিলুম। জবাবে ওরা যদি বলে: 'আজকের দিনে ওসব ঠিকানা সংগ্রহের দপ্তর-টপ্তর পেতে কোন্ চুলোয়?' তাহলে অবাক হবার ভান করে বলতুম: 'কেন পেতুম না? আমাদের আর্জামাসের মতো ছোট মফস্বল শহরেও বলে একটা ঠিকানা সংগ্রহের দপ্তর আছে।' ওরা যদি জিজ্ঞেস করে: 'তোমার মামা লাল রাশিয়া থেকে শ্বেত খার্কভে ঢুকতে পারবেন আশা করলেন কী করে?' তাহলে বলব, মামা আমার এমন চালাক বুড়ো শেয়াল যে খার্কভ কোন ছার তিনি রুশদেশ থেকে ইউরোপেও ঢুকে পড়তে পারেন। কিন্তু আমি চালাক শেয়াল নই, কোনো কাজের নই আমি। এই পর্যন্ত বলে কান্নায় ভেঙে পড়ব। তবে বেশি কাঁদলে আবার সন্দেহ করবে। আমার অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় তা বোঝানোর জন্যে যতটা কান্না দরকার ততটাই কাঁদতে হবে। এই পর্যন্ত ভালোয়-ভালোয় কাটবে বলে মনে হচ্ছে। এর পরে নতুন কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

পিস্তলটা বের করে ঘরের মধ্যে উনোনের নিচে গুঁজে রাখতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালুম। মনে হল, ওরা যদি আমায় ছেড়েও দেয় তাহলেও পিস্তলটা নেবার জন্যে আর তো আমার পক্ষে এ-ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। এই ভেবে মত পরিবর্তন করে ঘরের পেছনের জানলার দিকে এগিয়ে গেলুম। ঘরটায় জানলা ছিল দুটো। একটা জানলার নিচেই ছিল সদর রাস্তা, আর আরেকটার নিচে একটা সরু গলি। এই গলিটার মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল একটা পায়ে-চলা পথ আর তার দুই ধারে সারি সারি বিছুটির ঘন ঝোপ। মেঝে থেকে তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে মাওজারটা আমি তাতে জড়িয়ে নিলুম। তারপর সেই ছোট্ট কাগজে পাকানো বাণ্ডিলটা বাইরের বিছুটির সবচেয়ে ঘন অংশটা তাক করে দিলুম ছুড়ে। ভাগ্যে তাড়াহুড়ো করে কাজটা করেছিলুম, কারণ এর পরমুহূর্তেই আমার ঘরের বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেলুম। আরও তিনজন কয়েদীকে ঘরটায় এনে পোরা হল। তাদের মধ্যে দু-জন ছিল চাষী। ওদের অপরাধ, ফৌজের দরকারে গাড়ি জবরদখল করার সময় ওরা ঘোড়া লুকিয়ে ফেলেছিল। কয়েদীদের মধ্যে তৃতীয় জন ছিল একটি ছেলে। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন কোনো দুর্বোধ্য কারণে ছেলেটি এক মেশিনগান-চালকের এক্কাগাড়ি থেকে একটা বাড়তি স্প্রিং চুরি করেছিল। ঘরে পোরবার আগেই ছেলেটিকে মারধর করা হয়েছিল, তবু ওর মুখে কাতরানির

আওয়াজ ছিল না। যেন কারো তাড়া খেয়ে ছুটে এসেছিল এমনিভাবে খালি জোরে-জোরে নিশ্বাস টানছিল ছেলেটি।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের রাস্তাঘাটে প্রাণ ফিরে আসছিল। সৈন্যরা রাস্তায় আনাগোনা শুরু করেছিল, শোনা যাচ্ছিল ঘোড়ার চিঁহি-ডাক, অস্থায়ী ফৌজী রসুইখানার সামনে থেকে বাসনকোসনের ঠংঠং শব্দ আসছিল। সিগন্যালারদেরও দেখা গেল, তারা রাস্তায় টেলিফোনের তার টাঙাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন বেশ ভারিক্কি চেহারার সার্জেণ্টের নেতৃত্বে এক স্কোয়াড সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে করতে চলে গেল, হয় কোথাও পাহারা দিতে আর নয়তো কোনো ঘাঁটিতে বদলি হিসেবে।

দরজায় ফের তালা খোলার শব্দ হল আর দরজার ফাঁকে দেখা গেল একজন সেপাইয়ের মাথা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই সে পকেট থেকে একটুকরো দোমড়ানো কাগজ বের করে তাতে চোখ বুলিয়ে হাঁক পাড়ল:

'এখেনে ভাল্দ্ কে আচ? বেরিয়ে এস।'

আর কারো নাম মনে করে আমি সঙ্গীদের দিকে তাকালুম। দেখি, ওরাও আমার দিকে তাকাচ্ছে। ফলে আমরা কেউই বেঞ্চি ছেড়ে উঠলুম না।

'ভাল্দ্... ভাল্দ্ কার নাম?'

'তাই তো, ইউরি ভাল্দ্ই তো বটে!' হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লুম আমি। মনে পড়ে গেল সেই চামড়ার ব্যাগের আস্তরের মধ্যে থেকে পাওয়া কাগজপত্রের কথা। গত কয়েক দিনের উত্তেজনায় ওগুলোর কথা বেমালুম ভুলেছিলুম তো আমি! আর আমার বাছাবাছির কিছু ছিল না। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে-টলতে দরজার দিকে এগোলুম।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল আমার কাছে। 'সত্যিই তো, আমার কাছে কাগজপত্রগুলো পেয়ে ওরা আমাকেই সেই... সেই মরা ছেলেটা বলে ধরে নিয়েছে। উঃ, ভাগ্যটা কী খারাপ আমার! এমন চমৎকার একটা সহজ-সরল পরিকল্পনা ফেঁদে ফেলেছিলুম, আর এখন কিনা ধাঁধায় পড়ে গেলুম। বলা যেতে পারে, পড়ে গেলুম অকূল সমুদ্রে। এখন আর বলাও চলে না যে ও-কাগজগুলো আমার নয়। কারণ, তাহলে সন্দেহ জাগবে যে কাগজগুলো আমার কাছে এল কী করে।' কাজেই তখন মামা-নামক এক ধাড়ি শেয়ালের সঙ্গে মামীমার কাছে বেড়াতে যাওয়ার গপ্পো, যা আমি চারিদিক অত আটঘাট বেঁধে তৈরি করেছিলুম, তা বিলকুল ভুলে যেতে

হল। মনে হল, আমাকে নতুন কিছু ভেবে বের করতে হবে। কিন্তু সেই নতুনটা কী? অতএব, আসল জায়গায় পেঁছে সঙ্গে সঙ্গে মাথা খাটিয়ে কোনো ফন্দি বের করা ছাড়া অন্য উপায় আর কিছু রইল না।

শরীরটাকে টানটান করে তুলে হাসবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কখনও কখনও হাসিখুশি ভাব দেখানোও কত কষ্টকর হয়ে ওঠে, ঠোঁটের কাঁপুনি থামিয়ে রবারের মতো মুখটা মচকে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটানো সময়ে সময়ে কী যন্ত্রণাদায়ক হয়!

সদরঘাঁটির সিঁড়ি বেয়ে ক্যাপ্টেনের পদের নির্দেশক কাঁধে-পট্টি-লাগানো পোশাক-পরা এক লম্বামতো বয়স্ক অফিসারকে নেমে আসতে দেখা গেল। তার পাশে-পাশে লাথি-খাওয়া কুকুরের ভঙ্গিতে হেঁটে আসছিল গাঁয়ের সেই মোড়ল লোকটা। আমার দিকে চোখ পড়তে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে দুই হাত ছড়িয়ে দিল মোড়ল, যেন বলতে চাইল, 'ভুলের জন্যে বিশেষ দুঃখিত'।

অফিসার মোড়লকে ধমক দিয়ে এই সময় কী যেন বলল। মোড়লও চাকরের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে, সেলাম ঠুকে দৌড়ে রাস্তা দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কিছুটা মজা করে কিন্তু বেশ বন্ধুত্বের সুরে ক্যাপ্টেন বলল, 'কী খবর, যুদ্ধবন্দী!'

'সুপ্রভাত, স্যার,' আমি জবাব দিলুম।

আমার সঙ্গের রক্ষীটিকে চলে যেতে বলে অফিসার এবার আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলে। তারপর সিগারেট বের করতে-করতে ধূর্ত হাসি হেসে বললে, 'এ-তল্লাটে কী করছিলে? রাজা আর দেশের জন্যে লড়াই করতে আসছিলে নাকি? কর্নেল কোরেন্‌কভকে লেখা চিঠিখানা পড়লুম। কিন্তু ওতে তো এখন তোমার কোনো কাজ হবে না। মাসখানেক আগে কর্নেল মারা পড়েছেন।'

মনে মনে বললুম, 'এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'এস, আমার ঘরে এস। তুমি কে তা মোড়লকে বল নি কেন? বন্ধুদের মধ্যে এসে পড়েই হাজত-বাস করতে হল, কী কান্ড!'

'লোকটা কোন্ দলের আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। দেখতে ঠিক চাষীর মতো লাগল — কাঁধে পট্টি ছিল না, কিছু না। ভেবেছিলুম লোকটা লালও তো হতে পারে। লোকের মুখে শুনেছি, লালগুলো নাকি এ-অঞ্চলে সর্বত্র ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে,' চেষ্টা করে কোনোরকমে কথাগুলো বললুম। অফিসারটিকে লোক

ভালো বলেই মনে হল, আর খুব একটা সজাগ দৃষ্টির লোক বলেও ঠাহর হল না। কারণ, তা হলে আমার অতিরিক্ত আত্মসচেতন ভাব দেখে লোকটি আন্দাজ করতে পারত সে আমাকে যা ভেবেছিল আমি সে-লোক ছিলুম না।

'তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল,' ক্যাপ্টেন বলল। 'সে অনেক আগেকার কথা, সেই উনিশ শো সাত সালের। ওজের্কিতে সামরিক কৌশলের মহড়ার সময় আলাপ হয়েছিল। তুমি তখন একদম বাচ্চা, তখনকার সঙ্গে মুখের সামান্য একটু মিল আছে এখন। আমাকে মনে নেই তোমার?'

'ঠিক মনে পড়ছে না,' ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে জবাব দিলুম। 'ওই মহড়ার কথা খুব অল্প-অল্প মনে আছে। আর তাছাড়া তখন ওখানে অনেক অফিসার ছিলেন তো।'

ক্যাপ্টেনের কথামতো আমার ওই 'মুখের সামান্য মিল'-টুকু যদি না থাকত আর আমার সম্বন্ধে লোকটির যদি সামান্যতম সন্দেহ হত, তাহলে ও আমাকে মাত্র দুটি সহজ প্রশ্ন করে ঘায়েল করে দিতে পারত — একটি আমার বাবা সম্বন্ধে, আরেকটি আমার ফৌজী ইশকুল সম্বন্ধে।

কিন্তু অফিসারটির মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। গ্রামের মোড়লের কাছে নিজের পরিচয় না দেয়ার পক্ষে আমি যে যুক্তি দেখিয়েছিলুম তা ওর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেছিল। তাছাড়া, ওই সময়টায় ফৌজী ইশকুলের শিক্ষার্থীরা দলে দলে দোন-অঞ্চলের দিকে আসছিল বটে।

'তোমার খুব খিদে পেয়েছে তো? পাখোমভ!' সামোভার-সামলাতে-ব্যস্ত একজন সেপাইকে চেঁচিয়ে ডেকে ক্যাপ্টেন বলল, 'খাবার কী আছে?'

'একটা বাচ্চা মুরগি আচে, হুজুর। সামোভারের জল এখুনি ফুটে উঠবে। পাদ্রির ইস্তিরি ময়দার তালটা বের করে নে' গ্যাচে, নির্মাকিগুলো এখুনি ভাজা হয়ে যাবে'খন।'

'দু-জনের জন্যে মাত্র একটা বাচ্চা মুরগি? উঁহুঁ, খুঁজে পেতে আরও কিছু বার কর্ দিকি।'

'খানিকটে শোরের চর্বি আর মুচমুচে মাংস-ভাজা আচে, হুজুর। কালকের ভারেনিকগুলো গরম করে দিতি পারি।'

'ভারেনিকগুলো দে আর মুরগিটাও দিস্, দে। জল্দি কর্, জল্দি!'

এই সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

'ক্যাপ্‌টেন শ্‌ভার্ৎস আপনাকে ফোনে ডাকছেন, স্যার!'

অফিসারটি শ্‌ভার্ৎসকে দৃঢ় অথচ শান্ত, গম্ভীর গলায় নির্দেশগুলো জানিয়ে দিল।

টেলিফোন নামিয়ে রাখার পর আরেক জন, মনে হল একজন অফিসারই, ক্যাপ্‌টেনকে জিজ্ঞেস করল:

'শ্‌ভার্ৎস কি বেগিচেভের বাহিনী সম্বন্ধে নতুন কোনো খবর রাখে?'

'না। গতকাল দুটো লাল কুস্তারেভের জমিদারবাড়িতে ঢুকেছিল। কিন্তু তাদের ধরা যায় নি। ও, হ্যাঁ, ভালো কথা, একটা রিপোর্ট লিখে ফ্যালো দেখি। তাতে জানাও যে শ্‌ভার্ৎসের গোয়েন্দা বিভাগের খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে শেবালভের বাহিনী কর্নেল জিখারেভের বাহিনীর ফাঁক দিয়ে গলে লালদের রক্ষাব্যূহের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে। তাদের বেগিচেভের সঙ্গে মেলাটা যে-কোনো প্রকারে ঠেকাতে হবে। আচ্ছা, খোকা, চলে এস ছোটহাজিরি খেয়ে নেয়া যাক। খেয়েদেয়ে এখন একটু বিশ্রাম কর, তারপর ভেবে দেখা যাক কোথায়, কীভাবে তোমাকে কাজ দেয়া যায়।'

খাওয়ার টেবিলে বসতে-না-বসতেই ক্যাপ্‌টেনের পরিচারক আমাদের সামনে একপাত্র ধোঁয়া-ওঠা ভারেনিক, একটা আস্ত মুরগি, আর শুয়োরের মাংসভাজা চিড়বিড়ে ফ্রাইং প্যান-সুদ্ধ বসিয়ে দিয়ে গেল। চেহারা দিয়ে বিচার করতে হলে মুরগিটাকে বাচ্চা না-বলে পুরোদস্তুর ধাড়ি মোরগ বললেই ভালো হত। যাই হোক, ভাগ্য শেষপর্যন্ত আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছে মনে ভেবে খুশি হয়ে কাঠের একটা চামচ তুলে নিতে যাব এমন সময় গেটের দিক থেকে একটা গোলমাল কানে এল। কারা যেন চেঁচিয়ে কথা বলছে আর গালাগাল দিচ্ছে।

পরিচারক ফিরে এসে বলল, 'আপনারে দরকার পড়েচে, হুজুর। রাইফেল লিয়ে এট্টা লাল নোক ধরা পড়েচে। জাবেলেন্নির মাঠে এক কুঁড়ের ভিত্‌রি পেয়েচে ওরে। মেশিনগানওলারা মাঠে ঘাস কাটতি গেছল। তা, ওরা নোকটারে কুঁড়ের ভিত্‌রি পেয়ে গেল। এট্টা রাইফেল আর এট্টা বোমা পাশে রেখি নোকটা ঘুমুচ্ছিল। তা, ওরা তার ঘাড়ের উপরি ঝাঁপ খেয়ে পড়ি পিছমোড়া করি বেঁধে এনেচে। লোকটারে কি ভিত্‌রি আনতে কব হুজুর?'

'নিয়ে আসতে বল্। তবে এখানে নয়। পাশের ঘরে লোকটাকে নিয়ে অপেক্ষা করতে বল্, ততক্ষণ আমি হাজরিটা খেয়ে নিই।'

আবার একবার কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ আর মাটিতে রাইফেলের কুঁদো ঠোকার শব্দ শোনা গেল।

'এইদিক এস!' পাশের ঘরে কার যেন চিৎকার শোনা গেল। 'এই বেঞ্চিটায় বোসো দিকিন। আরে, টুপিটে খোলো না বাপু — দেবদেবীর ছবি দেখতে পাও না?'

'হাত দুটোরে আগে খুলে দে' পরে খ্যাঁচাও দেখি!'

শুনে আমার আধখোলা হাঁ-মুখে ভারেনিক হিম হয়ে গেল যেন, আর থপ করে মুখ থেকে প্লেটে পড়ে গেল ওটা। কয়েদীর গলার স্বর চিনতে পেরেছিলুম। স্বরটা চুবুকের।

'কী, খুব গরম?' ক্যাপ্টেন বলল, 'আস্তে-আস্তে খাও।'

আমার তখনকার সেই যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজিত অবস্থার কথা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ক্যাপ্টেনের মনে পাছে সন্দেহ জেগে যায় এই ভয়ে শান্ত হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকতে হচ্ছিল। মুখের মধ্যে ভারেনিকগুলোকে ঠেকছিল যেন নরম কাদার তাল। বুজে-আসা গলা দিয়ে একেকটা টুকরোকে নামাতে তখন রীতিমতো গায়ের জোর খাটানোর দরকার পড়ছিল আমার। কিন্তু ক্যাপ্টেনের ধারণা হয়েছিল আমি খুবই ক্ষুধার্ত — ছোট হাজরির আগে আমি নিজেই তাকে ওকথা বলেছিলুম — কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে জোর করে গিলতে হচ্ছিল। আড়ষ্ট চোয়াল নাড়িয়ে খাবার চিবনোর আর কাঁটা দিয়ে যন্ত্রবৎ চকচকে মাংসর টুকরোগুলোকে গেঁথে তোলার সময় চুবুকের প্রতি অপরাধবোধ থেকে আমি যেন মরমে মরে যাচ্ছিলুম। সব দোষ তো আমারই! চুবুক আমায় সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও আমি আমার পাহারার কাজ ছেড়ে স্নান করতে গিয়েছিলুম। ওই দু-জন মেশিনগান-চালক যে ওঁকে ধরে ফেলেছে আর বন্দী করে এনেছে এ তো আমারই গাফিলতির ফল। আমার প্রিয়তম কমরেড, দুনিয়ায় যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই মানুষটি যে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়েছেন আর তাঁকে যে শত্রুর শিবিরে বন্দী করে আনা হয়েছে এ অপরাধ তো আমারই।

'কী ব্যাপার, খোকা, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ দেখছি,' বহুদূর থেকে যেন ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে এল। 'তোমার মুখে কাঁটায়-গেঁথা ভারেনিকটা ধরা, অথচ

তোমার চোখ বন্ধ। আচ্ছা, খাওয়া থাক, তুমি যাও, খড়ের ওপর শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে। পাখোমভ, ওকে জায়গাটা দেখিয়ে দে তো।'

উঠে পড়ে আমি দরজার দিকে এগোলুম। বন্দী হিসেবে চুবুক যে-ঘরে বসে ছিলেন, সেই টেলিগ্রাফ অপারেটরদের ঘরের ভেতর দিয়ে তখন আমার যাওয়ার কথা।

সে এক যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত।

তখন সমস্যা দাঁড়াল, অবাক হয়ে গিয়ে চোখমুখের কোনো ভঙ্গি কিংবা কথা বলে ওঠার মধ্যে দিয়ে চুবুক যাতে আমার পরিচয় ফাঁস করে না-ফেলেন সেটা ঠেকানো। ও'কে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে ও'কে বাঁচানোর জন্যে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব।

মাথা হে'ট করে বসেছিলেন চুবুক। যেতে-যেতে আমি কেশে উঠলুম। উনি মাথা তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ঢলে পড়লেন।

কিন্তু পিঠটা দেয়ালে ঠেকার আগেই নিজেকে সামলে নিলেন উনি। চমকে উঠে ঠোঁটের ডগায় যে-কথাগুলো এসে পড়েছিল ও'র তাও গিলে ফেললেন। এদিকে কাশি চাপার ভান করে আমি ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়ালুম। চুবুক যেভাবে তাঁর চোখ দুটো কু'চকে একবার আমার দিকে আরেকবার আমার পেছনের পরিচারকের দিকে তাকালেন, তাতে আমি বুঝলুম উনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি, ও'র ধারণা হয়েছে আমাকেও ওঁরই মতো সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল, মনে হল ওই দুটো চোখ যেন উৎসাহ দিয়ে বলতে চাইল: 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার পরিচয় ফাঁস করে দেব না।'

আমাদের চার চোখের এই নিঃশব্দ কথা-চালাচালি এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল যে তা আর কারো নজরেই পড়ল না। এলোমেলোভাবে পা চালিয়ে আমি ঘরটা থেকে উঠোনে বেরিয়ে এলুম।

বাড়ির সংলগ্ন একটা ছোট্ট চালাঘর দেখিয়ে পরিচারক বললে, 'এদিক আসেন। ঘরের ভিত্‌রি খড় আচে, এট্টা কম্বলও পাবেন। দোর দিয়ে ঘুমাবেন কিন্তু, নইলে রাজ্যির শোরগুলা গিয়ে ভিত্‌রি সে'ধোবে'খন।'

চামড়ায়-মোড়া একটা তাকিয়ায় মাথা গ‍ুঁজে চুপচাপ পড়ে রইল‍ুম আমি। 'কী করা যায় এখন? কী করে বাঁচাই চুব‍ুককে? ও'কে পালাতে সাহায্য করা যায় কীভাবে? আমার দোষেই ঝামেলাটা হল, কাজেই আমাকে এ-পাপ ক্ষালন করতে হবে। তার বদলে আমি করছি কী? না, বসে বসে ভারোনিক গিলছি, আর আমার জন্যেই কষ্ট পেতে হচ্ছে চুব‍ুককে। ছি-ছি!'

কিন্তু ভেবে-ভেবে উদ্ধারের কোনো ক‍ূলকিনারাই করতে পারল‍ুম না।

ক্রমশ মাথাটা তেতে উঠল, গাল দ‍ুটো উঠল গরম হয়ে, আর একটু-একটু করে সাংঘাতিক এক উত্তেজনা পেয়ে বসল আমাকে। 'আচ্ছা, আমি কি সততার পরিচয় দিচ্ছি? আমার কি গিয়ে খোলাখ‍ুলি ঘোষণা করা উচিত নয় যে আমিও একজন লাল, আমি চুব‍ুকের কমরেড? আমি চাই, ওঁর বরাতে যা ঘটবে আমারও তাই ঘটুক?' এই সহজ-সরল আর জমকালো চিন্তায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসল‍ুম আমি। ফিস্‌ফিস করে বলল‍ুম, 'নিশ্চয়, এই-ই দরকার। এতে অন্তত আমার মারাত্মক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে কিছ‍ুটা।' অনেকদিন আগে পড়া ফরাসী বিপ্লবের সময়কার একটা গল্প মনে পড়ল আমার। শর্তাধীনে ছাড়া-পাওয়া একটি ছেলে কীভাবে ফের ফিরে গিয়ে শত্র‍ুর অফিসারের হাতে ধরা দিল আর গ‍ুলিতে প্রাণ হারাল, তাই নিয়ে গল্পটি। নিজের সঙ্গে তর্ক জ‍ুড়ে দিল‍ুম আমি, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এখ‍ুনি উঠে পড়ে বাইরে গিয়ে ওদের সব কিছ‍ু বলব। ওদের সৈন্যরা আর ক্যাপ্‌টেন দেখ‍ুক লাল যোদ্ধারা কেমন করে প্রাণ দেয়। ওরা যখন আমাকে দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, আমি চে'চিয়ে বলব: 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' না-না ও-তো... ও-তো সবসময়ে সবাই বলে। আমি বরঞ্চ ওদের ম‍ুখে এই কথাগ‍ুলো ছ‍ুড়ে মারব: 'হতভাগা খ‍ুনী সব!' না, আমি বলব...'

তখন যে-সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিল‍ুম তার শোকাবহ গাম্ভীর্যের ভাবে আপ্ল‍ুত হয়ে আস্তে-আস্তে নিজেকে উত্তেজনার এমন একটা তুঙ্গে তুলল‍ুম যেখানে মান‍ুষ বাস্তবতার সমস্ত বোধ বর্জিত হয়ে অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকে।

'যাই, এখ‍ুনি উঠে বাইরে যাই,' বলতে-বলতে খড়ের বিছানায় উঠে বসল‍ুম আমি। 'কিন্তু বাইরে গিয়ে কী বলব?'

সেই মুহূর্তে আমার মনটা চোখ-ধাঁধানো, জমকালো সব ভাবনার ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে শুরু করল আর নানা ধরনের পাগলের মতো সব কথাবার্তা মাথার মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। আর মারা যাবার সময় বলার মতো উপযুক্ত কোনো কথা না-ভেবে কেন জানি না আমার তখন হঠাৎ মনে হল আর্জামাসের সেই বুড়ো বেদের কথা, যে বিয়ে উপলক্ষে সর্বত্র বাঁশি বাজিয়ে বেড়াত। এইরকম আরও বহু ঘটনার কথা মনে পড়ে যেতে লাগল আমার, যাদের সঙ্গে আমার তখনকার মনের অবস্থার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

'উঠে পড়া যাক...' নিজের মনে বললুম আমি। কিন্তু বিছানার খড় আর কম্বল আমার পা দুটো যেন কড়া সিমেণ্টমাটির মতো আঁকড়ে রইল।

আর তখন আমি বুঝতে পারলুম, কেন উঠতে পারছি না। আসলে আমি উঠতেই চাইছিলুম না। মৃত্যুর আগে শেষ ঘোষণা আর সেই বেদের কথা নিয়ে জল্পনাকল্পনা আসলে সেই চরম মুহূর্তটাকে ঠেকিয়ে রাখার অজুহাত ছাড়া কিছু ছিল না। তখন যে-কথাই আমি বলি না কেন আর নিজেকে যতই তাতিয়ে তুলি না কেন, আপনা থেকে ধরা দিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছেই যে আমার ছিল না, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা যখন নিজেই বুঝতে পারলুম তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ফের তাকিয়াটায় মাথা রেখে শুয়ে পড়লুম, আর সেই সুদূর ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত ছেলেটির সঙ্গে নিজের তুলনা করে, নিজের তুচ্ছতা উপলব্ধি করে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগলুম।

একটা ধাক্কায় কুঁড়েঘরের দেয়ালটা কেঁপে উঠল। মনে হল, ঘরের সংলগ্ন দেয়ালটার ওধারে, তার মানে ওই কুঁড়ের পাশে বাড়ির একটা ঘরে, কেউ শক্ত কিছু দিয়ে দেয়ালে ঘা দিয়েছে। তা সে শক্ত জিনিস রাইফেলের কুঁদোও হতো পারে, আবার বেঞ্চির একটা কোণও হওয়া বিচিত্র নয়। এরপর দেয়ালের ওধার থেকে লোকের গলার আওয়াজও পাওয়া গেল।

টিকটিকির মতো পিছলে দেয়ালের কাছে চলে গিয়ে দেয়ালের কাঠের তক্তার ফাঁকে কান পাতলুম। কান পাতার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কথার একটা অংশ শুনতে পেলুম, '...বাজে কথা বলে লাভ নেই, বুঝেছ তো? এতে তোমার নিজের আখেরই আরও খারাপ হচ্ছে। বল, তোমাদের বাহিনীতে কটা মেশিনগান আছে?'

এবার চুবুকের গলা কানে এল:

'অবস্থা এর চেয়ে আর কী খারাপ হবে, কাজেই আমি মিথ্যে ধানাই-পানাই করতি যাবই-বা কেন?'

'জানতে চাই, কটা মেশিনগান আছে?'

'তিনটা। দুটা ম্যাক্‌সিম আর একটা কোল্‌ট।'

ভাবলুম, 'চুবুক ইচ্ছে করেই ওকথা বলছেন। তা না হলে, আমাদের বাহিনীতে তো মাত্র একটা কোল্‌টই আছে।'

'আর কমিউনিস্ট কতজন?'

'সব্বাই কমিউনিস্ট।'

'সকলেই, বলতে চাও? তুমি কমিউনিস্ট?'

কোনো উত্তর নেই।

'তুমি কি কমিউনিস্ট? শুনতে পাচ্ছ না, তোমাকেই বলছি!'

'মিছে কথা খরচা করেন কেন? আমার পার্টি-সদস্যের কার্ড তো আপনারই হাতে।'

'চুপ! বুঝেছি, তুমি পাঁড়গুলোর মধ্যে একটা। দাঁড়াও। অফিসার কথা বলার সময় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে হয় জান না? তুমিই কি জমিদারবাড়ি ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?'

'আমার এক কমরেড। একজন ইহুদি।'

'নোংরা ইহুদি? তা, সে লোকটা কোথায়?'

'পালিয়ে গ্যাচে... আরেক দিকে।'

'কোন্‌ দিকে?'

'উল্‌টা দিকে।'

দুম করে আরেকটা আওয়াজ হল। তারপর একটা টুল সরানোর আওয়াজ। ফের শুরু হল গম্ভীর গলার সেই টেনে-টেনে কথা:

''উল্‌টা দিক' দেখাচ্ছি তোমায়। দাঁড়াও। এখুনি তোমায় আমি উল্‌টো দিকে পাঠাব।'

'না-মেরে আমারে একদম খতম করে দিতি হুকুম দেন না কেন,' চুবুকের গলা এবার আগের চেয়ে আস্তে শোনা গেল। 'আমাদের নোকে যদি আপনারে ধরত, স্যার,

তাইলে মুখে দু-এক ঘা ঘুসি কষিয়ে তারপর একবারে সাবাড় করি দিত। কিন্তু আপনে তো আমারে দেখি চাবুক হাঁকড়ে-হাঁকড়ে শরীলটে ফালা-ফালা করে দিলেন, ইদিকে নিজেদের আবার আপনারা বুদ্ধিজীবী কন।'

'ক্-কী? কী বললি?' খন্‌খনে গলায় চিল-চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্‌টেন।

'কলাম, মানুষিরে লিয়ে এতক্ষণ ধরে এত ঝামেলা করার আচে কী?'

তৃতীয় একটা গলা শোনা গেল। এর আগের বার যে টেলিফোন আসার খবর দিয়েছিল তারই গলা।

'আপনার ফোন এসেছে, স্যার!'

এরপর মিনিট দশেক দেয়ালের ওধারে সব চুপচাপ রইল। তারপর শোনা গেল বাড়ির সদর দরজার সিঁড়ি থেকে পরিচারক পাখোমভের ডাক।

'মুসাবেকভ! ইব্রাগিশ্‌কা!'

আর রাস্প্‌বেরির ঝোপ থেকে আল্‌সে গলার উত্তর শোনা গেল, 'হল কী?'

'বলি, আচ কোন্ চুলোয়? ক্যাপ্‌টেনের ঘোড়ায় জিন বাঁধো শিগ্‌গিরি।'

আর আমার ঘরের দেয়ালের ওপাশ থেকে ফের সেই গম্ভীর দরাজ গলা কানে এল:

'ভিক্তর ইলিচ, আমি সদর দপ্তরে চললুম। খুব সম্ভব আজ রাত্রেই ফিরব। শ্‌ভার্ৎসকে টেলিফোনে ডেকে বলুন অবিলম্বে জিখারেভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। জিখারেভ রিপোর্ট করেছে যে বেগিচেভ আর শেবালভের বাহিনী দুটো মিলে গেছে।'

'আর এর গতি কী করব?'

'এটার? গুলি করে দিতে পারেন। না, থাক। ভাবছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এটাকে আটকে রাখা ভালো। ওর সঙ্গে আরেকবার আলাপ করা যাবে। পাখোমভ্,' এবার গলা চড়িয়ে ক্যাপ্‌টেন বলতে লাগল, 'ঘোড়া তৈরি? আমার দুরবীনটা দে দেখি। আর, হ্যাঁ — ছেলেটা ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিস, বুঝলি? আমার জন্যে আর খানা রাখার দরকার নেই। আমি ওখানেই খেয়ে নেব'খন।'

দেয়ালে কাঠের ফাঁক দিয়ে দেখলুম আর্দালিদের কালো পাপাখা-টুপির কয়েক ঝলক। ধুলোর ওপর ঘোড়ার খুরের চাপা ধপ্‌ধপ শব্দ শোনা গেল। ওই একই

ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলুম, সকালে আমাকে যে কুঁড়ের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল চুবুককে এখন রক্ষীরা সেই কুঁড়েয় নিয়ে গেল।

ভাবলুম, 'ক্যাপ্টেনের ফিরতে রাত হবে। তার মানে, চুবুককে পরের বার জেরা করার জন্যে রাত্তিরে এখানে আনা হবে।'

আর তার মানে, অল্প একটু আশা। মৃদু নিশ্বাসের মতো এক ঝলক আশা আমার উত্তপ্ত মাথাটা ঠান্ডা করল।

ওখানে আমি ছিলুম স্বাধীন। কেউ আমাকে সন্দেহ করছিল না। তাছাড়া ছিলুম খোদ ক্যাপ্টেনের অতিথি। যেখানে খুশি আমি যেতে পারতুম। তাই ভাবলুম, যখন অন্ধকার হবে তখন যেন একটু পায়চারি করছি এমনি ভাব করে চুবুক যেখানে আছেন সেই কুঁড়েটার পেছন দিকের জানলার পাশ দিয়ে যে গলিটা চলে গেছে সেই গলিতে যাব। আর ঝোপ থেকে আমার মাওজারটা কুড়িয়ে নিয়ে জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ভেতরে চালান করে দেব। রাত্রে শান্ত্রীরা যখন চুবুককে নিতে আসবে তখন ঘরের সামনের গাড়িবারান্দায় বেরোনোর পর, শান্ত্রীরা চুবুককে নিরস্ত্র বলে জানে এই সুযোগটা নিয়ে, উনি ওদের দুটোকেই, ওরা রাইফেল ব্যবহার করতে পারার আগেই, দেবেন নিকেশ করে। তারপরের ব্যাপারটা খুব সোজা — রাত্তিরের অন্ধকারে যে-কোনো একদিকে গোটা দুই লাফে চুবুক নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবেন। আসল ব্যাপার হল, পিস্তলটা জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয়া। কিন্তু কাজটা কঠিন হওয়া তো উচিত নয়। কুঁড়েটা ইটের-তৈরি পাকা ঘর, জানলার গরাদগুলোও বেশ মোটা। কাজেই পাহারাদার শান্ত্রীটা, জানলা দিয়ে কয়েদী পালানোর ভয় নেই দেখে, সামনের দরজার সিঁড়ির ওপর বসে থেকে খালি দরজাটাই পাহারা দেয়। হয়তো কখনও-সখনও এক-আধবার সে ঘরটার পেছনের কোণের দিকে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখে, তারপর ফের স্বস্থানে ফিরে আসে।

ঘর থেকে বাইরে এলুম। মুখ থেকে চোখের জলের দাগ ধুয়ে ফেলতে একহাতা ঠান্ডা জল ঢাললুম মাথায়। পরিচারক আমাকে একমগ ক্ভাস এনে দিল, আর জানতে চাইল তখুনি আমার খানা লাগবে কিনা। খানা চাই না বলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাড়িটার দোরগোড়ায় সিঁড়ির ওপর বসে রইলুম।

যে কুঁড়েয় চুবুক ছিলেন তার সামনের গরাদ-দেয়া জানলাটা চওড়া রাস্তাটার ঠিক উল্টো দিক থেকে অন্ধকার একটা গর্তের মতো আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ভাবছিলুম, 'চুবুক যদি এই সময় আমায় দেখতে পান তো বেশ হয়। আমায় দেখলে উনি খুশি হবেন, আর এতে ওঁর পক্ষে বোঝারও সুবিধে হবে যে যেহেতু আমি ছাড়া-অবস্থায় ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি কাজেই আমি ওঁকে নিশ্চয় উদ্ধারের চেষ্টা করব। কিন্তু উনি যাতে উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখেন, সেটা করা যায় কীভাবে? ওঁকে এখান থেকে ডাকা কিংবা হাত নেড়ে ইসারা করা চলে না, কারণ তা করতে গেলে শান্ত্রীটা দেখতে পাবে। ঠিক, মাথায় একটা মতলব এসে গেছে! ছেলেবেলায় ইয়াশ্কা সুক্কারস্তেইনকে বাগানে কিংবা আমাদের সেই পুকুরে ডেকে নিয়ে যাওয়ার দরকার হলে যে কায়দা করতুম, এখনও তা-ই করা যাক-না কেন।'

ঘরে গিয়ে ছোট্ট একটা আয়না দেয়াল থেকে পেড়ে নিয়ে ফের আমি সিঁড়িতে ফিরে এলুম। প্রথমে কিছুক্ষণ আয়নাটা দিয়ে কপালের একটা ব্রণ আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলুম, তারপর, যেন ব্যাপারটা দৈবাতই ঘটে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে, আয়নাটার সাহায্যে এক ঝলক রোদ্দুর উলটোদিকের ঘরটার ছাদের ওপর ফেললুম। আর, বোঝা না-যায় এমন ভাবে, আস্তে-আস্তে আলোটা জানলার অন্ধকার গর্তের ওপর নামিয়ে আনলুম। দরজায়-বসা শান্ত্রীটা মোটে দেখতেই পেল না যে জোরালো এক ঝলক আলো ঘরের জানলার মধ্যে দিয়ে ঢুকে উলটোদিকের দেয়ালে গিয়ে পড়ছে। আয়নাটাকে ওই অবস্থানে রেখে এদিকে আমি হাত দিয়ে একবার আয়নাটা ঢেকে ফের হাতটা সরিয়ে নিলুম। এইভাবে পরপর কয়েকবার আয়নাটাকে হাত দিয়ে ঢাকলুম আর খুললুম।

অন্ধকার ঘরটায় হঠাৎ-হঠাৎ এক-এক ঝলক আলো চমকিয়ে দিয়ে বন্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এই ছিল আমার আশা। আর, দেখা গেল, সত্যিই আমার চেষ্টা সফল হয়েছে। এক সময় আমার ওই সন্ধানী আলোর মধ্যে জানলাটায় একজন লোকের আবছা ছায়া দেখা গেল। মনে হল, ঘরের মধ্যে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে জানলাটায়। আলোটা ঠিক কোত্থেকে আসছে চুবুক যাতে তা বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকবার একইভাবে আলো ফেললুম আর বন্ধ করলুম। তারপর আয়নাটা পাশে নামিয়ে রেখে আমি সিঁড়ির ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়ালুম, আর আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে হাতদুটোও ওপরে তুললুম। আমি জানতুম, ফৌজী সংকেতের ভাষা অনুযায়ী এর অর্থ ছিল: 'খেয়াল কর! তৈরি হও!'

ধুলোমাখা টুপি-মাথায়, পিঠে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো রাইফেল, কেতাদুরস্ত দু-জন কাদেত গাড়িবারান্দাটার নিচে এসে ক্যাপ্টেনের খোঁজ করল। খবর পেয়ে বাহিনীর কম্যান্ডারের সহকারী একজন নিচু পদের অফিসার বেরিয়ে এল। কাদেত দু-জন অফিসারটিকে স্যালুট করে ওর হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিল। বলল:

'কর্নেল জিখারেভের কাছ থেকে আসছি।'

আমি যেখানে বসেছিলুম সেখান থেকে টেলিফোনের ঝন্‌ঝনানি শুনতে পাচ্ছিলুম। সহকারী অফিসারটি টেলিফোনে রেজিমেণ্টাল সদরদপ্তরকে ডাকছিল বারবার। বিভিন্ন কোম্পানি থেকে বার্তাবহ হিসেবে জনা চারেক সিপাই স্থানীয় সদরঘাঁটির বাড়িটা থেকে ছুটে বেরিয়ে গ্রামের চারদিকের প্রান্তে দৌড়ে চলে গেল। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রামের প্রান্তের গেটগুলো দেয়া হল খুলে আর দশজন কালো চেহারার কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। যেরকম চটপট, দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয় দপ্তরের হুকুম সিপাইরা তামিল করল তা দেখে যেমন অবাক হলুম তেমনি আবার খারাপও লাগল আমার।

নানা ধরনের সিপাই নিয়ে তৈরি শ্বেতরক্ষীদের ওই বাহিনীর সুশৃঙ্খল কাদেত আর সুশিক্ষিত কসাকদের দেখে কেমন ঈর্ষা হচ্ছিল। আমাদের সাহসী কিন্তু বাক্যবাগীশ আর এদের চেয়ে অনেক কম শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিকদের থেকে এরা ছিল কত আলাদা।

সূর্য তখনও ছিল আকাশের অনেক ওপরে, কিন্তু আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলুম না। আমার চারপাশে যে-প্রস্তুতিপর্ব চলছিল আর টুকরো-টুকরো যে-সব কথাবার্তা কানে আসছিল, তা থেকে বুঝতে পেরেছিলুম যে ওদের বাহিনী ওইদিন রাত্রেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রাত্তির পর্যন্ত সময় কাটাতে আর আমার মতলব হাসিল করতে হলে চারিদিকটা ভালো করে একবার দেখে রাখা দরকার এই মনে করে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলুম। হাঁটতে-হাঁটতে একটা পুকুরের ধারে এসে হাজির হলুম আমি। দেখলুম, কসাকরা তাদের ঘোড়াগুলোকে পুকুরে স্নান করাচ্ছে। স্নান করতে-করতে ঘোড়াগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল আর পুকুরের নিচের নরম কাদায় খুর ঠুকে-ঠুকে আওয়াজ তুলছিল প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করে। ওদের নরম, মসৃণ আর চকচকে চামড়ার ওপর দিয়ে ঘোলাটে জল স্রোতের ধারার মতো গড়িয়ে ঝরে পড়ছিল।

পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা, খালি-গা, গলায় ক্রুশ-ঝোলানো একজন কসাক তরোয়াল চালিয়ে একটা মোটা ঝাড়ুর ঝোপ কুপিয়ে কাটছিল। তরোয়ালটা মাথার ওপর পেছন দিকে তোলার সময় কসাকটা ঠোঁট দুটো চেপে রাখছিল, আর সজোরে নিচে নামিয়ে কোপ মারার সময় দম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ বের করছিল মুখ দিয়ে — 'উস্‌জ্‌জা!' অনেকটা কসাই মাংস খোড়ার সময় যে-ধরনের অনির্দিষ্ট আওয়াজ করে মুখ থেকে, সেইরকম।

কাস্তের ঘায়ে ঘাস যেভাবে কাটা পড়ে, ধারালো তরোয়ালের কোপে অত মোটা ঝাড়ুগাছটাও সেইভাবে নুয়ে পড়ল। ওই সময়ে লোকটার শত্রুর একটা হাত যদি ওব তরোয়ালের ফলার নিচে পড়ত, তাহলে ও সেই হাতটাকে দেহ থেকে সোজা এককোপে আলাদা করে দিত। আর লাল ফৌজের কোনো লোকের মাথা সামনে পড়লে ও বোধহয় তার মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত করে দিত দু-ফাঁক।

কসাকের তরোয়াল যে কী কাণ্ড করতে পারে তা এর আগেই আমার দেখার সুযোগ ঘটেছিল। দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে-যেতে সরু একটা তরোয়ালের ফলা দিয়ে ওভাবে একঘায়ে একটা মানুষ মারা যেতে পারে। আঘাতের চিহ্ন দেখলে বরং মনে হবে, বহু মানুষ মারায় রীতিমতো হাত-পাকানো কোনো জল্লাদের ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব-করা কুড়ুলের ঘা বুঝি ওটা।

সান্ধ্যপ্রার্থনার জন্যে গির্জের ঘণ্টা বাজতে শুরু করলে কসাকটা তার তরোয়াল চালানো অভ্যেস করা বন্ধ করলে। গরম-হয়ে-ওঠা তরোয়ালের ফলাটা ছাইরঙের একটা পায়ের পট্টি দিয়ে মুছে খাপে পুরে ফেলে নিজের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলে। লোকটা তখনও হাঁপাচ্ছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে।

আলুখেতের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলার পথ ধরে এক সময়ে একটা ঝরনার ধারে এসে হাজির হলুম। পুরনো, শ্যাওলাঢাকা একটা কাঠের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা কন্‌কনে জল প্রাণের আনন্দে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে ঝরে পড়ছিল। পাশেই পচা কাঠের ক্রুশে-বসানো মরচে-ধরা একটা যিশুমূর্তি মলিন-হয়ে-আসা চোখে তাকিয়ে ছিল। মূর্তিটার নিচে কাঠের গায়ে ছুরি-দিয়ে খোদাই-করা কয়েকটা কথা তখন ঝাপসা হয়ে এসেছিল। কথাগুলো এই: 'দেবদেবীর যত মূর্তি আর সন্তরা সবই ধাপ্পা!'

অন্ধকার হয়ে আসছিল। ভাবছিল্ম, 'আর আধঘণ্টার মধ্যেই ইটের-তৈরি কুঁড়েটার দিকে যেতে পারব।' ঠিক করল্ম, গ্রামের একেবারে প্রান্তে চলে যাব, তারপর বড় রাস্তা পার হয়ে সেখান থেকে ছোট একটা পাশের পথ ধরে গরাদ-দেয়া সেই জানলাটার দিকে এগোব। আমার মাওজারটা ঝোপের মধ্যে কোথায় ফেলেছিল্ম তা আমার ঠিক-ঠিক জানা ছিল। ফেলবার পরে দেখেছিল্ম, শাদা কাগজের মোড়কটা বিছুটির ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প দেখা যাচ্ছিল। আমি পরিকল্পনা ছকে ফেলল্ম: রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে না-থেমেই মাওজারটা তুলে নেব, তারপর জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সেটা ভেতরে গলিয়ে দিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে সোজা হেঁটে চলে যাব।

রাস্তার মোড় ফিরতেই একটুকরো পোড়ো গো-চর জমিতে এসে পড়ল্ম। দেখল্ম, মাঠটায় একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। আর, তারপর, হঠাৎ ক্যাপ্টেনের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল্ম।

'এখানে কী মনে করে?' অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন বলল। 'তুমিও দেখতে এসেছ নাকি? ব্যাপারটা তোমার কাছে নতুন, তাই না?'

'আপনি এর মধ্যে ফিরে এসেছেন?' ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আমি জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল্ম। এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল্ম যে ওর কথার মানে ধরতে পারছিল্ম না।

হঠাৎ ডানদিকে উঁচুগলার একটা হুকুম শুনে দু-জনেই আমরা ফিরে তাকাল্ম। আর যা দেখল্ম তাতে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে আমি ক্যাপ্টেনের জামার হাতাটা চেপে ধরল্ম।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল্ম সেখান থেকে মাত্র বিশ হাতের মধ্যে পাঁচজন সেপাই রাইফেল কাত করে তুলে একজন লোকের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছিল। আর একটা পোড়ো মাটির কুঁড়ের দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটি। লোকটির মাথায় টুপি ছিল না, হাত দুটো ছিল পিছমোড়া করে বাঁধা। লোকটি একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। ফিসফিস করে বলল্ম, 'চুব্ক!'

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখল। তারপর যেন আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতেই আমার কাঁধের ওপর ওর হাতখানা রাখল। আর সারাক্ষণ আমার দিকে

দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, সেপাইদের রাইফেল কাঁধে-বাগিয়ে-ধরার হুকুমের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে, চুবুক হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ঘেন্নায় মাথাটা নাড়লেন একবার, তারপর থুথু ফেললেন।

আর তারপরই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল আগুনের ঝলকানিতে আর কানে এল প্রচণ্ড আওয়াজ, যেন কেউ আমার কানের কাছে প্রকাণ্ড একটা ঢাক বাজাল।

সজোরে টলে পড়লুম আমি। ক্যাপ্টেনের জামার হাতার একটা রঙিন ফিতে ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

'এর মানে কী, কাদেত?' কড়া স্বরে বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ছি-ছি, বুড়ি মেয়েমানুষের বেহদ্দ কোথাকার! সহ্য করার ক্ষমতা না থাকলে তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি।' তারপর আরেকটু নরম স্বরে বলল, 'না, এ-জিনিস তো চলবে না, ছোকরা। আর তুমি কিনা ফৌজে যোগ দিতে পালিয়ে এসেছ!'

'ছেলেটি এতে অভ্যস্ত নয় তো, তাই,' ফায়ারিং স্কোয়াডের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল। 'ওদিকে দেখবেন না। আমার কোম্পানিতেও এমনি একজন টেলিফোন অপারেটর ছিল, একজন কাদেত। প্রথম দিকে সে রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাকে ডাকাডাকি করত, কিন্তু এখন রীতিমতো ডানপিটে হয়ে উঠেছে ছোকরা।' তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, 'যাই বলুন, লোকটা কিন্তু বেপরোয়া। এমনভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল যেন শান্ত্রী হিসেবে পাহারা দিচ্ছে। আবার থুথুও ফেলল, দেখেছিলেন?'

একাদশ পরিচ্ছেদ

ওই রাত্রেই, সৈন্যদলের যাত্রা শুরু হবার পর প্রথম পাঁচ মিনিটের বিশ্রামের সময় আমি পালিয়ে গেলুম। সঙ্গে রাখলুম আমার মাওজারটা। আর ক্যাপ্টেনের গাড়িতে একটা বোমা পড়ে থাকতে দেখে সেটাও পকেটে ভরে নিয়েছিলুম।

সারাটা রাত্তির একবারও না-থেমে, বিপজ্জনক রাস্তাগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না-করে, অন্ধ একগুঁয়ের মতো সোজা উত্তরমুখো ছুটে চললুম আমি। বিপজ্জনক জায়গাগুলো, যেমন ঝোপঝাড়ের অন্ধকার, জনশূন্য পাহাড়ী খাদ, ছোট-ছোট পুল, এইসব এড়িয়ে চলার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলুম না। অথচ অন্য যে-কোনো সময়ে

ওই সব জায়গায় শত্রু ওত্ পেতে আছে সন্দেহ করে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পথ চলতুম। শেষ কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই তখন আমার কাছে ঠেকছিল না।

হোঁচট খেতে-খেতে এগিয়ে চললুম আমি। কোনো কিছু ভাবা, কিছু মনে করা, কোনো কিছু চাওয়ার চেষ্টা না-করে, কত তাড়াতাড়ি আমার বাহিনীর সঙ্গে মিলতে পারব একমাত্র এই আশা সম্বল করে পথ চলতে লাগলুম।

পরদিন দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটা ঝোপঝাড়ে-ঢাকা লুকনো খাদের মধ্যে ক্লোরোফর্ম-করা রুগীর মতো নিঃসাড়ে ঘুমোলুম আমি। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে ফের শুরু হল আমার পথচলা। শ্বেতরক্ষীদের সদর দপ্তরে যে-কথাবার্তা আমি শুনেছিলুম তা থেকে আমার বাহিনীকে কোথায় খুঁজতে হবে সে-সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মেছিল। জায়গাটা খুব কাছেই কোথাও হবে বলে আমার মনে হল। কিন্তু আমি পায়ে চলা-পথ আর গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে বেড়ালুম, তবু কেউ আমার পথ আটকে দাঁড়াল না।

পাখপাখালির অফুরন্ত কিচিরমিচির, ব্যাঙের ডাক আর মশার গুন্‌গুনানিতে রাতের বুক ধুকপুক করতে লাগল। গায়ে-গায়ে লেপ্‌টে-থাকা, তারার চুম্‌কি-বসানো সেই রাত একটা পেঁচার অশান্ত চিৎকারে, ঘন, সবুজ পাতার খস্‌খসানিতে আর বুনো অর্কিড আর হোগ্‌লা ফুলের গন্ধে মনে হচ্ছিল যেন জীবন্ত।

ক্রমে হতাশা টুঁটি টিপে ধরল আমার। কোথায় যাব আমি, কোথায় খুঁজব? এক সময় কচি ওক্ বনে-ছাওয়া একটা টিলার নিচে এসে পেঁছিলুম, আর ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে সুগন্ধ, বুনো ক্লোভার-ঘাসে ছাওয়া একটা ফাঁকা জায়গায় শুয়ে পড়লুম চুপচাপ। অনেকক্ষণ ওখানে শুয়ে পড়ে রইলুম, আর যতই আমি ঘটনাটার কথা ভাবতে লাগলুম ততই যে-মারাত্মক ভুলটা ঘটে গেছে সেটা আরও জোরালো, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের কাছে। রক্তচোষা কালো জোঁকের মতো আমার মনের মধ্যে চেপে বসতে লাগল সেই ব্যাপারটা। না-না, চুবুক আমার উদ্দেশ্যেই থুথু দিয়েছিলেন, আমার দিকেই, অফিসারের দিকে নয় মোটেই। কারণ, চুবুক আসল ব্যাপার কিছু বুঝতে পারেন নি; তিনি সেই কাদেত-ছোকরার কাগজপত্রের ব্যাপার কিছুই জানতেন না, আমিও তাঁকে ও-বিষয়ে কিছু বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। প্রথমে চুবুক মনে করেছিলেন, তাঁর মতো আমিও বুঝি বন্দী হয়েছি, কিন্তু পরে

যখন তিনি আমাকে সদর দপ্তরের বাইরে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখলেন, বিশেষ করে পরে যখন ক্যাপ্টেনকে আমার কাঁধে বন্ধুভাবে হাত দিতে দেখলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন আমি শ্বেতরক্ষীদের পক্ষে চলে গিয়েছি। শ্বেতরক্ষী অফিসারটি আমার জন্যে যেরকম উদ্বেগ প্রকাশ করছিল আর আমার দিকে যতখানি মনোযোগ দিচ্ছিল তাতে চুবুকের পক্ষে এছাড়া অন্য কোনো কিছু ভাবা সম্ভবই ছিল না, শেষ মুহূর্তে আমার দিকে ওঁর সেই থুথু ছোড়া যেন সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে আমার সারা দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আরও তীব্র, তিক্ত, মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই চিন্তাটা যে ওই ভুল ধারণা সংশোধনের তখন আর কোনো উপায় ছিল না, এমন আর কেউ ছিল না যার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে পারতুম আমি, আমার দোষ লাঘব করতে পারতুম। সবচেয়ে বড় কথা, চুবুক আর ছিলেন না, তাঁকে আর আমার দেখার কোনো সম্ভাবনা ছিল না কোনোদিন, সেদিন নয়, তারপরও নয়, আর কোনোদিনও নয়...

জঙ্গলের মধ্যে সেই কুঁড়েয় আমি যে মারাত্মক ভুল আচরণ করেছিলুম তার জন্যে আত্মধিক্কারে বুকটা যেন খানখান হয়ে যাচ্ছিল। অথচ কাছেপিঠে তখন এমন একজনও কেউ ছিল না যার কাছে মনের কথা উজাড় করে দিয়ে একটু হালকা হতে পারতুম। চারিদিকে ছিল শুধুই স্তব্ধতা। আর খালি পাখির কিচিরমিচির, আর ব্যাঙের ডাক।

নিজের ওপর ফুঁসে-ওঠা উন্মত্ত ক্রোধের সঙ্গে চারিদিকের সেই অভিশপ্ত বুক-খাঁখাঁ-করা নৈঃশব্দ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল আমার মধ্যে। আর, নিষ্ফল আক্রোশ, মনস্তাপ আর হতাশায় পাগল হয়ে গিয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠে পড়ে আমি পকেট থেকে বোমাটা টেনে বের করলুম। তারপর বোমার সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে দিয়ে ঘাসফুল, ঘন ক্লোভার-ঘাস আর শিশিরে-ভেজা ব্লু-বেল ফুলের মাঝখানে সেই সবুজ মাঠের ওপর সজোরে ছুড়ে মারলুম সেটা।

আমি একান্তভাবে যা চাইছিলুম তাই হল। কান-ফাটানো আওয়াজ করে ফাটল বোমাটা। আর তার উন্মত্ত প্রতিধ্বনি দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জঙ্গলের ধার ঘেঁষে এরপর হেঁটে চললুম আমি।

'হেই, কে যায় ওখেনে?' সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে একটা গলার আওয়াজ পেলুম।

চলতে চলতেই জবাব দিলুম, 'আমি।'

'আরে, আমিটা কে? না-কইলি এখখুনি গুলি চালাব।'

'চুলোয় যা, চালা গুলি, দেখি!' রেগে চেঁচিয়ে মাওজারটা টেনে বের করলুম।

'এই পাগলা, থাম্!' এবার আরেকটা, যেন একটু চেনা-চেনা, একটা গলা শোনা গেল। 'এই ভাস্কা, দাঁড়া দিকি এক মিনিট। ও যেন আমাদের বরিস বলে মনে লিচ্ছে?'

আমাদের বাহিনীরই একজন, খনি-মজুর মালিগিনের দিকে পিস্তল তাক করে গুলি করতে যাব এমন সময় নিজেকে সংযত করার মতো সুবুদ্ধি দেখা দিল আমার।

'আরে, কোন চুলো থেকে আসচ বাপু? আমাদের বাহিনী এই কাছেই আচে। বোমটা ফাটাল কে তাই দেখতে পাঠিয়েচে আমাদের। তুমিই বোম ফাটালে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'বলি, মতলবখানা কী? ইদিক-উদিক বোম ফাটাচ্চ কোন্ আক্কেলে? নড়াইয়ের জন্যি কি হাত নিশ্পিশ করচে? তা, মাতাল হও নি তো রে বাপু?'

একে একে সব কথা খুলে বললুম কমরেডদের। কী করে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, কী করে ধরা পড়ে মারা গেলেন আমাদের বীর চুবুক — সব কথা। কেবল একটা কথা লুকিয়েছিলুম — চুবুকের শেষ থুথু ছোড়ার কথাটা। আর গল্পটা বলার সময় শ্বেতরক্ষীদের স্থানীয় সদরঘাঁটিতে ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে যা যা শুনেছিলুম আর জিখারেভ আর শ্ভার্ৎসের বাহিনী দুটোকে আমাদের ধরার জন্যে যে-নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে সবকিছু রিপোর্ট করলুম।

'হুঁ,' যুদ্ধে অনবরত ব্যবহারের ফলে কালো-হয়ে-যাওয়া তরোয়ালখানার ওপর শরীরের ভর রেখে বললেন শেবালভ, 'চুবুক সম্বন্ধে যা কইলে, খুবই দুঃসংবাদ। লাল ফৌজের চমৎকার সেপাই ছিল চুবুক, আমাদের সেরা লড়ুয়ে, সেরা কমরেড আমাদের। খুব খারাপ খবর দিলে। তুমি মস্ত ভুল করেছিলে, ছেলে... মস্ত বড় ভুল।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের বললেন, 'তবে যে মারা গেচে সে তো আর ফিরবে

না। কী করা! তোমারে কিছু বলার নেই আমার — তুমি ইচ্ছে করি কারো ক্ষেতি কর নি, সে তো ঠিকই। অন্য যে-কারো বেলায় এমনধারা হতি পারত।'

'ঠিক। অন্য যে-কারো বেলায় এমনধারা হতি পারত,' কয়েকটা গলায় প্রতিধ্বনি উঠল।

'তবে তুমি জিখারেভের খবরটা যেমন বুদ্ধি খরচ করি যোগাড় করেচ আর চটপট তোমার কমরেডদের কাছে রিপোর্ট করার জন্যি ছুটে এয়েচ তার জন্যি এই আমার হাত বাড়িয়ে দিচ্চি তোমার দিকি আর তোমারে ধন্যবাদ জানাচ্চি!'

যাওয়ার পথে ডানদিকে তীব্র একটা বাঁক নিয়ে আর সারা রাত্তির লম্বা লম্বা প্যাড়ি দিয়ে আমরা জিখারেভ আমাদের জন্যে যে-ফাঁদ পেতে রেখেছিল তা এড়িয়ে, অনেক দূর দিয়ে এগিয়ে গেলুম। বড়-বড় গ্রামগুলো এড়িয়ে আমাদের যাওয়ার পথে শত্রুর যে-সব টহলদার প্যাট্রোল দল পড়ল সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করল শেবালভ ও বেগিচেভের মিলিত বাহিনী। আর এরও এক হপ্তা পরে, পোভোরিনো স্টেশন সেক্টরে লাল ফৌজের নিয়মিত যে-ইউনিটগুলো শত্রুর বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল আমাদের।

ওই সময়টায় আমি আমাদের বাহিনীর ঘোড়সওয়ার দলের একজন হয়ে দাঁড়ালুম। একদিন খোলা আকাশের নিচে যখন আমরা রাতের বিশ্রাম নিচ্ছিলুম তখন ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভ আমার কাছে এসে ওর শক্ত ছোট্ট হাতখানা দিয়ে আমার পিঠে একটা চাপড় দিল।

জিজ্ঞেস করল, 'বরিস, কখনও তুমি ঘোড়ার পিঠে চেপেচ?'

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলুম। 'একবার চড়েছি। গ্রামে আমার কাকার বাড়িতে থাকতে। তবে সে জিন ছাড়াই চড়েছিলুম। কিন্তু, কেন বল তো?'

'তা তুমি যদি জিন ছাড়াই ঘোড়ায় চেপে থাক, তাইলে জিন-চড়ানো ঘোড়ায় সহজেই চাপতে পারবে, তাই না? আমার ঘোড়সওয়ার দলে আসতে চাও নাকি, কও?'

ওর মতলব কী ঠাহর করতে না পেরে সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তাইলে ব্রদিউকভের জায়গায় তোমারে লিতে পারি। ওর ঘোড়াটাও তুমি পাবে।'

'কেন? গ্রিশার কী হল?'

'শেবালভ ওরে নাথিয়ে বের করে দিইচে,' একটা গালাগাল দিয়ে উঠে ফেদিয়া বলল। 'বাহিনী থেকেই পুরাপুরি বের করে দিইচে। সেই-যে পাদ্রির বাড়ি তল্লাসি হল না? তা সেই তল্লাসির সময় গ্রিশা চুপটি করে একটা আঙটি সরিয়ে আঙুলে পরেছিল। তারপর খুলে রাখতি ভুলে বসেছিল আর কি। অবিশ্যি মালটা ছিল শস্তাগণ্ডার, শান্তির সময় বাজারে ওর দাম রুবল পাঁচেকের বেশি হবে না। শেবালভের কাছে সাবুদ করা দায়। শেবালভ কিনা ওই পাদ্রিটার পক্ষ নিলে আর ওরে নাথিয়ে দিলে বের করে।'

ফেদিয়াকে আমার বলতে ইচ্ছে হল যে পাদ্রির পক্ষ নেয়ার মতো লোক শেবালভ মোটেই নন, সম্ভবত গ্রিশা আঙটিটা নিজে মেরে দেবার ফন্দি করছিল বলেই শেবালভ ওই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, আমার ওকথা ফেদিয়া খুব সম্ভব পছন্দ করবে না, ফলে আমাকে ওর সন্ধানী ঘোড়সওয়ার দলে নেয়ার বিষয়ে ওর মতটাই হয়তো বদলে ফেলবে। এদিকে অনেকদিন থেকেই আমি আবার ওই ঘোড়সওয়ার স্কাউটের দলে যোগ দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম কিনা। তাই সাতপাঁচ ভেবে চেপে গেলুম কথাটা।

শেবালভের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্যে দেখা করতে গেলুম আমরা।

এক নম্বর কোম্পানি থেকে আমাকে বদলি করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন শেবালভ। গোমড়ামুখো মালিগিনের কাছ থেকে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সমর্থন পাওয়া গেল।

তিনি বললেন, 'ওরে যেতি দাও, শেবালভ। অল্প বয়েস ওর, চটপটে ছোকরা আচে, ভালোই হবে। তাছাড়া চুবুক না-থাকায় ও এমনিতেই এট্টু একা পড়ে গ্যাচে, একা-একাই থাকে আজকাল। আগে ও চুবুকের সঙ্গে জুটি ছিল, এখন সঙ্গী নেই ওর।'

শেবালভ যেতে দিলেন আমাকে। তবে ফেদিয়ার দিকে রহস্যভরা চোখে তাকিয়ে যেন খানিক ঠাট্টা আর খানিক আন্তরিক সুরে বললেন:

'খেয়াল রাখিস ফেদিয়া... ছেলেটারে লন্ড করে দিলে ভালো হবে না কিন্তু। আরে, আমার দিকে অমন চোখ পাকিয়ে তাকালে কী হবে, আমি সোজা কথা বলচি কিন্তু, হাঁ!'

এর উত্তরে ফেদিয়া সকলের অজান্তে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ মটকাল। যেন বলতে চাইল: 'ঠিক আছে, তবে আমরাও জানি, বাছাধন, কত ধানে কত চাল হয়।'

এর মাসখানেকের মধ্যে দেখা গেল, খাঁটি ঘোড়সওয়ারের নিদর্শন হিসেবে ফেদিয়াকে আদর্শ করে আমি ওর অনুকরণ করতে শুরু করে দিয়েছি। পা দুটো রীতিমতো ফাঁক করে হাঁটতে শুরু করেছি, ঘোড়সওয়ারের গোড়ালির নাল পায়ে জড়িয়ে গিয়ে আর হাঁটায় বাধা পড়ছে না, আর বিশ্রামের সবটুকু সময় আমি বুরদিউকভের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া শাদা আর বাদামী ছোপ-দেয়া টিঙ্‌টিঙে বাজে জাতের ঘোড়াটার পেছনে লেগে রয়েছি।

ফেদিয়া সির্‌ত্‌সভের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যদিও স্বভাবে তার সঙ্গে চুবুকের ছিল অনেক পার্থক্য। সত্যি বলতে কী, চুবুকের থেকে ফেদিয়ার সঙ্গে থাকার সময় আমি আরও বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলুম। চুবুক আমার যত-না বন্ধু ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন বাপের মতো। কখনও কখনও, যখন তিনি ধমক দিতেন কিংবা কোনো কথা বলে লজ্জায় ফেলতেন, তখন রাগে গা জ্বলে গেলেও মুখে-মুখে জবাব দিতে সাহস হত না। কিন্তু ফেদিয়ার সঙ্গে দরকারমতো ঝগড়া করে পরে আবার ভাব করে নিলেই চলত। আমাদের দল যখন বেকায়দায় পড়ত তখনও ফেদিয়ার সঙ্গে থাকতে ভারি মজা লাগত। কেবল মুশকিল ছিল এই যে ফেদিয়া ছিল খামখেয়ালী। যখন কোনো একটা জিনিস ওর মাথায় ঢুকত তখন সেটা করে তবে ছাড়ত ও, কিছুতেই তখন ওকে ঠেকানো যেত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন শেবালভ ফেদিয়াকে হুকুম করলেন:

'ফেদিয়া, ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে ভিসেল্‌কি গাঁয়ে দল লিয়ে চলে যা। টৌলিফোঁয় দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট আমাদের কয়েচে, গাঁয়ে শ্বেতরক্ষীরা এখনও আচে কিনা এটু

খোঁজখবর করতি। জানিস তো, আমাদের কাছে এত তার নেই যে নাইন টেনে সরাসরি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তাই এখন কোম্প্রিরেভো হয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা লেনদেন করতি হচ্ছে। ওরা তাই ভাবচে, ভিসেল্‌কি গাঁয়ের মধ্যি দিয়ে নাইন টেনে ওরাই সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

কিন্তু ফেদিয়া গাঁইগুঁই করতে লাগল। সময়টা ছিল কাদা-প্যাচ্‌পেচে বর্ষা, তাছাড়া ভিসেল্‌কি গাঁটা ছিল আট কিলোমিটার দূরে। ওখানে যাওয়া মানে ছিল ভজভজে জলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালানো, আর সন্ধের আগে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

'ভিসেল্‌কিতে আবার কে থাকতি যাবে?' ফেদিয়া আপত্তি জানাল। 'শ্বেতরক্ষীরা ওখেনে থাকতি যাবে কোন্ দুঃখে? জনমনিষ্যির অগম্যি জায়গা এট্টা, চারদিকে ধূধূ করচে জলা। দরকার হলি শ্বেতরক্ষীরা তো বড় রাস্তাই ব্যাভার করতি পারে, তা ওরা মরতি সেই ধ্যাধেরড়ে ভিসেল্‌কি যেতি যাবে কেন?'

শেবালভ বাধা দিয়ে বললেন, 'তোর পরামশ্‌শ কেউ চায় না! যা বলচি কর্ দিকি!'

'ভ্যালা আমার ইয়ে রে! এরপর দেখচি কোন্‌দিন শয়তানের ডিম খুঁজে আনতি কবে? হুঃ, হুকুম দিলিই হল, হুকুম মানচে কে? পদাতিকদের পাঠাও গে' না। আমি বলে ঘোড়াগুলোর নাল বদলাব ঠিক করেচি, তাছাড়া ঘোড়াগুলোর গা বলে চুলকুনিতে ভরে গ্যাচে আর কম্পাউন্ডাররে কয়েচি ঘোড়ার গায়ে মালিশের জন্যি দু-বালতি মাখোর্‌কার মলম তৈরি করতি। তা, এতক্ষণে মলম তৈরি হয়ে গেল বলে। আর তুমি কিনা কচ্চ এখুনি ভিসেল্‌কি দৌড়ুতে!'

'ফিয়োদর,' ক্লান্ত গলায় শেবালভ বললেন, 'আমার হুকুমের লড়চড় হবার লয়, তা তুই দুনিয়াটা উলটে ফেললিও না।'

চারিদিকে কাদা ছিটতে-ছিটতে, খিস্তি করতে-করতে আর থুথু ছুড়তে-ছুড়তে ফেদিয়া ফিরে এসে চেঁচিয়ে আমাদের তৈরি হয়ে নিতে বলল।

কয়েকজন টেলিগ্রাফ অপারেটরের জন্যে ওই বৃষ্টি আর কাদা ভেঙে কেউই আমরা নিজেদের শরীরগুলোকে টেনে ভিসেল্‌কি নিয়ে যেতে রাজী ছিলুম না। দলের ছেলেরা শেবালভের ব্যাপান্ত করতে-করতে আর টেলিগ্রাফ অপারেটরদের আত্মসার আর কথার ঝুড়ি বলে গাল দিতে-দিতে ভিজে ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন

চড়িয়ে নেহাতই অনিচ্ছায়, গান না-ধরেই, ঘোড়ায় চেপে ছোট্ট গ্রামটার প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত কাদা ঘোড়ার খুরের নিচে প্যাচপ্যাচ করতে লাগল। পায়ে-পায়ে হাঁটার ভঙ্গিতে এগোতে পারছিলুম আমরা। ঘণ্টা-খানেক পর যখন অর্ধেকটা পথ মাত্র এসেছি, তখন জোর বৃষ্টি নামল। আমাদের কোটগুলো ভিজে একশা হয়ে গেল, টুপি থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক জায়গায় এসে দেখলুম রাস্তাটা ভাগ হয়ে দু-দিকে চলে গেছে। ডানদিকে আধমাইলটাক দূরে একটা বালুময় পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল পাঁচ-ছটা খামারবাড়ি নিয়ে ছোট্ট একটা গ্রাম। তেমাথার মোড়ে ফেদিয়া থামল, তারপর এক মুহূর্ত কী ভেবে রাশ টেনে ঘোড়ার মুখ ওই ডানদিকেই ঘোরাল। বলল:

'শরীলটে এট্টু গরম করে লিয়ে ফের রওনা দেব। এই বিষ্টিতে সিগরেট পেয্যন্ত খাওয়া যাচ্চে না।'

গোছগাছ-করা বড়সড় কুঁড়েটা বেশ উষ্ণ আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লাগল। সুস্বাদু কিছু একটা মাংস রান্নার গন্ধে ম-ম করছিল ঘরখানা। সম্ভবত হাঁস কিংবা শুয়োরের মাংস আগুনে ঝল্‌সানোর গন্ধ।

নাক টেনে গন্ধ শুঁকে ফেদিয়া ফিস্‌ফিস করে বলল: 'ওহো, দেখচি খামারটায় এখনও খাবারদাবার আচে বেশ।'

গৃহস্বামীও দেখা গেল বেশ অতিথিপরায়ণ লোক। একটি শক্তসমর্থ-গোছের মেয়ের দিকে সে চোখ টিপতে মেয়েটি ফেদিয়ার দিকে একবার রসালো দৃষ্টি হেনে টেবিলের ওপর একে একে কাঠের-তৈরি বড়-বড় বাটি, কাঠের চামচ এইসব বসিয়ে দিয়ে বসবার একটা টুল টেবিলের কাছে টেনে দিল। তারপর একটু মুচকি হেসে বলল:

'দাঁড়িয়ে আচেন কী করতে? বসেন না।'

ফেদিয়া গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ভিসেল্‌কি এখেন থেকে বেশি দূর নাকি?'

'গরমিকালে যখন পথঘাট শুকনা থাকে তখন আমরা বিলির মধ্যি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওখেনে চলে যাই,' বৃদ্ধ উত্তর দিল। 'ওই দিক দিয়ে পথ বেশি দূর লয়, ধরেন কেনে এখেন থেকে বড়জোর আধাঘণ্টার হাঁটাপথ। কিন্তু এখন ওদিক দিয়ে

যেতি পারবেন না, বিলির কাদায় পা বসে যাবে'খন। তবে যে রাস্তা ধরে আপনারা ঘোড়া চালিয়ে এলেন, ওই রাস্তায় গেলি, অনুমান করি, ঘণ্টা দুই সময় নাগবে। রাস্তাটা অবিশ্যি খারাপ, ঝরনার ওপর দিয়ে যে ছোট পোলটা গ্যাচে তার কাছে বিশেষ করে। ঘোড়ায় চড়ে ঠিক আচে, তবে গাড়ির পক্ষে খুবই খারাপ। আমার জামাই তো ফিরল ওই গেরাম থেকি, আসতে গিয়ে গাড়ির ঘোড়া জোতার একখান ডাণ্ডা ভেঙে লিয়ে এসেচে।'

'কবে ফিরল গেরাম থেকি? আজই?'

'হ্যাঁ, আজ সকালে।'

'আচ্ছা, শোনেচেন কিছু, ও-গেরামে শ্বেতরক্ষী-টক্ষী আচে কিনা?'

'না, শুনি নি তো কিছু।'

'দেখেচ, শেবালভটা কেমন ধাপ্পা দেছে আমাদের? কেমন, বলেছিলাম কি না যে ও-গাঁয়ে শ্বেতরক্ষীই নেই। আজ সকালে যদি ওখেনে শ্বেতরক্ষী না-থেকে থাকে তো ধরে লাও এখনও নেই। সারাদিন মুষলধারে বিষ্টি হতি নেগেচে আজ — কার এমন মাথাব্যথা ধরেচে নিজেরে ওখেনে টেনে লিয়ে যেতে। তাইলে, ভাইসব, এস তোমাদের কোটগুলো ছাড়ো। এই বিষ্টিতে ওখেনে যায় কোন্ সম্বন্ধী। ঘোড়ার ঠ্যাঙ্ খোঁড়া করে ঝুটমুট লাভ কী আমাদের? কও?'

আমি বললুম, 'কাজটা কী ঠিক হচ্ছে, ফেদিয়া? শেবালভ কী বলবেন?'

'শেবালভ কী কবে তার আমি থোড়াই কেয়ার করি!' ভারি, কাদামাখা ওভারকোটটা খুলে ছুড়ে ফেলতে-ফেলতে ফেদিয়া জবাব দিল। 'আচ্ছা, বলব'খন, আমরা ওখেনে গেছিলাম কিন্তু কোনো শ্বেতরক্ষীর টিকি দেখি নাই।'

খাবারের সঙ্গে বাড়িতে-চোলাই-করা এক বোতল ভোদ্‌কা দেয়া হল আমাদের। ফেদিয়া সকলের পেয়ালায় পেয়ালায় মদ ঢেলে দিল। আমার দিকেও এক পেয়ালা বাড়িয়ে দিল ও।

'দুনিয়ার প্রলেতারিয়েত আর বিপ্লবের নাম করি খাচ্চি,' পাত্রে পাত্রে ঠেকিয়ে ও বলল। 'ভগমানের কাচে প্রার্থনা করি, আমাদের জীবনভর বিপ্লব চলতে থাকুক। শ্বেতরক্ষীগুলোর যোগান যেন কখনও না ফুরায়! অন্ততপক্ষে একজন-না-একজনেরে কাটার জন্যি যেন থাকে ওরা। আহা, ভগমান ওদের মঙ্গল করুন, নইলি জীবনটা যে দুনিয়ায় একঘেয়ে হয়ে যাবে। আচ্ছা, চলুক তাইলে!'

আমার পেয়ালা আমি অন্য সকলের মতো উ'চু করে ধরি নি দেখে ফেদিয়া শিস দিয়ে উঠল।

'হুই-হুই! বরিস, তুমি কী বলতি চাও এর আগি মুখে ঠেকাও নি এ-জিনিস? এঃ, তুমি দেখচি ঘোড়সওয়ারই লও, একদম কন্যে-মাছি।'

'কে বললে আমি আগে কখনও মুখে ঠেকাই নি?' লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে উঠে স্রেফ মিথ্যে কথা বলে বসলুম। তারপর এক ঢোকে গিলে ফেললুম মদটা।

কটুস্বাদ মদটা গলায় আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। তাড়াতাড়ি ঘাড় হে'ট করে এক টুকরো নুনে-জারানো নরম শশা মুখে পুরে দিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা খুশির ভাব পেয়ে বসল আমাকে। ফেদিয়া ওর অ্যাকর্ডিয়নটা চামড়ার খাপ থেকে বের করে নিয়ে এমন একটা সুর বাজাতে লাগল যাতে মনটা ভারি হাল্‌কা হয়ে যায়। এরপর আমরা আরও কয়েকবার মদ খেলুম — একবার, শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত লাল ফৌজের লোকদের স্বাস্থ্য পান করতে, তারপর প্রাণঘাতী যুদ্ধে আমাদের বাহন আর আমাদের সুখদুঃখের সাথী ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্যকামনা করে, তারপর ফের, আমাদের তরোয়ালগুলো শ্বেতরক্ষীদের মাথা কাটতে-কাটতে যেন কখনও ভোঁতা হয়ে না যায় তা-ই কামনা করে — তারপর আরও একবার, তারপর আবার, এইভাবে বহুবার সেই সন্ধেয় আমরা মদ্যপান করলুম।

সবচেয়ে বেশি মদ খেয়েও সবচেয়ে বেশি ধাতস্থ হয়ে রইল ফেদিয়া নিজে। ঘামে চট্‌চটে ওর কপালের ওপর গোছা-গোছা কালো চুল সে'টে রইল। প্রাণপণে অ্যাকর্ডিয়নটার বেলো টিপতে-টিপতে মিষ্টি-রিন্‌রিনে গলায় একসময় গান ধরল ফেদিয়া:

দোনের ওপার ছেয়ে গ্যাচে লাহো লাল...

আর গলা মেলানোর চেষ্টা না-করেই আমরা সমস্বরে ধুয়ো ধরলুম:

হেই, হেই, এল ফুর্তির দিনকাল...

আবার শুরু করল ফেদিয়া। মাথাটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে ভিজে-ভিজে চোখ দুটো কুঁচকে নিয়ে ফের:

লালের সঙ্গী ছুরি ক্ষুরধার,
বিশ্বাসী তরোয়াল...

আর বড়াই করে বেপরোয়া আবৃত্তির ঢঙে আমরা বারবার তার প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলুম:

আর, বিশ্বাসী তরোয়াল...

তারপর সবাই একসঙ্গে ফের ধুয়ো ধরলুম:

ও-ওক! জীবনটা জুয়ো এক কোপেকের মাল...
ভাই, বিলকুল পয়মাল...

শেষ করার আগে ফেদিয়া এত উঁচুতে গলা চড়াল যে আমাদের সকলের গলা, এমন কি তার অ্যাকর্ডিয়নের বাজনাও, তার নিচে চাপা পড়ে গেল। গান শেষ হলে প্রথমটায় মাথা নিচু করে ও কিছুক্ষণ বসে রইল, যেন গভীর চিন্তায় ডুবে রইল কিছুটা সময়, তারপর যেন ঘাড়ে মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে সজোরে মাথা ঝাড়া দিল ও, টেবিলে এক ঘুষি কষাল, আর পেয়ালার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল আবার।

সেদিন অনেক রাত্রে আমরা ফিরতি-পথে রওনা দিলুম। জিনের রেকাবে পা ঢোকাতেই প্রথমটা অসুবিধে হচ্ছিল আমার, তারপর শেষপর্যন্ত যখন ঘোড়ায় চেপে বসতে পারলুম তখন মনে হতে লাগল আমি যেন ঘোড়ার জিনে না বসে দোলনায় চেপেছি। মাথাটা ঘুরছিল, বেশ অসুস্থ বোধ করছিলুম আমি। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঘোড়াগুলোও খুব ছটফট করছিল, আর খালি খালি সার ভেঙে এগিয়ে সামনের ঘোড়ার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল। আমি জিনের ওপর বসে অনেকক্ষণ টলতে-টলতে চললুম, তারপর এক সময় ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর মড়ার মত নেতিয়ে পড়লুম।

পরের দিন সকালে বিশ্রীরকমের খোয়ারি চলল আমার। আগের রাত্রের কাণ্ডকারখানা মনে করে দারুণ বিরক্তি নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, ঘোড়াটার মুখে-বাঁধা থলিতে এক দানাও জই নেই। আগের রাত্রে আস্তানায় ফেরার পর সব জইয়ের দানা আমি কাদায় ছড়িয়ে ফেলেছিলুম। ওদিকে ফেদিয়ার ঘোড়ার

জাবনার গামলাটা দেখলুম দানায় টইটম্বুর। একটা বালতি এনে গামলা থেকে এক বালতি জই উঠিয়ে নিলুম আমি। দোরগোড়ায় আমার সঙ্গে দুই স্কাউটের দেখা হয়ে গেল। দু-জনেরই দেখলুম কেমন রাগী-রাগী ভাব, চোখগুলো ঝাপ্‌সা, ঢুলো-ঢুলো।

দেখে চমকে উঠলুম। ভাবলুম, 'এই সেরেছে, আমাকেও অমনি দেখাচ্ছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে গেলুম স্নান করতে। স্নান সারলুম অনেকক্ষণ ধরে, বেশ ভালো করে। পরে রাস্তায় বেরোলুম। দেখলুম, সারা রাত ধরে মাটিতে বরফ জমেছে। বছরের প্রথম হালকা তুষারকণাগুলো তখন ক্ষতবিক্ষত রাস্তার শক্ত মাটিতে এসে পড়ছিল। হঠাৎ দেখি পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে জোর কদমে ফেদিয়া আসছে:

'ব্যাপার কী তোর, ব্যাটা বেজম্মা, আমার জই সরিয়েচিস যে বড়? ফের যদি তোরে একাজ করতে দেখি তো এক ঘুষিতে দাঁত ক-খানা ফেলে দেব। এই আমি কয়ে রাখলাম, হ্যাঁ!'

'তাহলে ইটের বদলে পাটকেলটি খাবি, এই আর কী,' আমিও পাল্‌টা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললুম। 'নিজের ঘোড়াটাকে পেট ফাটিয়ে মারতে চাস না কী? দানা ভাগ করার সময় নিজের ঘোড়ার জন্যে যে বড় এক পালি বেশি নিয়ে নিয়েছিস?'

'বেশ করেচি, তাতে তোর কী,' বলে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে এলোমেলো চাবুক হাঁকড়াতে-হাঁকড়াতে ফেদিয়া আমার ঘাড়ে এসে পড়ার যোগাড় করল।

সাংঘাতিক খেপে গিয়ে আমি বললুম, 'ফেদিয়া, চাবুক সরা, নইলে ভালো হবে না বলছি!' ফেদিয়ার পাগলামির ধরনধারণ আমার জানা ছিল। বললুম, 'যদি তোর ওই চাবুক আমার গায়ে একবার ঠেকাস, তাহলে আমার এই তরোয়ালের পিঠ দিয়ে এক বাড়ি মারব তোর মাথায় বলে দিলুম কিন্তু!'

'উঁ? মারবি নাকি? মার দিকি?'

একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল ফেদিয়া। আমাদের ওই কথাবার্তা সেদিন শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াত জানি না, যদি-না ঠিক সেই সময়ে শেবালভকে রাস্তার মোড় ঘুরে আমাদের দিকে আসতে দেখা যেত।

শেবালভকে ফেদিয়া দুচক্ষে দেখতে পারত না। তাছাড়া একটু ভয়ও করত ওঁকে। তাই শেবালভকে আসতে দেখে হাতের কাছে একটা ছোট্ট কুকুরকে পেয়ে

তারই গায়ে সজোরে এক ঘা বেত কষিয়ে আর আমার দিকে বাগানো ঘুষি দেখিয়ে সরে পড়ল।

'শোন,' শেবালভ আমায় ডাকলেন।

ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম আমি।

'বলি, ব্যাপারখানা কী কও তো — কখনও দেখি তুমি আর ফেদিয়া গলায় গলায় বন্ধু, আবার কখনও দেখি দু-জনার দা-কুমড়া সম্পক্ক? এস, আমার ঘরে এস।'

ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শেবালভ বসলেন। তারপর আমায় প্রশ্ন করলেন:

'ফেদিয়ার সঙ্গে তুমিও ভিসেল্‌কি গেছিলে নাকি?'

থতমত খেয়ে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ।'

'মিছে কথা কোয়ো না! কেউই তোমরা ওখেনে যাও নি। সারাক্ষণ কোথায় ছিলে কাল?'

'কেন, ভিসেল্‌কিতে,' একগুঁয়ের মতো একই জবাব দিলুম আমি।

ফেদিয়ার ওপর রাগ হলেও ওকে অপদস্থ করতে আমার মন সরল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে বললেন শেবালভ, 'ঠিক আচে। শুনে সুখী হলাম। আমার সন্দেহ ছিল, বুয়েচ, কিন্তু ফেদিয়ারে শুধোতে মন চাইছিল না। ও যে মিছে কইবে, এ তো জানা কথা। ওর চেলাচামুণ্ডোগুলোও তেমনি বাছা মাল সব। দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট থেকে ওরা খেপে গিয়ে আমারে টেলিফোঁ করি কইল, 'তোমার কথায় বিশ্বেস করে টেলিফোঁর অপারেটরদের ভিসেল্‌কিতে পাঠানো হইচিল, তা তারা অতি অল্পের জন্যি প্রাণে বেঁচে গিয়েচে।' তা, আমি আর কী করি কলাম: 'তাইলে আমরা খোঁজখবর করার পরে শ্বেতরক্ষীরা এইছিল নিচ্চয়।' কিন্তু মনে মনে কলাম: 'ফেদিয়ার মতিগতি শয়তানেই বোঝে। কোথায় গিয়ে কী করেচে ও কে জানে। কাল তো অনেক রাতে ফিরল, আর তখন গা দিয়ে ভকভক করি ভোদ্‌কার গন্ধ বেরুচ্ছিল'।'

উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন শেবালভ। কুয়াশায়-ভেজা জানলার শার্সির গায়ে নিজের কপালটা চেপে ধরে বেশ কয়েক মিনিট ওইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওই স্কাউটগুলো আমারে যন্ত্রণা দিয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে। ছোঁড়াগুলা কিন্তু দারুণ সাহসী, তাও ঠিক। তবু নোক বেয়াড়া, ভীষণ বেয়াড়া। আর ওই ফেদিয়াটাও — আইনকানুনের একদম ধার ধারে না। ওরে তাড়াতে হবেই একদিন, তবে ওর বদলি নোক পাচ্ছি নে এই এট্টু মুশকিল হচ্ছে।'

বন্ধুভাবে আমার দিকে তাকালেন শেবালভ। ওঁর ফ্যাকাশে কোঁচকানো ভুরু সমান হয়ে গেল। যে কটা চোখ দুটো সব সময়ে কুঁচকে রেখে একটা কড়া-মেজাজী ভাব ফোটানোর চেষ্টা করতেন শেবালভ তা থেকে কেমন একটা সহৃদয় লাজুক হাসি বিকীর্ণ হতে লাগল। আন্তরিকতার সঙ্গে উনি বললেন:

'এই বাহিনী চালানো যে কী কঠিন কম্মো তা তোমার কোনো ধারণাই নেই! এর তুলনায় জুতো-সেলাই তো খেলার সামিল। সারা রাত্তির ম্যাপগুলার ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকি, দেখে-দেখে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করি। কখনও-কখনও মাথা-টাথা গুলিয়ে যায় আমার। নেকাপড়া একদম করি নি তো, তা সাধারণ শিক্ষেই কও আর ফৌজী শিক্ষেই কও। ওদিকে শ্বেতরক্ষীগুলা সহজে কি হার মানার পাত্তর! ওদের ক্যাপ্টেনগুলার তো কোনো অসুবিধে নেই, ওরা নেকাপড়া জানে আর যুদ্ধুর কাজ করচে জীবনভর। ইদিকে আমার পক্ষে ফৌজী হুকুমনামা পড়ে ওঠাই কষ্টকর। এর উপরি আবার যে-সব সোনার চাঁদ ছেলে আচে আমার দলে। শ্বেতরক্ষীদের দলে নিয়মশৃঙ্খলা বলে জিনিস আচে একটা। মুখের কথা খসাল আর কাজটা হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের নোকজনিরা এখনও যুদ্ধু করতি পোক্ত হয়ে ওঠে নি, আমারে নিজেই সব কিছু দেখেশুনে লিতে হয়, সামলে-সুমলে চলতি হয়। আমাদের অন্য ইউনিটগুলায় অন্তত একজন করি কমিশার আচে। তা আমি অনেকদিন ধরি আমাদের জন্যি একজন কমিশার চাচ্ছি। কিন্তু ওরা আমারে কচে: 'আপাতত কমিশার ছাড়াই কাজ চালিয়ে লাও, তুমি তো নিজেই কমিউনিস্ট আচ, না কী'। কিন্তু কেমনধারা কমিউনিস্ট আমি?' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরিয়ে নিয়ে ফের বললেন, 'আমি লিচ্চয় কমিউনিস্ট, তবে কিনা আমার শিক্ষেদীক্ষে নেই তো।'

এমন সময়ে বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা নিয়ে সুখারেভ আর চেক গাল্দা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

'হামি সিপাহি দিচ্চি টহলদার দলের লিয়ে, সিপাহি দিচ্চি মেশিনগান চালানোর লিয়ে, অর সিপাহি দিচ্চি খানা পাকানোর লিয়ে — অর উ একটা ভি সিপাহি দিবে না,' বঁড়শির মতো বাঁকানো নাক নেড়ে-নেড়ে লাল-হয়ে-ওঠা ক্রুদ্ধ সুখারেভের দিকে আঙুল দেখিয়ে গাল্‌দা চটেমটে বললেন।

এবার সুখারেভের পালা। তিনিও চিৎকার করে বললেন, 'ও রান্নাঘরে নোক দেচে আলুর খোসা ছাড়ানোর জন্যি, আর আমি-যে দুপুর পয্যন্ত পাহারায় নোক বসিয়ে রেখেছিলাম! ও মেশিনগান-চালিয়েদের নোক দেছিল, আর আমার দু-নম্বর প্লেটুনের ছেলেরা যে আজ সকাল থিকে গোলন্দাজদের পুল মেরামতির কাজে সাহায্য করচে। এখন যোগাযোগের কাজের জন্যি আমি আর নোক দিতি পারব না, সাফ কথা। ও নোক দিক না।'

শুনতে-শুনতে শেবালভের ফ্যাকাশে ভুরু উঠল কুঁচকে, কটা চোখ দুটো গেল সরু হয়ে। ওঁর রোদে-জলে পোড়া, ছাইরঙা মুখখানা থেকে সেই লাজুক-লাজুক ভালোমানুষী হাসিটুকু নিঃশেষে মুছে গেল।

তরোয়ালের ওপর ভর দিয়ে কড়া-গলায় শেবালভ বললেন:

'সুখারেভ, বাজে কথা কোয়ো না, একদম না! তোমার ছেলেপিলেরা একটা রাত্তির ঘুমোয় নি বলি তুমি কী সোরগোলটা তুলেচ, দেখেচ একবার? তুমি ভালো করেই জান, আমি গাল্‌দার দলবলেরে আজ ছুটি দিয়েচি ওদেরে একটা বিশেষ কাজে পাঠাব বলি। ও দলবল লিয়ে আজ রাত্তিরে নোভোসেলোভোয় চলেচে।'

এর উত্তরে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না-করেই সুখারেভ তিন প্রস্থ লম্বা খিস্তি করলেন। আর রুশ আর চেক ভাষার খিচুড়ি বানিয়ে বাঁকানো নাক নেড়ে গাল্‌দাও ফের হাত ছুড়তে শুরু করলেন। আমি ঘরের বাইরে চলে এলুম।

শেবালভের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হওয়ায় লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলুম আমি। মনে মনে ভাবলুম, 'শেবালভ আমাদের কম্যান্ডার। উনি রাত জাগছেন, কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে ওঁকে। আর আমরা... এইভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি! ভিসেল্‌কিতে আমাদের টহল দেয়া সম্পর্কে ওঁর কাছে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল কেন? টেলিফোন অপারেটরদের সঙ্গে আমাদের এই ব্যবহার বেইমানি ছাড়া কী? ভাগ্য ভালো যে কেউ মারা পড়ে নি। কিন্তু তা

সত্ত্বেও কাজটা ঠিক হয় নি, বিপ্লবের প্রতি আর নিজের কমরেডদের প্রতি এটা আর যাই হোক ন্যায়বিচারের নমুনা নয়।'

নিজের কাছে আমার কাজের কৈফিয়ত আমি এইভাবে দিতে চেষ্টা করলুম যে হাজার হোক ফেদিয়া আমার দলের নেতা আর সে-ই এই রাস্তা বদল করে অন্যদিকে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই যুক্তিটা যে কত বাজে তা বুঝতে পারলুম। নিজের ওপর খেপে উঠে ভাবলুম, 'তা যেন হল। কিন্তু তোমার নেতা কি তোমায় ভোদ্‌কাও খেতে হুকুম করেছিল? কিংবা কম্যান্ডারের কাছে মিথ্যে কথা বলার হুকুম?'

ফেদিয়ার এলোমেলো ঝাঁকড়া-চুলো মাথাটা ওর ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি দিল। ও ডাকল, 'বরিস!'

যেন শুনতে পাই নি এমনি ভাব করে আমি এগিয়ে চললুম।

'বরিস!' ওর গলায় যেন মিটমাট করে নেয়ার সুর বাজল। 'আহ্‌, অত রাগ করিস নি। আয় না, কটা পিঠে আচে খাবি। আয়, চলে আয়। তোরে কিছু বলার আচে।' ওর ঘরে যেতে ফ্রাইং প্যানটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'লে, পেট পুরে খেয়ে লে!' তারপর আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে বলল, 'তোরে শেবালভ ডেকেছিল কী জন্যি রে?'

রাখঢাক না-করে সরাসরি বললুম, 'আমায় উনি ভিসেল্‌কির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বললেন, তোমরা ওখেনে কেউ যাওই নি।'

'তা, তুই কি কলি?'

ফেদিয়া অস্বস্তিতে এমন ছটফট করছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল, পিঠেগুলোর সঙ্গে ও-ও যেন গরম ফ্রাইং প্যানের ওপর চড়ে বসে আছে।

'আমি আবার কী বলব? সব কথা আমার বলে দেয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তোর জন্যে কষ্ট হল আমার. তোর মতো এমন নচ্ছার বোকা আর আছে নাকি!'

'থাম, থাম, বেশি পাকামো করতি হবে না,' ফেদিয়া আবার ওর খ্যাপাটে ভঙ্গিতে কথা শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল। বোধহয় ভাবল, আমার পেট থেকে সব কথা ওর তখনও বের করে নেয়া হয় নি। তাই ফের কাছে ঘেঁষে এসে দুশ্চিন্তা আর কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল: 'তা, আর কী কী কলি রে?'

'বললেন, তোমরা সব ভিতু আর স্বার্থপর,' এবার ফেদিয়ার মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলতে শুরু করলুম। 'আরও বললেন, 'ভিসেল্‌কিতে নাক গলাতে সাহস পায় নি ওরা। আর তাই আর কোথাও, খুব সম্ভব কোনো খাদের মধ্যে বসে, সময়টা কাটিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে। কিছুদিন ধরেই দেখছি স্কাউটরা ভয় পেয়ে কাজের দায়িত্ব নিতে চাইছে না।' এইসব বললেন আর কি।'

'যাঃ, তুই বেমালুম বানিয়ে কচ্চিস!' ফেদিয়া খেপে উঠে বলল। 'শেবালভ ই সব কিছুই কয় নি।'

বিদ্বেষভরা গলায় বললুম, 'তবে নিজেই যা না, জিজ্ঞেস করে আয়। উনি বলেছেন, 'এই ধরনের কাজে এবার থেকে আমি পদাতিকদের পাঠাব। স্কাউটগুলো আর কোনো কম্মের নয়, খালি লোকের ভাঁড়ার থেকে ননীর বোতল চুরি করতে ওস্তাদ'।'

'বিলকুল মিথ্যে কচ্চিস!' ফের গলা চড়াল ফেদিয়া। 'শেবালভ লিচ্চয় কয়েচে: 'ওই পিপুফিশুগুলা হাতের বাইরে চলে যাচ্চে। ওদের শাসন করা দরকার,' কিন্তু স্কাউটগুলা ভয় পেয়ে কাজে ফাঁকি দিচ্চে একথা কখনই কয় নি।'

'তা বলেন নি তো বলেন নি, হয়েছে কী,' ফেদিয়াকে খেপিয়ে মনে মনে বেশ খুশি হয়েই মিথ্যে স্বীকার করে নিলুম। 'উনি যদি না-ও বলে থাকেন, তাহলেও অমন করা ঠিক হয়েছে মনে করিস নাকি? আমাদের কমরেডরা আমাদের ওপর নির্ভর করেছিল, আর আমরা গিয়ে ওই অপকম্মোটি করে এলুম। তোর জন্যে এক রেজিমেণ্ট ফৌজ ধোঁকা খেয়েছে। এখন লোকে আমাদের কী চোখে দেখবে শুনি? সবাই বলবে, 'ওরা নিজেদের স্বার্থ দেখতে ব্যস্ত, ওদের বিশ্বাস করা চলে না। ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট করল যে ভিসেল্‌কিতে শ্বেতরক্ষী নেই, আর তারপর সিগ্‌ন্যালাররা যখন ওখানে তার পাততে গেল তখন গুলির মুখে পড়ল ওরা'।'

'কে গুলি করল ওদের?' অবাক হয়ে ফেদিয়া বলল।

'শ্বেতরক্ষীরাই নিশ্চয়। তাছাড়া আবার কে?'

মনে হল, ফেদিয়া যেন নিবে গেল। ওর জন্যেই টেলিফোনের লোকেরা যে ঝামেলায় পড়েছিল তা ও মোটেই জানত না। কথাটা ওর মনে আঘাত দিল। একটাও কথা না বলে ও পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর ওর বেসুরো অ্যাকর্ডিয়নটা বের করে 'মাঞ্চুরিয়ার টিলায়' নামের একটা পুরনো, বিষণ্ণ ওয়াল্‌ত্‌স নাচের সুর বাজাতে বসল ফেদিয়া। বুঝলুম, এটা ওর মেজাজ বিগ্‌ড়নোর লক্ষণ।

হঠাৎ দেখা গেল বাজনা বন্ধ করে রুপোলী কাজ-করা ককেশীয় তরোয়ালখানা কোমরে বেঁধে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল ফেদিয়া।

মিনিট পনেরো পরে ফের ওকে আমাদের জানলার ওধারে দেখা গেল।

জানলার শার্সির ওপাশ থেকেই কর্কশ গলায় হুকুম করল ফেদিয়া, 'ঘোড়া তৈরি করে লাও, জলদি!'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'শেবালভের কাছে। যাও, যাও, পা লাড়াও!'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের স্কাউটের দলটা অল্প তুষার-পড়া রাস্তা মাড়িয়ে দুল্‌কি চালে আমাদের বাহিনীর শেষ পাহারার লাইন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আগের দিন রাস্তার যে-তেমাথায় এসে আমরা ডান দিকে মোড় নিয়ে খামারবাড়িটায় গিয়েছিলুম, সেইখানে এসে ফেদিয়া থামল। তারপর দলের সবচেয়ে চট্‌পটে দু-জন ঘোড়সওয়ারকে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে তাদের কী যেন বলল। কথা বলার সময় মাঝে মাঝেই আঙুল দিয়ে ভিসেল্‌কির রাস্তার দিকে দেখাতে লাগল ফেদিয়া। তারপর ওর নির্দেশ ভালোমতো ওদের মাথায় ঢোকানোর উদ্দেশ্যে দু-জনকে আলাদা আলাদাভাবে খিস্তি করে ও ফের আমাদের কাছে ফিরে এল, আর আমাদের হুকুম করল আগের দিনের খামারটার দিকে এগোতে। খামারে পৌঁছে, পাছে গৃহকর্তা আমাদের আগের দিনের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কোনো কথার সূত্রপাত করে সেজন্যে তার সঙ্গে আর কোনো কথা না-বলে ফেদিয়া সরাসরি তার কাছে জানতে চাইল বিলের মধ্যে দিয়ে ভিসেল্‌কি যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথটা কোন্ দিকে।

লোকটা বলল, 'ও পথে যেতি পারবেন না, কমরেড। যেতে গেলি ঘোড়া পাঁকে আর জলে ডুবে যাবে কিন্তু। সারা হপ্তাটা ধরে বিষ্টি হচ্চে। বলে হেঁটিই যেতে পারবেন না, তো ঘোড়া দূরে থাক।'

ইতিমধ্যে যে-দুজন স্কাউটকে ফেদিয়া মোড় থেকে ভিসেল্‌কির দিকে পাঠিয়েছিল তারা ফিরে এসে খবর দিল যে ভিসেল্‌কি শ্বেতরক্ষীরা দখল করে আছে আর গ্রামে ঢোকার মুখে শ্বেতরক্ষীরা রাস্তাও বন্ধ করে রেখেছে। খামারের মালিকের যুক্তিতর্কে ভ্রূক্ষেপ না-করে ফেদিয়া তাকেও হুকুম করল তৈরি হয়ে নিতে। লোকটা আগের চেয়ে আরও আন্তরিকভাবে দিব্যি গেলে বলতে লাগল যে বিলটা পার হওয়া সত্যিই অসম্ভব। ওর স্ত্রী তো কাঁদতে শুরু করল। খামারীর রাঙা রাঙা গালওয়ালা মেয়েটি, যে আগের দিন রাত্রে ফেদিয়ার সঙ্গে রসালো দৃষ্টি-বিনিময় করেছিল সে, কাদামাখা বুট দিয়ে ওদের ঘরের মেঝে নোংরা করায় ফট করে ফেদিয়াকে গালাগাল দিল। কিন্তু ফেদিয়া তখন কারো কোনো কথা কানে নিচ্ছে না, নিজের ইচ্ছেটাই জারি করতে ব্যস্ত। আমি জানতে চাইলুম ওর পরিকল্পনাটা ঠিক কী, কিন্তু উত্তর দেয়ার নাম করে ও আমায় গালাগাল পর্যন্ত দিল না, কেবল আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখ মচকে ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

অল্পক্ষণের মধ্যে খামার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। খামারের মালিক আমাদের সামনে ফেদিয়ার পাশে-পাশে হাড়জিরজিরে একটা ঘোড়ায় চেপে চলতে লাগল। এক সময় মোড় নিয়ে একটা বার্চ বনের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা আর ঘোড়ার খুরের চাপে জলকাদায়-ভরা শ্যাওলা থেকে কাদাগোলা জল ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে উঠতে লাগল। ক্রমশই খারাপ হতে লাগল রাস্তাটা। ঘোড়ার খুর ক্রমশ বেশি-বেশি বসে যেতে শুরু করল কাদায়। দেখা গেল, জলজমা মাঠের মধ্যে এখানে-ওখানে শ্যাওলা-ঢাকা টিলাগুলো অন্ধকার ছোট ছোট দ্বীপের মতো খালি মাথা জাগিয়ে আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে এবার হাঁটতে শুরু করলুম আমরা। অনেকক্ষণ এইভাবে হাঁটার পর খামার-মালিক আমাদের যে-রাস্তাটার কথা বলেছিল, সেই রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। দেখলুম, আমাদের সামনে ঘন, থকথকে কাদার ওপর ডালপালা আর ওপরে-উঠে-আসা পচা খড় বিছনো সরু একফালি পথ-গোছের কিছু একটা রয়েছে।

ত্যক্তবিরক্ত কমরেডদের দিকে চুপিসাড়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফেদিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'হুস্‌, রাস্তা বটে একখান!'

'আমরা যে ডুবে মরব, ফেদিয়া!'

'সে. আর কইতে,' আমাদের পথপ্রদর্শক বুড়ো খামার-মালিক সায় দিল। 'ডালপালা তো পচে গোবর হয়ে গ্যাচে। শুকনার সময়েও এ-রাস্তা খুব খারাপ।'

'ঘোড়াগুলা এই নরকের কাদার মধ্যি না পারবে হাঁটিতি, না পারবে সাঁতরাতি। পথ নয়, শয়তানের জাউ একখান!'

জোর করে হাসার চেষ্টা করে ফেদিয়া সকলকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আরে, ঠিক আচে, ঠিক আচে। রাস্তা পার হয়ে শয়তানের জাউ খেয়ে ফেলব'খন।'

অনিচ্ছুক ঘোড়াটার লাগামে একটা ঝাড়া দিয়ে ফেদিয়াই প্রথম ওর ঘোড়াটাকে সেই হাঁটুভর পচা, দুর্গন্ধওয়ালা কাদার মধ্যে নামাল। ওর পিছু পিছু নামলুম আমরা, একসঙ্গে দু-জন করে সার বেঁধে। জলটা এখানে-ওখানে ছিল পাতলা তুষারের একটা সর দিয়ে ঢাকা। আমরা জলে নামতেই জলটা লাফিয়ে উঠে আমাদের বুটের ওপরের কানা দিয়ে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগল। ঘোড়ার পায়ের নিচে কাদায় চাপা-পড়া কাঠকাটরা মচমচ করে কাঁপতে লাগল। না-দেখেশুনে অন্ধভাবে ঘোড়া চালাতে ভয় হচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই হয়তো ঘোড়ার পায়ের নিচে শক্ত মাটি মিলবে না, আর সওয়ারসুদ্ধ ঘোড়াটা কাদাভরা অতল গর্তে পড়ে তলিয়ে যাবে।

ঘোড়াগুলো আর এগোতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল আর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কুয়াশার মধ্যে কোথা থেকে যেন ফেদিয়ার গলা শোনা গেল, মনে হল, পরলোক থেকে যেন কেউ কথা বলছে:

'হে-ই, সব বেঁচে-বত্তে আচিস তো?'

'ভাইসব, আমাদের সহ্যির সীমে ছাড়িয়ে গ্যাচে। বরং আমরা এখেন থেকেই ফিরি, কী কও?' আমাদের সেই লালচুলো বিউগ্‌ল্‌-বাজিয়ে বিড়বিড় করে উঠল। ঠান্ডায় ওর তখন দাঁতে দাঁতে বাদ্যি শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে থেকে ফেদিয়ার উদয় হল।

'খবরদার, পাশা, নোকরে ভয় পাওয়ালে ভালো হবে নে, বলে দিচ্ছি,' নিচু, ক্রুদ্ধ গলায় ও বিউগ্‌ল-বাজিয়েকে সাবধান করে দিল। 'যদি নাকে-কাঁদার পিরবিত্তি হয়, তাইলে ঘোড়া ঘুরিয়ে তুই একাই বরং ফিরে যা, বুইলি?' তারপর বুড়ো খামারীর দিকে ফিরে বলল, 'অ বুড়োবাবা, আমার ঘোড়াটার যে পেট পয্যন্ত কাদা উঠি এল। আরও কি অনেকটা রাস্তা যেতি হবে?'

'আর বেশি দূর লয় গো। জমি শিগ্‌গিরি উঁচু হতে শুরু করবে। সামনে শুকনো জমি পাবে। তবে তার আগে যে জায়গাটা সেটাই সব থিকে ভয়ের। ওই জমিতে যদি ভালোয় ভালোয় উতরে যেতে পারি তাইলে বাকি পথটা নির্বিঘ্নে চলি যেতে পারব।'

ক্রমে জল আমাদের কোমর ছুঁতে লাগল। বুড়ো ঘোড়া থামিয়ে টুপি খুলে নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিল। বলল:

'এখন আমি যাব আগে-আগে। তোমরা বাপু আমার পিছু-পিছু একজনা একজনা করি এস। নইলে আছাড় খেয়ে মরতি হবে।'

টুপিটা ফের মাথায় বসিয়ে দিয়ে বুড়ো সামনে এগিয়ে গেল। খুব আস্তে-আস্তে এগোতে লাগল ও, আর প্রায়ই থেমে হাতের লগিটা জলে নামিয়ে ডুবন্ত রাস্তাটা খুঁজতে-খুঁজতে চলল।

একটা লাইনে সারবন্দী হয়ে, তুষার-বওয়া বাতাসে হিম হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে, পায়ের নিচে জলার জলে আর ওপরের স্যাঁতসেতে কুয়াশায় ভিজে টুপটুপে হয়ে আধঘণ্টা সময় নিয়ে আমরা শ-খানেক গজ মাত্র এগোতে পারলুম। আমার হাত তখন নীল হয়ে গেছে আর হাঁটু দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে।

মনে মনে বললুম, 'কী শয়তান ফেদিয়াটা! গতকাল রাস্তায় কাদার দোহাই দিয়ে ও ভিসেল্‌কি গেল না, আর আজ আমাদের সদ্য একটা পগারের মধ্যে টেনে আনল।'

হঠাৎ সামনে একটা ঘোড়া চিঁহি-চিঁহি ডেকে উঠল। আর কুয়াশাটা ছিঁড়ে সরে যেতে আমাদের নজরে পড়ল সামনে একটা টিলার ওপর ফেদিয়া ওর ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসে আছে।

ভিজে টুপটুপে হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমরা যখন গিয়ে ওর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালুম, ফেদিয়া ফিস্‌ফিস করে বললে:

'শ্‌শ্‌শ্‌, ওই ঝোপগুলোর ওধারে শ-খানেক হাতের মধ্যিই ভিসেল্‌কি গাঁ। এরপর সামনের পথটা শুকনা।'

পাগলের মতো হুপ-হুপ আওয়াজ করতে-করতে আর শিস দিতে-দিতে শীতে অর্ধেক জমে-যাওয়া আমাদের ঘোড়সওয়ার-দলটা প্রচণ্ড বেগে ছোট্ট গাঁটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেদিক দিয়ে গ্রামে ঢুকলুম আমরা শ্বেতরক্ষীরা ওইদিক থেকে আমাদের আক্রমণ আশাই করে নি। চারিদিকে এলোপাতাড়ি বোমা ছুড়তে-ছুড়তে আমরা

গ্রামের ছোট্ট গির্জেটার দিকে ছুটে গেলুম। ওই গির্জের পাশেই ছিল শ্বেতরক্ষী-বাহিনীর সদর দপ্তর।

ভিসেল্‌কিতে দশজন বন্দী আর একটা মেশিনগান আমাদের হস্তগত হল। তারপর ক্লান্ত শরীরে খুশি মনে আমরা যখন বড় রাস্তা ধরে আমাদের বাহিনীতে ফিরছিলুম, তখন আমার পাশে ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে ফেদিয়া একটা কর্কশ, বাঁকা হাসি হেসে বলল:

'যাই হোক, শেবালভের হার হল কিন্তু! দেখেশুনে ও তো তাজ্জব বনে যাবে একবারে!'

'না-না, কী বলছিস,' আমি সরল মনে জবাব দিলুম, 'উনি খুশি হবেন।'

'হবে, আবার হবেও না। কাজটায় ওর সুবিধে না-হয়ে আমার সুবিধে হয়ে গেল আর আমার বরাতজোরটা দেখে শেবালভ চটেও যাবে'খন।'

কথাটা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না, ফেদিয়া। শেবালভ নিজেই তোকে এ-কাজে পাঠান নি?'

'পাঠিয়েছিল, তবে এই কাজে লয়। ও আমারে নোভোসেলোভোয় পাঠিয়েছিল, ওইখেনে গাল্‌দার জন্যি অপিক্ষে করতি। কিন্তু আমি বেরিয়ে পড়ে চলি এলাম ভিসেল্‌কি। কালকির ব্যাপার লিয়ে অত হৈ-চৈ করার জন্যি এবার খুব শিক্ষে পাবে শেবালভ। এখন আর ওর নিজের তরফে কিছু বলার থাকবে না। এই সব কয়েদী আর মেশিনগান কব্জা করে এনেচি দেখে থতিয়ে যাবে একবারে, মুখে আর বাক্যি সরবে না।'

কিন্তু আমি ভাবনায় পড়ে গেলুম। 'বরাত-টরাত বুঝি না। ব্যাপারটা ঠিক হল বলে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না। আমাদের পাঠানো হয়েছিল নোভোসেলোভোয়, কিন্তু তার বদলে আমরা চলে গেলুম ভিসেল্‌কি। ভাগ্য ভালো, সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে গেছে। কিন্তু ওই জলায় যদি আমরা আটকে পড়তুম — তাহলে কী হত? এতক্ষণ কোথায় থাকতুম আমরা? কী কৈফিয়তই বা দিতুম তাহলে?'

যে-গ্রামে আমাদের বাহিনী মোতায়েন ছিল সেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই আমরা লক্ষ্য করলুম, ওখানে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার ভাব। গ্রামের প্রান্তে লাল ফৌজের লোকজন ছুটোছুটি করছে, দূরে দূরে অবস্থান নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে গ্রামের সব্জিখেতের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেও দেখা গেল।

আর তারপর হঠাৎ গ্রাম থেকে মেশিনগানের গর্জন শোনা গেল। আমাদের বিউগ্‌ল-বাজিয়ে পাশা — সেই যে পগার থেকে আমাদের কাছে ফিরে আসার প্রস্তাব করেছিল — সে হঠাৎ রাস্তায় পড়ে গেল উলটে।

খাদের একটা গর্তের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ফেদিয়া চিৎকার করে বলল, 'ইদিকে এস!'

প্রথম এক ঝাঁক গুলিবর্ষণের পর গ্রামের মেশিনগান থেকে এবার দ্বিতীয় ঝাঁক গুলি ছুটে এল। আর আমাদের পেছনের সারির দু-জন স্কাউট লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের মধ্যে একজনের পা আবার আটকে গেল জিনের রেকাবে আর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ছোটার সঙ্গে সঙ্গে আহত লোকটাকেও হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে প্রায় খাবি খেতে-খেতে আমি বললুম, 'ফেদিয়া, ও যে আমাদের কোল্‌ট মেশিনগানটাই গুলি করছে। আমরা এদিক দিয়ে আসব ওরা নিশ্চয় তা আশা করে নি? আমাদের তো এখন নোভোসেলোভোয় থাকার কথা।'

'ওদের গুলি করা বার করচি এক মিনিটে!' খেঁকিয়ে উঠল ফেদিয়া। তারপর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেতরক্ষীদের কাছ থেকে যে মেশিনগানটা আমরা ছিনিয়ে এনেছিলুম সেটার দিকে ছুটে গেল।

'আরে, আরে, করছিস কী ফেদিয়া? পাগল হলি নাকি? আমাদের নিজেদের লোকের ওপর গুলি করবি? ওরা না হয় বুঝতে পারছে না, কিন্তু তুই তো ওদের চিনিস, নাকি?'

তখন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে ফেদিয়া চাবুকখানা দিয়ে নিজের বুটের ওপরই সজোরে এক-ঘা বাড়ি মারল। তারপর ঘোড়ার জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে খাদ থেকে বেরিয়ে একটা টিলার মাথায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার আশপাশ দিয়ে বেশ কয়েকটা বুলেট শিস কেটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফেদিয়া রেকাবের ওপর পায়ের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, শরীরটা টানটান করে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর ওর বেয়োনেটের মাথায় টুপিটা বসিয়ে উঁচুতে তুলে ধরল।

গ্রাম থেকে এর পরে আরও কয়েকটা গুলি ছোড়া হল, তারপর সব চুপ করে গেল। বুলেট-বৃষ্টির নিচে দাঁড়ানো একক ঘোড়সওয়ারের সংকেত আমাদের দলের লোকেরা অবশেষে দেখতে পেয়েছিল।

সময়ের আগে আমরা যাতে খাদ থেকে না বেরই সেকথা হাত নেড়ে জানিয়ে দিয়ে ফেদিয়া নিজে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে ঢুকে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে আমরাও ঢুকলুম গ্রামে। ঢোকার মুখে শেবালভের সঙ্গে দেখা। ওঁর মুখটা দেখলুম ফ্যাকাশে আর অসম্ভব গম্ভীর। শুকনো মুখে চোখ দুটো বসে গেছে আর চাউনিটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে, তরোয়ালখানা ধুলোকাদায় মাখামাখি আর কাদামাখা গোড়ালির নালদুটো থেকে ঠংঠং আওয়াজ বিশেষ উঠছেই না। স্কাউট দলটাকে তাদের আস্তানায় চলে যেতে হুকুম দিলেন শেবালভ। ক্লান্ত চোখে দলটার লোকগুলোর দিকে একটা নজর বুলিয়ে তারপর আমাকে ঘোড়া থেকে নেমে অস্ত্র সমর্পণ করতে হুকুম দিলেন। পুরো বাহিনীর উপস্থিতিতে আমি জিন থেকে নেমে, কোমর থেকে তরোয়াল খুলে ফেলে সেটা আর আমার রাইফেলটা ভুরু-কোঁচকানো মালিগিনের হাতে তুলে দিলুম।

ভিসেল্‌কি গাঁয়ের ওপর স্কাউট-দলের দুঃসাহসী আর খামখেয়ালী আক্রমণের জন্যে আমাদের বাহিনীকে সেবার গুরুতর মূল্য দিতে হয়েছিল। নিজেদেরই মেশিনগানের গুলিতে আমাদের তিনজন ঘোড়সওয়ার সেপাই জখম হওয়া ছাড়াও, নোভোসেলোভোয় ফেদিয়া তার দলবল নিয়ে উপস্থিত না থাকায় সেখানে গাল্‌দার দু-নম্বর কোম্পানি শত্রুর কাছে পুরোপুরি হেরে গিয়েছিল আর গাল্‌দা স্বয়ং মারা গিয়েছিলেন ওই যুদ্ধে। এতে আমাদের বাহিনীর লোকেরা খেপে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল। ফেদিয়াকে গ্রেপ্তার করার পর ওরা দাবি জানিয়েছিল তার বিচার করতে হবে আর কঠিন সাজা দিতে হবে। বলেছিল:

'ভাইসব, এভাবে আমাদের কাজ মোটেই চলতি পারে না। আমাদের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতিই হবে। এইভাবে চললি আমরা সবাই মরব তো বটেই, আমাদের কমরেডদেরও মিত্যু ডেকে আনব। পেত্যেকেই যদি নিজের নিজের মতে কাজ করতি থাকে, তাইলে কম্যান্ডার বহাল করি লাভ কী?'

সেই রাত্রে শেবালভ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আর আমি কোনোকিছু রাখঢাক না করে মন খুলে ওঁর কাছে সবকিছু বললুম। আমি স্বীকার করলুম, আমরা ভিসেল্‌কি গেছি কিনা সেই প্রথমবার জিজ্ঞেস করায় ফেদিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর সহকর্মিত্বের খাতিরে ওর সম্পর্কে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিয়ে বললুম, নোভোসেলোভোয় না-নিয়ে গিয়ে ফেদিয়া যখন আমাদের

ভিসেল্‌কি নিয়ে যায় তখন ওর খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের কথা আমি কিছুই জানতুম না।

শেবালভ বললেন, 'দ্যাখো বরিস, তুমি একবার আমার কাছে মিছে কথা কয়েচ। কাজেই এবারেও তোমার কথা সত্যি বলি ধরে নেয়ার আর সামরিক আদালতে ফেদিয়ার সঙ্গে তোমারও বিচার না করার একটামাত্তর কারণ খালি এই যে তোমার বয়েস খুবই কম। কিন্তু এমনধারা ভুল আর কখনও যেন না হয় বাছা। তোমার ভুলের জন্যিই চুবুক মারা পড়েচে আর তোমার আর তোমার দলবলের ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে সিগ্‌ন্যালাররা শ্বেতরক্ষীদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছিল। কাজেই, বুইতে পারচ, যথেষ্ট ভুলচুক করি ফেলেচ! শয়তান ফেদিয়াটা সম্পক্কে আমার অবিশ্যি কিছু বলার নেই, ও আমার শয্যেকণ্টকী, ও যা না উবগার করেচে ক্ষেতি করেচে তার চে' বেশি। ঠিক আচে। তুমি এখন সুখারেভের এক লম্বর কোম্পানিতে নিজির জায়গায় ফের ফিরি যাও। সত্যি বলতে কী, সেবার তোমারে ফেদিয়ার দলে ঢুকতি দিয়ে ভুলই করেছিলাম। চুবুক... তার কথা আলাদা ছিল, তার কাছ থেকে শিক্ষে লেবার অনেক কিছু ছিল তোমার। কিন্তু ফেদিয়া? ওরে বিশ্বেস করা যায় না। তাছাড়া, এমনিও, একবার এর সঙ্গে একবার তার সঙ্গে জুটি বেঁধে বেড়ানোটাও ভালো লয়। সব্বার সঙ্গেই ভাবসাব করি চলতে হবে তোমারে, বুইলে? একা-একা থাকলিই মানুষির পক্ষে ভুলভাল ভাবনাচিন্তে করা আর কাজে ভুলচুক করা বেশি সহজ।'

সেইদিন রাত্রেই ফেদিয়া পালাল। যে-ঘরে ওকে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের জানলা ভেঙে। সঙ্গে নিয়ে গেল ওর চারজন ইয়ারবন্ধুকে। ফ্রন্ট ভেদ করেই ঘোড়া নিয়ে ওরা প্রথম-পড়া নরম তুষারের উপর দিয়ে দক্ষিণে চলে গেল। শোনা গেল, ও নাকি ডাকাত-সর্দার মাখ্‌নোর দলে যোগ দিতে গেছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সারা রণক্ষেত্র জুড়ে লাল ফৌজ পাল্‌টা আক্রমণ শুরু করল।

আমাদের বাহিনীকে করা হল ব্রিগেড কম্যান্ডারের অধীন। তৃতীয় রেজিমেণ্টের বাঁ-পাশে অল্প একটু জায়গা জুড়ে রইল আমাদের বাহিনী।

প্রচণ্ড হাঁটাহাঁটির মধ্যে দিয়ে কাটল এক পক্ষকাল। প্রতিটি গ্রাম আর খামার আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে-করতে কসাকরা পেছিয়ে পড়তে লাগল।

ওই দিনগুলোয় আমার মনে ছিল কেবল একটিমাত্র বাসনা — কমরেডদের কাছে আমার পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা, আর পার্টির সদস্য হওয়ার সম্মান অর্জন করা।

বিপজ্জনক টহলদারির কাজে বৃথাই আমি নিজের নাম ঢোকানোর চেষ্টা করতে লাগলুম। অন্য অনেক শক্তপোক্ত সৈনিক যখন হাঁটু গেড়ে বসে কিংবা শুয়ে পড়ে গুলি চালাত, আমি তখন ফ্যাকাশে মুখে, দাঁতে দাঁত চেপে, সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করতুম। কিন্তু সবই বৃথা। টহলদারির কাজে কেউ তার জায়গাটা আমায় ছেড়ে দিল না, আমার অমন জাঁকাল বীরপনার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ।

বরং একসময় কথায়-কথায় সুখারেভ আমায় শুনিয়ে দিলেন:

'হাঁদার মতো ফেদিয়ারে নকল করার চেষ্টা পাচ্চ নাকি, ছোকরা? সবার সামনে বড়াই করার ইচ্ছে? জেনে রেখো, তোমার চে' বেশি বাহাদুর সেপাই আমাদের এখেনে আরও অনেক আচে। অমন ধারা ঘাড় উঁচিয়ে উঁচিয়ে মাথা বের করার কী অর্থ হয়?'

বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, 'আবার সেই ফেদিয়া! ফেদিয়ার সঙ্গে তুলনাটা কথায় কথায় আমার মুখে যেন ছুড়ে মারা হয়। আচ্ছা, ওরা আমায় সত্যিকার একটা কাজের মতো কাজ দিয়ে বলে না কেন — এস, এটা কর দিকি, তাহলে আমরা আগের সবকিছু ভুলে যাব আর তুমি আগেকার মতো আবার আমাদের বন্ধু আর কমরেড হবে?'

তখন চুবুক নেই। ফেদিয়া চলে গেছে মাখনোর দলে। আর, তাছাড়া, ফেদিয়াকে চাইছিলই-বা কে? কারো সঙ্গেই তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। তাছাড়া দলের সকলেই আমাকে কিছুটা উপেক্ষা করে চলছিল। এমনকি মালিগিন, যিনি আগে মাঝেমাঝেই আমার সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসতেন, আমাকে চায়ে নেমন্তন্ন জানাতেন আর নানা রকম গল্প করতেন, তিনিও তখন কেমন-যেন জুড়িয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন দরজার বাইরে থেকে শুনলুম মালিগিন শেবালভকে আমার সম্বন্ধে বলছেন, 'ছোঁড়া কী রকম মনমরা হয়ে ঘুরি বেড়ায়। সঙ্গী হিসেবে ফেদিয়ারে পাচ্চে

না বলে কী? খেয়াল রেখো, ওরই জন্যি চুবুক খুন হল, অথচ চুবুকের অভাবে ও কিন্তু বেশিদিন মনমরা হয়ে ছিল না।'

শুনে আমার মুখে যেন রক্ত ছুটে উঠল।

এটা সত্যি যে চুবুকের অভাব অল্পদিনের মধ্যেই আমার সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেদিয়ার অভাবে আমি কাতর হয়ে পড়েছিলুম এ-কথাটা মোটেই সত্যি ছিল না। ফেদিয়াকে আমি ঘৃণা করতুম।

মাটির মেঝের ওপর পায়চারি করার সময় শেবালভের গোড়ালিতে-লাগানো নালগুলোয় ঠংঠং আওয়াজ হচ্ছিল শুনতে পাচ্ছিলুম। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উনি মালিগিনের কথার উত্তর দিলেন:

'কথাটা তুমি কিন্তু ঠিক কইলে নি, মালিগিন। হ্যাঁ, ছেলেটা এখনও মোটে বিগড়োয় নি। এখনও ওর দিন আচে, ও সবকিছু কাটিয়ে উঠতি পারে। তোমার বয়েস হল গিয়ে চল্লিশ, তোমারে নতুন করে সবকিছু শিক্ষে দেয়া সম্ভব না। কিন্তু ছেলেটার বয়েস মাত্তর পনেরো। তুমি আর আমি, আমরা হলাম গিয়ে পুরনো জুতো, হাফসোল মারা, পেরেক-ঠোকা জুতো, কিন্তু ও হল উঠতি মুল, ওরে যেমন পায়ে পরাবে তেমনই আকার ধরবে ও। সুখারেভ কচ্ছিল ও নাকি ফেদিয়ারে নকল করতি চায়, নড়াইয়ের নাইনে দাঁড়িয়ে নাফিয়ে উঠতি যায়, সাহস দেখিয়ে বড়াই করতি সাধ যায় ওর। তা আমি সুখারেভরে কলাম: 'তুমি এট্টা দেড়েল বুড়া শকুন, সুখারেভ, কিন্তু হলি কী হবে, এক্কেবারে কানার বেহদ্দ। আরে, ছেলেটা ফেদিয়ারে মোটেই নকল করতি চাইচে না, ও চাইচে ওর ভুলির প্রাচিত্তির করতি কিন্তু কেমন করে যে তা করা যাবে তা বুঝে উঠতি পাচ্ছে না'।'

এমন সময় বাইরে থেকে জানলার কাচে টোকা দিয়ে একজন সংবাদবাহক শেবালভকে ডাকল। ফলে কথাবার্তা ওইখানে বন্ধ হয়ে গেল।

যাই হোক, কথাগুলো শুনে আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলুম।

আমি গিয়েছিলুম 'সমাজতন্ত্রের সমুজ্জ্বল রাজত্ব' জয় করে আনার জন্যে যুদ্ধ করতে। সেই রাজত্ব তখনও ছিল অনেক দূরে। আর সেখানে পৌঁছনোর আগে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম আর অনেক গুরুতর বাধা উল্লঙ্ঘন করতে তখনও বাকি ছিল। ওই পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল শ্বেতরক্ষীরা। সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলুম যখন, তখনও আমি খনি-মজুর মালিগিন কিংবা শেবালভ কিংবা ওই

রকম আরও ডজন-ডজন মানুষের মতো শ্বেতরক্ষীদের ঘৃণা করতে শিখি নি। মালিগিন আর শেবালভের মতো মানুষরা শুধু যে ভবিষ্যতের জন্যে লড়াই করছিলেন তাই নয়, তাঁদের যন্ত্রণাদায়ক অতীতের হিসেবনিকেশও সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়ে দিচ্ছিলেন।

পরে কিন্তু আমার অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। চারিদিকে তীব্রতম ঘৃণার আবহাওয়া, যে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না সেই অতীত কালের নানা কাহিনী, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে-ওঠা প্রতিকারহীন অন্যায় আর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমার অবস্থাটা হয়েছিল সেই লোহার পেরেকের মতো, আচমকা উত্তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে জ্বলন্ত কয়লার আঁচে সেটা যেমন দেখতে দেখতে আগুন-গরম আর শাদা হয়ে ওঠে সেইরকম।

আর সেই গভীর ঘৃণার বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে 'সমাজতন্ত্রের সমুজ্জ্বল রাজত্ব'-এর দূরাগত আলোরেখা আগের চেয়ে আরও বেশি করে প্রলুব্ধ করছিল আমাকে।

ওই দিন সন্ধেয় আমাদের ভাঁড়ারীর কাছ থেকে একখানা বড় কাগজ চেয়ে নিয়ে লম্বা একখানা আবেদনপত্র লিখে ফেললুম। তাতে আমাকে পার্টির সদস্য করে নিতে অনুরোধ জানালুম।

আবেদনপত্রখানা নিয়ে শেবালভের কাছে গেলুম। নিহত গাল্‌দার শূন্য স্থানে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল, কোম্পানি কম্যাণ্ডার সেই পিস্‌কারেভ আর বাহিনীকে খাদ্য যোগান দেয়ার ভারপ্রাপ্ত একজন ফৌজী কর্মচারির সঙ্গে শেবালভ তখন কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন।

ওঁদের মধ্যে কাজের কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে আমি একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। দেখলুম, কথা বলতে-বলতে শেবালভ কয়েকবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি কী জন্যে এসেছি তা-ই অনুমান করবার চেষ্টা করলেন।

কথা শেষ করে ওঁরা চলে গেলে শেবালভ তাঁর নোটবই বের করে কী যেন টুকে রাখলেন, তারপর একজন আর্দালিকে বললেন একছুটে সুখারেভকে ওঁর কাছে ডেকে আনতে। তারপর আমার দিকে ফিরলেন:

'কও' দেখি, কী চাই?'

'কমরেড শেবালভ, আমি এসেছি... মানে... আ-আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' টেবিলের কাছে উঠে আসতে-আসতে আমি জবাব দিলুম। বুঝতে পারছিলুম, আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' এবার আগের চেয়ে নরম গলায় বললেন শেবালভ। আমার উত্তেজিত অবস্থা লক্ষ্য করেই নিশ্চয় ভরসা দিয়ে বললেন, 'কী?' কয়ে ফ্যালো।'

আর পার্টির সদস্যপদের জন্যে শেবালভের অনুমোদন চাইবার আগে আমি ওঁকে যা-যা বলব বলে ঠিক করে এসেছিলুম বেমালুম ভুলে গেলুম সব। শেবালভকে বোঝানোর জন্যে আগে থাকতে লম্বা একটা বক্তৃতা তৈরি করেছিলুম, তাতে আমি বলতে চেয়েছিলুম চুবুকের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তার জন্যে আর ফেদিয়ার ব্যাপারে ওঁকে ঠকানোর জন্যে যদিও আমি দোষী ছিলুম, তবু আমি সত্যি-সত্যিই মানুষ হিসেবে অত খারাপ ছিলুম না আর কখনও অত খারাপ হবও না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-সবকিছু মাথা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে গেল।

নিঃশব্দে ওঁর দিকে আবেদনপত্রখানা বাড়িয়ে দিলুম শুধু।

যখন উনি লম্বা আবেদনপত্র পড়তে ব্যস্ত ছিলেন তখন আমার কেমন-যেন মনে হল একটা অস্পষ্ট হাসির আভা ওঁর ফ্যাকাশে ভুরু দুটোর নিচে থেকে আস্তে-আস্তে নেমে ফাটা-ফাটা ঠোঁট জুড়ে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবেদনপত্র অর্ধেকটা পড়ে শেবালভ কাগজখানা পাশে সরিয়ে রাখলেন।

চমকে উঠলুম। মনে হল, এর অর্থ বোধহয় আমার আবেদন না-মঞ্জুর করা হচ্ছে। কিন্তু শেবালভের মুখ অন্য কথা বলছিল। শান্ত, ঈষৎ ক্লান্ত সেই মুখের কটা চোখ দুটোতে তুষারের আঁকিবুকি-কাটা জানলার শার্সিগুলোর ছায়া পড়েছিল।

'বোসো,' বললেন শেবালভ।

বসলুম।

'তাইলে তুমি পার্টিতে যোগ দিতে চাও, কেমন?'

'হ্যাঁ,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে আমি উত্তর দিলুম।

একবার মনে হল, শেবালভের এ-সব প্রশ্ন করার মানে কী! উনি কি আমায় এইভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে আমার এ-ইচ্ছে পূরণ হওয়া কতখানি অসম্ভব?

'খুব বেশিরকম চাও?'

'খুব বেশিরকম,' ধুয়ো ধরার মতো করে বললুম। বলতে-বলতে চোখটা আমার ঘরের একটা কোণের দিকে চলে গেল, যেখানে অনেকগুলো দেবদেবীর ধুলোমাখা প্রতিমূর্তি ঝুলছিল। আর মনে হল, আর কিছুই নয়, শেবালভ খালি আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছেন।

'শুনে খুশি হলাম,' শেবালভ ফের বললেন। আর তখনই ওঁর গলার স্বর শুনে বুঝলুম উনি আমাকে নিয়ে এতক্ষণ মোটেই ঠাট্টাবিদ্রূপ করছিলেন না, বন্ধুর মতো রসিকতা করছিলেন মাত্র।

টেবিলের ওপর ছড়ানো রুটির টুকরোগুলোর মধ্যে থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে উনি আমার আবেদনপত্রখানা টেনে নিলেন। তারপর আবেদনপত্রের ওপর ওঁর নাম আর ওঁর পার্টি-সদস্য কার্ডের নম্বরটা লিখে দিলেন।

লেখার পর যে টুলের ওপর উনি বসেছিলেন সেই টুলসুদ্ধ আমার দিকে ঘুরে বসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন:

'ঠিক আচে, ইয়ার, এখন থেকি কিন্তু সাবধান হতি হচ্ছে তোমারে। আমি খালি তোমার কম্যান্ডার লই, বলতি গেলে আমি তোমার ধম্মো-বাপও। দেখো, আমার মুখ পুড়িয়ো না যেন।'

'আপনার যাতে মুখ পোড়ে এমন কাজ আমি কখনও করব না, কমরেড শেবালভ,' ব্যগ্রভাবে কথাগুলো বললুম আমি। তারপর একটু অশোভন ব্যস্ততা দেখিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি আমার আবেদনপত্রখানা টেবিল থেকে তুলে নিতে-নিতে ফের বললুম, 'পৃথিবীতে কোনো কিছুর জন্যেই আপনার কিংবা আমার বা আর কোনো কমরেডের মুখ আমি পোড়াব না!'

'আরে, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাও!' আমাকে থামালেন শেবালভ, 'আরেক জনার সই চাই-যে ওতি। তা, আর কে তোমারে অনুমোদন লিখে দিতি পারে? অ্যাঁ!' ঠিক সেই মুহূর্তে সুখারেভ ঘরে ঢোকায় তাঁকে দেখে উনি বলে উঠলেন, 'এই তো ঠিক নোক এসি গেচে।'

সুখারেভ ধীরে-সুস্থে টুপি খুললেন। তারপর টুপি থেকে বরফ ঝেড়ে ফেললেন। চটের যে থলেটা পাপোষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল, আনাড়ির মতো তাতে নিজের

প্রকাণ্ড বুটজোড়া মুছলেন, রাইফেলটা হেলান দিয়ে রাখলেন দেয়ালের গায়ে আর ঠাণ্ডায়-জমে-যাওয়া হাত দুখানা উনোনের কাছে মেলে দিয়ে শুধোলেন:

'কী জন্যি ডেকেছিলে কও দেখি?'

'কাজে রে ভাই। পাহারার ছেলেগুলোর ব্যাপারে দরকার পড়েচে। ছেলেগুলো এখন আচে কবরখানায়, ওদের গির্জের মধ্যি থাকার বেবস্তা করতি হবে। ঠাণ্ডায় ওরা জমি যাবে, এ হতে দিতি পারি নে। পাদ্রিসায়েব এখুনি এসে পড়বে'খন। ওর সঙ্গে বসি আমরা সব বেবস্তা করি ফ্যালব, বুইলে?' এই পর্যন্ত বলে দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে আর মাথাটা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে শেবালভ জুড়ে দিলেন, 'আর দ্যাখো, এ ছেলেটা কাজকম্মো করচে কেমন?'

'কী কইতে চাচ্ছ, খোলসা করি কও দিকি?' সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন সুখারেভ। ওঁর রক্তবর্ণ, রোদেজলে-পোড়া মুখখানা জুড়ে একটা হাসি আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল।

'মানে, সিপাই হিসেবে, এই আর কি। ওর সম্পক্কে তুমি রিপোর্ট কর দিকি, আইন মোতাবেক।'

'সিপাই হিসেবে ও খারাপ লয়,' সুখারেভ ভেবেচিন্তে আস্তে-আস্তে জবাব দিতে লাগলেন, 'কাজ দিলে ঠিক-ঠিক করে। ওর বিরুদ্ধে বলার নেই কিছু। খালি এট্টু বেপরোয়া ভাব আচে। আর ফেদিয়া চলি গেলি পর অন্যদের সঙ্গে ভাব জমাতে খুব বেশি ব্যস্ত লয়। ইদিকে আর সবাই তো ফেদিয়ার নামেই খেপা, মরুক ব্যাটা বোম ফেটে।'

এই পর্যন্ত বলে নাক ঝাড়লেন সুখারেভ। তারপর কোটের খুঁট দিয়ে নাকটা মুছে ফেললেন। ওঁর লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। রাগত সুরে বলে চললেন:

'গাইদামাক ওর মাথাটারে দু-ফাঁক করি দিক! ওর জন্যি গাল্দার মতো কম্যাণ্ডাররে আমরা হারিয়েচি! আহ্, কী কোম্পানি কম্যাণ্ডারই ছিল নোকটা! ওর মতো নোক আর খুঁজি পাওয়া যাবে? ওই পিস্কারেভ আবার কোম্পানি কম্যাণ্ডার নাকি? ও নোকটা কোম্পানি কম্যাণ্ডার লয়, কাঠের কুঁদো এট্টা। এই তো আজই ওরে কলাম: 'তোমার প্যাট্রোল-দল তো যোগাযোগ-বেবস্তার জন্যি। তা, কাল আমি দশ-দশজনা বাড়তি নোক দেলাম পাহারার কাজে,' তা শুনি ও কইল কি...'

'আরে, ও-সব কথা যেতি দাও,' শেবালভ বাধা দিয়ে বললেন। 'ওই সাতবাসি গেরামোফোনির রেকড আর চালিও না দেখি। গাল্‌দার জন্যি এখন তোমার শোক উথলি ওঠল, আর আগি তো দেখতাম তোমার সঙ্গে ওর দা-কুমড়া সম্পক্ক। বাড়তি দশজনা নোকের কী যেন বলছিলে? বোকা ঠাওরেচ আমারে, নাকি? আচ্ছা, যাক, ও-কথা পরে আলাপ করা যাবে'খন। এখন কও দেখি। ছেলেটা পার্টীতি যোগ দিতি চায়। ওর জন্যি জামিন দাঁড়াতি পারবে? কী, হাঁ করি তাকিয়ে আচ যে বড়? তুমিই তো কইলে, ছেলেটা বেশ ভালো সেপাই, কইলে না? ওর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই, কইলে তো? আর আগির কথা? ও ছাড়ান দাও। জীবন ভর খালি আগির কথা খুঁচিয়ে তোললে তো চলবে না!'

'তা কথাটা যা কইলে, সত্যি,' মাথা চুলকোতে-চুলকোতে টেনে-টেনে বললেন সুখারেভ। 'কার মনে কী আচে শয়তানই জানে।'

'শয়তান আবার জানবেটা কী! তুমি হচ্চ কোম্পানি-কম্যান্ডার, তায় পার্টির নোক। শয়তানের থেকে তোমারই ভালো জানা উচিত তোমার লাল ফৌজের সেপাই কমিউনিস্ট হবার যোগ্যতা রাখে কিনা।'

'তা, ছোকরা খারাপ লয়,' সুখারেভ স্বীকার করলেন। 'তবে ওরে লিয়ে মুশকিল এই যে বড্ড ওর নোক-দেখানে হামবড়াই ভাব। হাতাহাতি নড়াইয়ের সময় সব্বদা ঠেলেঠুলে সামনে যেতি চায়, মিনি কারণে শুধাশুধি ঘাড় নম্বা করি ইতিউতি চায়। নইলে ছোকরা ঠিকই আচে।'

'অ্যাই, পিছু হটে না-এলিই হল। তা, অমনটা খুব দোষের লয়। তাইলে, কী কও তুমি? সই করবে, না, না?'

'তা, দস্তখত দিতে হাতি-ঘোড়া আচে কী। ছোকরা তো আর খারাপ লয়,' সুখারেভ ফের সতর্কভাবে বললেন। 'আরেট্টা দস্তখত কে দেবে?'

'আমি দিয়েচি। এস, টেবিলটায় বোসো। এই লাও ওর দরখাস্ত।'

'ওঃ, তুমি দস্তখত দিয়ে বসি আচ!' বলে সুখারেভ ওঁর ভালুকের থাবার মতো প্রকাণ্ড হাতে পেন্সিলটা তুলে নিলেন। 'বেশ, বেশ। অমন ছেলে হাজারে এট্টা মেলে। তবে কিনা ছেলেবেলায় ওর শাসনটা ঠিকমতো হয় নি, এই আর কি!'

নোভোখোপেরস্কের বাইরে লড়াইটা তখন কয়েক দিন ধরে চলছে। ডিভিসনের নিয়মিত বাহিনীর বাইরের সব কটা সংরক্ষিত সৈন্যদলকে যুদ্ধে নামানো হয়েছে, কসাকরা তবু ঘাঁটি আগলে আছে শক্ত হয়ে।

লড়াইয়ের চতুর্থ দিন শুরু হল উভয় পক্ষের স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে।

পাহাড়ের মাথায় তুষার-মুক্ত একটা প্রান্ত-বরাবর সমাবিষ্ট বাহিনীর ঘন-করে-সাজানো, সারি-বাঁধা সৈন্যদের কাছে ঘোড়ায় চেপে এসে শেবালভ বললেন, 'ভাইসব, আজ দুপুরের পর ঢালাও হামলা শুরু করতি যাচ্চি। পুরো ডিভিসনটাই নড়াইয়ে নাবচে।'

জমা-হিমের রঙ্ ঘেঁষা ওঁর রুপোলী রঙের ঘোড়াটার গা থেকে ভাপ উঠছিল। লম্বা, ভারি তরোয়ালটা ঝলমল করছিল সূর্যের আলোয় আর সেই ঠান্ডা তুষার-বিছনো প্রান্তরে ওঁর কালোরঙের পাপাখাটুপির লাল ওপরের দিকটা মেলে ধরেছিল উজ্জ্বল রঙের বাহার।

খনখনে গলায় ফের বললেন শেবালভ, 'ভাইসব, আজ মোচ্ছবের দিন। আজ এখেন থেকে যদি আমরা শ্বেতরক্ষীদের হটিয়ে দিতে পারি, তাইলে বোগুচারের আগি গোটা তল্লাটে আর ওরা পা রাখার জায়গা পাবে না। এই শেষবারির মতো একখান খেল্ দেখিয়ে দাও দিকি, ডিভিসনের সামনি তোমাদের এই বুড়োটারে যেন নজ্জায় পড়তি না হয়, দেখো!'

'বুড়ো, না কচু!' কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে ধরা-ধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন মালিগিন, 'আমি তোমার চে' বয়েসে বড়, তা জান? অথচ আমারে ছোকরা বলি সবাই চালিয়ে দেয়।'

'আরে, তুমি-আমি আমরা দু-জনা একজোড়া ছেঁড়া পুরনো জুতো রে ভাই,' শেবালভ তাঁর মনোমত পুরনো কথাটির পুনরুক্তি করলেন। তারপর বন্ধুভাবে আমাকে ডাকলেন, 'বরিস, তোমার বয়েস কত হল?'

'ষোলোয় পড়তে চলেছি, কমরেড শেবালভ,' বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দিলুম। 'এ-মাসের বাইশ তারিখে আমার পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছে!'

'উঁ, বল কি? এরই মধ্যি!' রাগের ভান করে শেবালভ বললেন। 'আর আমার

সাতচল্লিশ পূর্ণ হল, বুঝেচ? শুনলে তো, মালিগিন? ষোলো, তাই না? ও কতকিছুই দেখবে, তুমি আর আমি তার কিছুই দেখব না…'

'পরলোক থেকি সে-সব উঁকি দিয়ে দেখব আর কি,' একটা তিক্ত রসিকতা করলেন মালিগিন। তারপর অফিসারদের পরনের একটা ছেঁড়া স্কার্ফ দিয়ে নিজের গলাটা ঢেকে নিলেন।

ঠাণ্ডা লেগে শেবালভের ঘোড়াটা ছটফট করছিল। গোড়ালিতে-লাগানো নাল দিয়ে ঘোড়াটাকে গুঁতো মেরে সারি-বাঁধা আগুনের কুণ্ডগুলোর ধার ঘেঁষে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন উনি।

আগুন থেকে ঝুলকালি-মাখা কানা-উঁচু খাওয়ার পাত্রটা নামাতে-নামাতে ভাস্‌কা শ্‌মাকভ চিৎকার করে বলল, 'বরিস, এস, চা খাওয়া যাক। আমার গরম জল, তোমার চিনি!'

'আমারও চিনি নেই কিন্তু।'

'তাইলে আর কী আচে?'

'কয়েক টুকরো রুটি। তবে খানিকটা জমাট বাঁধা আপেলও দিতে পারি তোমায়।'

'তাইলে রুটি লিয়ে চলি এস। আমার কিন্তু কিচ্ছু নেই। খালি জল আচে।'

'গোরিকভ!' আরেকটা আগুনের কুণ্ড থেকে কে যেন ডাকল আমায়, 'ইদিকে এস তো।'

লাল ফৌজের একদল লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ওরা নিজেদের মধ্যে কী একটা বিষয় নিয়ে যেন তর্ক করছে।

ওই দলে ছিল একটি লালচুলো মোটাসোটা ছোকরা, নাম গ্রিশ্‌কা চের্‌কাসভ। সবাই ওকে 'স্তব-পাঠক' বলে ডাকত। ও বলল, 'তুমি বোধহয় বলতি পারবে। আচ্ছা, এর কথাটা শোনা যাক। তুমি তো ভূগোল পড়েচ, তাই না? আচ্ছা, কও দেখি, এই জায়গাটার পরে কোন্ জায়গা পড়বে?'

'কোন্ দিকে বলতে চাইছ? যদি দক্ষিণ দিকে বল, তাহলে এর পরে পড়বে বোগুচার।'

'তারপর?'

'তারপর রস্তভ। তারপর আরও অনেক জায়গা। যেমন, ধর, নভোরসিইস্ক, ভ্ল্যাদিকাভ্‌কাজ, তিফ্‌লিস, তারপর আরও দক্ষিণে তুরস্ক। কেন বল তো?'

'এতগুলো জায়গা!' কান চুলকোতে-চুলকোতে গ্রিশ্‌কো বিড়বিড় করে বলল। 'এইভাবে চলতি থাকলে আমাদের আদ্ধেক জীবনই তো নড়াই করে যেতি হবে দেখচি। শুনেচি, রস্তভ নাকি সমুদ্দুরের ধারে। আমি ভাবছিলাম, ওইখেনেই বুঝি যুদ্ধু খতম হবে। তা লয়?'

অন্য সবাই হাসতে শুরু করল, আর গ্রিশ্‌কো আতঙ্কের ভাব নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। আর তারপরই হঠাৎ নিজের উরুতে চাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ভাইসব! দ্যাখো, কদ্দিন না-জানি আমাদের নড়াই করতি হবে!'

তারপর আস্তে-আস্তে গল্পগুজব এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল।

একজন ঘোড়সওয়ার পেছনের দিক থেকে রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে এল। শেবালভ লোকটির সঙ্গে দেখা করতে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমাদের বাহিনীর পাশের কামানটা থেকে আরও দু-বার গোলা ছোড়া হল।

হাত নেড়ে সুখারেভ হাঁক ছাড়লেন, 'এক লম্বর কোম্পানি, ইদিক এস!'

এর কয়েক ঘণ্টা পরে আমাদের সামনের সারির সৈন্যরা এতক্ষণ তারা যে-শাদা তুষারস্তূপের মধ্যে শুয়ে ছিল তা থেকে উঠে পড়ল। মালার আকারে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের বাহিনী হাঁটুভর তুষার মাড়িয়ে রক্তাক্ত দেহে শত্রুর মেশিনগান আর গোলার মুখে তাদের শেষ চরম আঘাত হানতে এগিয়ে গেল। আর আমাদের অগ্রগামী ইউনিটগুলো যখন ছুটে শহরের প্রান্তে ঢুকে পড়ল, ঠিক তখনই একটা গুলি এসে আমার শরীরের ডানদিকে বিঁধল।

এলোমেলোভাবে টলতে-টলতে নরম, পায়ে-দলা বরফের ওপর বসে পড়লুম। ভাবলুম, 'ও কিছু না। ছড়ে গেছে মাত্র। কই, আমি তো জ্ঞান হারাই নি, তার মানে আমি মরি নি। আর মরি নি যখন, তখন এ-ধাক্কা আমি কাটিয়ে উঠব।'

সামনে, অনেক দূরে, ছুটে-চলা পদাতিক বাহিনীকে তখন কয়েকটা কালো ফোঁটার মতো দেখাচ্ছিল।

একটা গাছের ঝাড় চেপে ধরে তার ডালপালার ওপর আস্তে-আস্তে মাথাটা নামিয়ে রেখে আমি ভাবলুম, 'ও কিছু না। স্ট্রেচার-বাহকরা এখুনি এসে পড়ে আমায় তুলে নেবে।'

মাঠটা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশপাশের এলাকায় তখনও লড়াই চলছিল। সেই সব দিক থেকে কানে আসছিল চাপা হট্টগোল। একটা মাত্র হাউই

আকাশে উঠে হল্দ আগ্নে-লেজওয়ালা ধ্মকেতুর মতো বাতাসে ঝুলতে লাগল।

আমার টিউনিকের ভেতরে গরম রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে, টের পেল্ম। চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ এই ভাবনাটা মাথায় এল: 'আচ্ছা, স্ট্রেচার-বাহকরা যদি না-ই আসে? আর যদি আমি মারা যাই?'

একটা প্রকাণ্ড বড় কালো দাঁড়কাক উড়ে এসে নোংরা বরফের ওপর নেমে ছোট-ছোট পা ফেলে লাফাতে-লাফাতে কাছাকাছি পড়ে-থাকা একনাদা ঘোড়ার গ্য়ের দিকে এগোতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাথা ঘ্রিয়ে তেরছা-চোখে দেখল আমাকে। আর, সঙ্গে সঙ্গে ভারি ডানা ঝাপ্টিয়ে উড়ে গেল।

দাঁড়কাকরা মড়া দেখলে ভয় পায় না। ভাবল্ম, রক্তক্ষয় হতে-হতে যখন আমি মারা যাব, কাকটা তখন ফের ফিরে এসে আমার পাশেই বসবে।

মাথাটা অল্প-অল্প কাঁপতে লাগল আমার। ডানদিকে বরফকণার ঝড়-ওঠানো কামানের গোলা ফাটার আওয়াজ আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল, আর আকাশে হাউইগ্লো আরও উজ্জ্বল হয়ে ফাটতে লাগল আরও ঘন ঘন।

ক্রমে রাত্রি পাঠিয়ে দিল তার হাজার তারার টহলদার বাহিনী, যাতে আরেক বার ওদের আমি দেখতে পাই। ঝলমলে চাঁদটাকেও পাঠিয়ে দিল রাত্রি। আর আমি ভাবতে লাগল্ম: 'একদিন চুব্ক বেঁচেছিলেন, বাচ্চা খেদে বেঁচে ছিল, বেঁচে ছিল খট্রাশও... আর আজ ওরা কেউ নেই, আর আমিও থাকব না।' মনে পড়ল বাচ্চা বেদে একবার বলেছিল আমায়: 'আর তারপর থিকে কী করে ভালোভাবে বাঁচা যায় তাই ঢ্ঁড়তে বেরিয়ে পড়লম।' আমি ওকে এর উত্তরে শ্ধিয়েছিল্ম, 'তুমি কী মনে কর, ভালো জীবনের সন্ধান তুমি পাবে?' ও জবাব দিয়েছিল: 'একা তো পাব না, কুছ্তে না। তবে সবাই যখন এত করে চাইছে, সবাই মিলমিশ্ করে ঢুঁড়লে মিলতে পারে বটেক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! সবাই মিলেমিশে,' ভাবনাটাকে আবার আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় আমি ফিস্ফিস করে বলল্ম, 'সবাই মিলেমিশে চাইলে তো বটেই।' চোখ দ্টো ব্জে এল আমার। আর তখন মনে পড়ছিল না এমন সব স্খের সন্ধানে ভাবনাগ্লো ঘ্রে বেড়াতে লাগল।

'বরিস!' মনে হল বেশ কষ্ট করে কে যেন আমায় ফিস্ফিসিয়ে ডাকছে।

চোখ খুললুম। দেখলুম, কাছেই কামানের গোলায় ভাঙাচোরা একটা কচি বার্চগাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে বসে আছে ভাস্‌কা শুমাকভ।

ওর মাথায় টুপি ছিল না। ঘনিয়ে-আসা ভিজে-ভিজে সন্ধের অন্ধকারে দূরের রেলস্টেশনটার আলোগুলো যেদিকে সোনালী ঝাঁক বেঁধে জ্বলজ্বল করছিল, ভাস্‌কার চোখ দুটো তাকিয়ে ছিল সেইদিকে।

'বরিস!' ওর ক্ষীণ, ফ্যাস্‌ফেসে গলার আওয়াজ আবার কানে এল, 'আমরা শেষপের্‌যন্ত দখল নিয়েচি জায়গাটার।'

খুব আস্তে আমি জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ, দখল করেছি।'

ভাঙা কচি গাছটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে শেষের শান্ত হাসি হাসল ভাস্‌কা। তারপর একটা দুলন্ত ঝোপের ওপর আস্তে-আস্তে মাথাটা নেমে এল ওর।

আর তখুনি দেখতে পেলুম মাঠের মধ্যে একটা আলো মিটমিট করে দুলতে-দুলতে এগোচ্ছে। তারপর কানে এল জানান-দেয়া বাঁশির চাপা বিষণ্ণ আওয়াজ। তাহলে স্ট্রেচার-বাহকরা আসছে।

সূচী

আর্কাদি গাইদার ও তাঁর বই ৫
ইশকুল ১২
রোমাঞ্চকর সময় ৭৬
রণক্ষেত্রে ১৩৮

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

Перевод сделан по книге:
Аркадий Гайдар. Школа.
М., "Детгиз", 1957 г.

Для старшего школьного возраста

বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক আর্কাদি গাইদারের (১৯০৪-১৯৪১) 'ইশ্‌কুল' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে, ১৯২৯ সালে লিখিত এই গ্রন্থটি এখনও সোভিয়েত তরুণসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রিয় রচনা রূপে পরিগণিত।

'ইশকুল' আত্মজীবনীধর্মী সাহিত্যসৃষ্টি। লেখক তাঁর কৈশোরে, ১৪ বছর বয়সে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। এই উপাখ্যানে তিনি তাঁর কৈশোরের সেই যোদ্ধজীবনের ঘটনারই চিত্র এ'কেছেন। 'ইশ্‌কুল'-এর নায়ক বরিস গরিকভও তাঁরই মতন নিজের বাড়িঘরদোর ও পুরনো ইশকুল ছেড়ে 'সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল রাজ্যের জন্য লড়াই করতে' চলে যায়।

উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধস্বরূপ গাইদার একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। নিজের কৈশোরের সেই সংগ্রামী পর্বের কথাপ্রসঙ্গে গাইদার লিখেছিলেন: 'আমার জীবনকাহিনী যে অসাধারণ তা নয় — অসাধারণ ছিল আসলে সেই সময়টা। এ হল অসাধারণ সময়ের এক সাধারণ জীবনকাহিনী।'

এই অসাধারণ সময়ের কথা, সেই সময় যাঁরা বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের পাঠশালায়, পৌরুষের পাঠশালায় পাঠ নিয়েছিলেন, তাঁদেরই কাহিনী গাইদার বলেছেন তাঁর এই উপন্যাসে।

আর্কাদি গাইদার • ইশকুল